ISSN-0971-8435

বিশেষ সংখ্যা

যোজনা

ধনধান্যে

অক্টোবর ২০১৬ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

বস্ত্র-বয়ন : নতুন স্বপ্ন বুনট

ভারতীয় হস্তশিল্প ও হস্তচালিত তাঁত সম্ভার : এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার
স্মৃতি জুবিন ইরানি

বয়ন শিল্প : কারিগরদের সামাজিক সুরক্ষা
অজয় টাম্টা

কর্মসংস্থান ও সার্বিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বয়ন ক্ষেত্রে উদ্যোগ
রেশমি ভার্মা

ভারতে হস্তচালিত তাঁত সম্ভার : আজ-কাল-আগামীর গল্প
জয়া জেটলি

ফোকাস

খাদি : আমাদের বুনিয়াদি শক্তি
ভি. কে. সাক্সেনা

বিশেষ নিবন্ধ

ভারতের কারিগরি কাপড় শিল্প : উদীয়মান ক্ষেত্র
ড. প্রকাশ বাসুদেবন

আমাদের হস্তচালিত তাঁতের ঐতিহ্যকে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশানের কেন্দ্রবিন্দু বানানো প্রয়োজন : প্রধানমন্ত্রী

২০১৬ সালের ৭ আগস্ট জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

- "জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবসে চলুন আমরা অঙ্গীকার করি যে আমরা হস্ততাঁত ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেব এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্ততাঁত পণ্য আরও বেশি করে ব্যবহার করব।
- আমাদের হস্ততাঁত ক্ষেত্র বৈচিত্রময়, পরিবেশ-বান্ধব এবং অসংখ্য তন্তুবায়ের কর্মসংস্থানের উৎস ; আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা এদের প্রচুর উৎসাহ জোগাবে।
- যেহেতু হস্ততাঁত ক্ষেত্রের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মহিলা যুক্ত, তাই এই ক্ষেত্রের বিকাশ মহিলাদের ক্ষমতায়ণেরও অন্যতম মাধ্যম।"

২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি সম্প্রচারিত 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান থেকে উদ্ধৃতাংশ

- "খাদি একটি প্রতীক, এর এক অনন্য ভাবমূর্তি আছে। আজ খাদি নতুন প্রজন্মের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, এবং যারা অর্গ্যানিক (জৈব) পণ্য ও সার্বিক সুস্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন, তাদের জন্য আদর্শ বিকল্প।
- ফ্যাশান দুনিয়ায় নিজের আলাদা স্থান করে নিয়েছে খাদি।
- খাদি শিল্পক্ষেত্রে কোটি কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।
- প্রযুক্তিগত উন্নতির ব্যাপারে বাপু সব সময় সচেতন ছিলেন এবং এর উপর জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে থাকতেন।
- যখন আমরা সম্মানীয় বাপুকে স্মরণ করব, তখন আমাদের পোশাক-আশাকের মধ্যে যেন অন্তত একটি খাদির বস্ত্র থাকে, এবং আমরা এর পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠি।"

২০১৫ সালে জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

- "হস্ততাঁত ক্ষেত্রের বিপণন এর অন্তর্নিহিত শক্তির ভিত্তিতে করতে হবে। হস্ততাঁতে প্রধানত সূতি, রেশম, উল, পাটের মতো প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহার হয়। সে কারণেই এটি পরিবেশ-বান্ধব। ভেষজ রং ও অন্যান্য জৈব পদার্থ ব্যবহার করে আমরা একে আরও পরিবেশ-বান্ধব বানাতে পারি।
- আমাদের হস্তচালিত তাঁতের ঐতিহ্যকে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশানের কেন্দ্রবিন্দু বানানো প্রয়োজন। ... শুধুমাত্র উপভোক্তাদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের লক্ষ্য নিয়েই 'ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম ব্র্যান্ড'-এর সূচনা করা হয়।
- সম্প্রতি আমরা "Digital India Movement"-এর সূচনা করেছি। এর ফলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব ভারতীয় একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। যুব উপভোক্তারা এখন ব্যাপকভাবে e-commerce platform থেকে কেনাকাটা করছেন। তাই, আমাদের e-commerce-এর পরিধি প্রশস্ত করে, এর মাধ্যমে হস্ততাঁত পণ্যের ব্যবসাও করতে হবে।
- হস্ততাঁত পণ্যের প্রসারের জন্য অভিনব নক্শার পাশাপাশি কার্যকরী বিপণন কৌশলও প্রয়োজন।
- কর্মশালা নির্মাণ এবং তন্তুযন্ত্র ও আনুষঙ্গিক উপকরণ ক্রয়ের জন্য আর্থিক অনুদান এখন থেকে সরাসরি তন্তুবায়ের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। আমরা ব্লক স্তরে 'হস্ততাঁত মহল্লা' (handloom cluster) গড়ে তোলার জন্য একটি বড় পদক্ষেপ নিলাম। আগে, মহল্লা পিছু ৬০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হ'ত। এখন সর্বোচ্চ সহায়তার অর্থ বাড়িয়ে ২ কোটি টাকা করা হয়।
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে ও তন্তু-পূর্ব পর্বে শ্রম হ্রাস করতে প্রযুক্তির উন্নতি করা প্রয়োজন।
- অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণ পাওয়া সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে সরকার MUDRA (Micro Units Development & Refinance Agency বা সংক্ষেপে মুদ্রা) ব্যাংক স্থাপন করার কথা ঘোষণা করে। এই ব্যাংকের corpus (মূলধন তহবিল) ২০ হাজার কোটি টাকার ও credit guarantee corpus (প্রতিশ্রুত ঋণ তহবিল) ৩ হাজার কোটি টাকার। ৫০ হাজার টাকার কম অর্থের ঋণের ক্ষেত্রে মুদ্রা ব্যাংক অন্তত ৬০ শতাংশ ঋণ প্রদান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি নিশ্চিত যে এর মাধ্যমে হস্ততাঁত ক্ষেত্রের তন্তুবায়রা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।"

অক্টোবর, ২০১৬

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতীয় হস্তশিল্প ও হস্তচালিত তাঁত সম্ভার : এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার — স্মৃতি জুবিন ইরানি ৫
- বয়ন শিল্প : কারিগরদের সামাজিক সুরক্ষা — অজয় টাম্‌টা ৯
- কর্মসংস্থান ও সার্বিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বয়ন ক্ষেত্রে উদ্যোগ — রেশমি ভার্মা ১২
- ভারতে হস্তচালিত তাঁত সম্ভার : আজ-কাল-আগামীর গল্প — জয়া জেটলি ১৬
- বাংলার হস্ততাঁত শিল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টা — রবীন্দ্রনাথ রায় ২২
- খাদি : আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক — এ. আন্নামালাই ২৬
- ভারতের কাপড় ও পোশাক রপ্তানির নয়া বাজার — আদিতি দাস রাউত ২৯
- পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও একটি আইন — সুব্রত গুপ্ত ৩৩

ফোকাস

- খাদি : আমাদের বুনিয়াদি শক্তি — ভি. কে. সাক্সেনা ৩৯

বিশেষ নিবন্ধ

- ভারতে কারিগরি কাপড় শিল্প : উদীয়মান ক্ষেত্র — ড. প্রকাশ বাসুদেবন ৪৩

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ

- গান্ধীজীর পরিবেশ চিন্তা : একটি প্রাথমিক সমীক্ষা — ড. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬
- গান্ধী ও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ধারণা — দেবজ্যোতি চন্দ ৫২

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৫৫
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৫৭
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৫৮

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

ভবিষ্যতের নক্‌শা

'কাপড়'—এই শব্দটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুতি, রেশম, শিফন, লেস সজ্জিত এক সুন্দর চিত্র। মহেঞ্জোদারোর নারী মূর্তিতে জড়ানো কাপড় হোক বা ক্লিওপেট্রার কেতাদুরস্ত পোশাক বা ভিক্টরীয় যুগের বল ডান্সের গাউন বা আমাদের দেশের রানি ও রাজকন্যাদের এলাহি সাজপোশাক—বস্ত্র মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যুগযুগান্তর ধরে বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরা হয়েছে—প্রাকৃতিক সূতি, পাট ও রেশম থেকে কৃত্রিম রেয়ন, শিফন অথবা মসলিন।

ভারতীয় বস্ত্র সুন্দর রং ও নক্‌শার জন্য সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ। বিশ্বের অন্য কোনও দেশে ভারতের মতো সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বস্ত্রের বিপুল সম্ভার নেই। রাজস্থানের বান্ধনি, বাংলার কাঁথা, গুজরাটের তাঞ্চোই বা তামিলনাড়ুর কাঞ্জিভরম—এই প্রত্যেকটি কাপড় সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনন্য নজির। বেনারসি সিল্ক, ওড়িশা সিল্ক, তসর, মুগা ও চান্দেরির মতো ব্র্যান্ডের নাম বিশ্ববিখ্যাত ও কদর সর্বত্র।

সূতির বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারত সব সময়ে এগিয়ে। ঐতিহাসিকভাবে, ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি বা ঘাগরা—যে কোনও রূপে সূতিই সাধারণ মানুষের পছন্দের কাপড়। সূতির বড় উৎপাদক হিসাবে ভারত এক সময়ে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে বিলেতের সূতি শিল্পক্ষেত্রের জন্য তা আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি, ইংরেজ শাসকরা নিজেদের বস্ত্র উৎপাদন শিল্পকে বাঁচাতে নানান নীতি-নির্দেশিকা জারি করে ভারতীয় সূতির বিদেশে রফতানির পথ বন্ধ করে দেয় এবং এ দেশের মানুষকেও বিদেশি সূতির বস্ত্র কিনতে বাধ্য করে। ব্রিটিশ সরকারের এই সব পদক্ষেপ স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে খাদির জন্মও এসব নীতিরই প্রতিফলন সূত্রে।

যোজনা

সময়ের সাথে ঐতিহ্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠেছে খাদি। বিপুল মানব সম্পদ, বিশেষত গ্রামীণ মহিলাদের জন্য সম্মানজনক জীবিকার উৎস খাদি। খাদি শিল্পে কোটি কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে প্রধানমন্ত্রী "মন কি বাত" অনুষ্ঠানের একটি পর্বে ভারতের যুব সম্প্রদায়কে অন্তত একটি করে খাদির পোশাক ব্যবহার করার আহ্বান জানান। খাদি সব থেকে পরিবেশ-বান্ধব ও সুস্থায়ী তন্তু। আধুনিক কৃত্রিম তন্তু পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। খাদি এর উপযুক্ত বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। হস্ততাঁত আরেকটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পরিবেশ-বান্ধব বয়ন ক্ষেত্র যেখানে সুসমৃদ্ধ প্রাচীন কৃষ্টি ও আধুনিক উদ্ভাবনের সংমিশ্রণ হয়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের প্রথাগত হস্ততাঁত পণ্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ফ্যাশানের কেন্দ্রবিন্দু বানানো প্রয়োজন।

যুগযুগান্তর ধরে ভারতীয় রেশম বিশ্বজুড়ে প্রসিদ্ধ। মুক্ত, ময়ূর ও মশলার পাশাপাশি রেশমও প্রধান রফতানি পণ্যের অন্যতম ছিল। ভারতীয় রেশম ও মসলিনের চাহিদা ছিল সারা দুনিয়ায়। রেশমগুটির চাষে পূর্বোত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক মানুষ নিযুক্ত। তবে হালে, ফ্যাশান ডিজাইনারদের নেক নজরে আসে পাট এবং এর ফলে ব্যাপকভাবে পাটের বস্ত্র বিপণন ও ব্যবহার বেড়ে চলছে। ওষুধ ও চিকিৎসা ক্ষেত্র, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, গাড়ি শিল্পের মতো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'কারিগরি কাপড়' (technical textiles)-এর চল সবে শুরু।

বিশ্বে বস্ত্র ও পোশাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক ও রপ্তানিকারক ভারত। কৃষির পর, ভারতীয় বয়ন শিল্প ক্ষেত্র দ্বিতীয় বৃহত্তম নিয়োগকর্তাও। এই ক্ষেত্রে সাড়ে চার কোটির বেশি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে ছয় কোটিরও বেশি মানুষ নিযুক্ত। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এর অবদান ৪ শতাংশ। কারিগরদের কল্যাণের জন্য ও তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সড়গড় করে তুলতে সরকার তন্তুবায় পরিষেবা কেন্দ্র, শিল্প মহল্লা কর্মসূচি, অনলাইন বিপণন ব্যবস্থার মতো একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেছে।

বিশ্ব বাজারে বয়ন শিল্পের অংশভাগ ৫.৬৫ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ভারতের রফতানির ১৪ শতাংশ আসে এই শিল্প ক্ষেত্র থেকে। রপ্তানির ক্ষেত্রে চিন, বাংলাদেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ান, হংকং, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কম্বোডিয়া ভারতকে কড়া টক্কর দিচ্ছে। তবে, বয়নশিল্পে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, Amended Technology Upgardation Fund Scheme (ATUFS বা সংশোধিত প্রযুক্তি উন্নতি তহবিল প্রকল্প), Technology Mission on Technical Textiles (TMTT বা প্রযুক্তিগত বয়ন সংক্রান্ত প্রযুক্তি অভিযান), Focus Incubation Centres (কেন্দ্রীভূত পোষণ কেন্দ্র) স্থাপন, Market Development Assistance (বাজার উন্নয়ন সহায়তা), Mega Cluster Development Schemes (বৃহৎ মহল্লা উন্নয়ন প্রকল্প)-এর মতো শিল্প-বান্ধব সরকারি নীতি ও প্রকল্পের ভিত্তিতে এই ক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতিতে তার উচ্চ স্থান বজায় রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রপ্তানিতে নতুন উচ্চতা লাভ নিশ্চয়ই করতে পারবে। একই সঙ্গে বয়ন শিল্প সাধারণ মানুষের 'রোটি, কাপড়া আর মকান' (অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়)-এর প্রয়োজন মেটাতেও সক্ষম।❑

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতীয় হস্তশিল্প ও হস্তচালিত তাঁত সম্ভার

এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার

*আজকের দিনে দেশের প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ বয়ন এবং হস্তশিল্প ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। অসংগঠিত, বিকেন্দ্রীকৃত এবং শ্রমনিবিড় এই কুটিরশিল্প ক্ষেত্র দেশের গ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকাগুলিতে কারিগর শ্রেণির মানুষদের জন্য কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করে, জোগায় তাদের রুটি-রুজি। আর্থ-সামাজিক শ্রেণি হিসাবে দেখলে সমাজের একেবারে নিচের ধাপে অবস্থান করছেন এরা। কাজেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটাতে হলে আগে দরকার, শত অসুবিধা সত্ত্বেও জাতব্যবসা হিসাবে একে যারা আঁকড়ে ধরে আছেন সেই সব কারিগর ও তন্তুবায়দের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার মানোন্নয়ন। তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করা। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রথাগত শৈল্পিক নৈপুণ্য, দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর সাথে সাথে একে যুগোপোযোগী করে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বিশেষ করে নজর দিতে হবে বিপণন ও 'ব্র্যান্ড' হিসাবে এসব পণ্যকে চিহ্নিত করার দিকে। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ও বস্ত্র মন্ত্রক বেশ কিছু সঠিক উদ্যোগ নিয়েছে। এগিয়ে এসেছে NID, NIFT-র মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় হস্তশিল্প এবং হস্তচালিত তাঁত বয়নকে শহুরে জীবনশৈলীতে প্রাসঙ্গিক করে তুলে এক সমকালীন রূপ দিতে তথা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার মুখে টিকে থেকে কীভাবে তা দেশের বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডার স্ফীত করার কাজটা করে যেতে পারবে—সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—***স্মৃতি জুবিন ইরানি***

ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হল এ দেশের হস্তশিল্পকলা এবং হস্তচালিত তাঁত বয়ন শিল্প। অসংগঠিত, বিকেন্দ্রীকৃত এবং শ্রমনিবিড় এই কুটিরশিল্প ক্ষেত্র দেশের গ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকাগুলিতে কারিগর শ্রেণির মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করে, জোগায় তাদের রুটি-রুজি। একই সাথে এই শিল্পক্ষেত্রের মাধ্যমে দেশের পর্যাপ্ত বিদেশি মুদ্রা রোজগার হয়। এসব কারণেই ভারতের এই সমৃদ্ধ অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা একান্ত জরুরি।

পেশা হিসাবে কৃষিকাজ এবং গবাদিপশু পালনের সঙ্গে যুক্ত জনগোষ্ঠীগুলি চিরাচরিতভাবে বয়ন এবং হস্তশিল্পে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক দক্ষতাকে অতিরিক্ত আয়ের একটা পথ হিসাবে বেছে নেয়। হিসাব করে দেখা গেছে, আজকের দিনে দেশে প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ বয়ন এবং হস্তশিল্প ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। আর্থ-সামাজিক শ্রেণি হিসাবে দেখলে সমাজের একেবারে নিচের ধাপে অবস্থান করছেন এরা। এই ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট অবদানের ছবিটা স্পষ্টতর হয় রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দেখে। ভারতীয় হস্তশিল্প সামগ্রী বিশ্বের বহু দেশে রপ্তানি হয়। উল্লেখযোগ্য গন্তব্যের মধ্যে আছে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, জার্মানি, ফ্রান্স, লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত বিশ্বের বাজার। যদি আমরা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিচার করি, তবে দেখতে পাব এভাবেই হস্তশিল্প নৈপুণ্যে ভারতের সুপ্রাচীন এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বিশ্বের আঙ্গিনায় ছড়িয়ে পড়ছে, তথা হস্তশিল্পকলার সৌন্দর্যের সারৎসারের পরিব্যাপ্তি ঘটছে।

বেশকিছু অনুকূল দিক এই ক্ষেত্রের উন্নয়নে বা বিকাশ ঘটাতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হল পর্যাপ্ত পরিমাণে সুলভ শ্রম, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ (কাঁচামাল হিসাবে), খুব বেশি পুঁজি বিনিয়োগের দরকার পড়ে না, গোটা বিশ্বের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম অনন্য কারিগরি নৈপুণ্য।এতসব সামর্থ্যের সমাহার সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রকে আজ বিবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত মানুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কম এবং শিক্ষাগত মান বেশ নিচু স্তরের। আধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতার চূড়ান্ত অভাব চোখে পড়ে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাঁচামালে বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত পুঁজির অভাব রয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও বেশ নিম্নমানের। বৃহৎ পরিসরে এই শিল্পক্ষেত্র যন্ত্র-নির্ভর উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে। শক্তি (বিদ্যুৎ) চালিত তাঁত বয়ন শিল্প এবং সিন্থেটিক কাপড় ক্রমশ বেশি বেশি আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সামনে। আজকের দিনে কাঁচ এবং মেলামাইনের সামগ্রীও পরিবেশ-বান্ধব রূপে তৈরি হচ্ছে। চাকচিক্যবিহীন মাটির তৈরি 'খুলহার' বা 'শিকোরা' প্রায় অবলুপ্তির পথে।

এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, হিসাব করে দেখা গেছে, এই ক্ষেত্রে বার্ষিক কিছু কিছু বৃদ্ধির নজির পাওয়া যাচ্ছে।

হস্তশিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিস্থিতির মানোন্নয়নের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে ২০১৯ নাগাদ হস্তশিল্পের বিশ্ব বাজারের আয়তন দাঁড়াবে প্রায় ৭০০ বিলিয়ন

মার্কিন ডলার। বর্তমানে এক্ষেত্রে বিশ্ব বাজারে ভারতের অংশভাগ ২ শতাংশেরও নিচে। কাজেই, তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধির চমৎকার সুযোগ রয়েছে। পরিবেশগত দিক থেকেও সুফল পাওয়া যাবে। হস্তশিল্প ক্ষেত্রে যে ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু আছে, তাতে কার্বন ফুটপ্রিন্ট বেশ কম। একই সাথে, স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন উপাদান/কাঁচামাল ব্যবহারের বিস্তর সুযোগ থাকায় তথা প্রাকৃতিক এবং যেখানে যেখানে সম্ভব জৈব সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে বলে এই ক্ষেত্র অত্যন্ত পরিবেশ অনুকূল। হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদন একদিক থেকে অদক্ষ তথা ঘরের গণ্ডিতে আবদ্ধ মহিলাদের জন্য অর্থ উপার্জন তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। এভাবেই পরিবারের এবং সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

এই ক্ষেত্রের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলতে হলে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পগুলির সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রকে সবল করে তোলা তথা একই সাথে শিল্পী-কারিগরদের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য এই বিনিয়োগ জরুরি।

তাদের নিজস্ব নৈপুণ্য-দক্ষতার মূল্য কতখানি, সে সম্পর্কে হস্তশিল্প পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের ফের একবার মনে করিয়ে দেওয়াটা জরুরি। দক্ষতার মূল্য সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি, ক্রমাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে সেই দক্ষতা তথা উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বস্ত্র মন্ত্রকের আওতাধীন, ডি সি হ্যান্ডলুমস্-এর দপ্তরের তন্তুবায় পরিষেবা কেন্দ্রগুলি (Weavers' Service Center) এই শিল্প নৈপুণ্য/দক্ষতার গুণগত মান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, হস্তচালিত তাঁতের কারিগরদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের নিত্যনতুন প্রযুক্তির সাথে ব্যাপকভাবে পরিচয় করিয়ে তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর কাজটাও করে থাকে উল্লেখিত কেন্দ্রগুলি। এভাবেই পণ্যের গুণগত মান তথা উৎপাদনশীলতার সাথে তাল মিলিয়ে তন্তুবায়দের উপার্জন বৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হয়। এরা তন্তুবায়দেরকে নিত্যনতুন নক্শা পরিযোজন সরবরাহের

ভারতীয় হস্তশিল্পের কারিগরী নৈপুণ্যের নজির

ব্যবস্থা করে এবং বয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বন্দোবস্ত করে। বয়নের আগে-পরের এবং বয়নকালীন প্রয়োজনীয় বিস্তর বিষয়ে, যেমন—সুতোর বাণ্ডিল তৈরি, তাঁতের সূতা টানা, পরিমাপ ঠিক করা (Sizing), কাপড়/ সুতো রঙ করা, নির্দিষ্ট আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী (dobby jacauard pneumatic) বয়ন, কাপড়ের নকশা তৈরি ইত্যাদি বিবিধ কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে উল্লেখিত কেন্দ্রগুলি। এছাড়াও বিভিন্ন প্রদর্শনী তথা বাণিজ্য মেলায় অংশ নেওয়ার জন্য তাঁতিদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে সরাসরি বাজারের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এসব কেন্দ্র।

'Mega Handloom Clusters Scheme' নামে একটি বড়ো মাপের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প নির্দিষ্ট পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে বিশেষভাবে সুদক্ষ এমন সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ভৌগোলিক অঞ্চলের বিকাশে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বাজার ধরতে হলে পণ্যের গুণমান এবং সূক্ষাতিসূক্ষ্ম আরও বেশকিছু দিকে নজর দেওয়া দরকার। মাথার রাখতে হচ্ছে এই দু'ধরনেরই বাজারের চাহিদার পরিবর্তনের কথাও। কাজেই কারিগরদের নৈপুণ্যের মানোন্নয়ন, পণ্যের নিত্যনতুন নক্শা পরিযোজন সম্পর্কে অবহিত করানো, পরিকাঠামোর সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে নজর দিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় যেমন সংশ্লিষ্ট শিল্পের বিকাশ ঘটানো হচ্ছে; পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রাপ্য বিবিধ সুযোগ-সুবিধার নাগাল করে দিয়ে হস্তচালিত তাঁত বয়ন শিল্পে নিয়োজিত লক্ষ লক্ষ তন্তুবায়ের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করা হচ্ছে।

জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস উপলক্ষ্যে এ বছর ৭ আগস্ট তারিখটিতে বস্ত্র মন্ত্রক এবং দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ মন্ত্রকের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। যার প্রতিপাদ্য, হস্তচালিত তাঁত শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষতার বিকাশ ঘটানো এবং শিল্পোদ্যোগ স্থাপনকে উৎসাহ প্রদান। চুক্তি অনুযায়ী, উভয় মন্ত্রক হস্তশিল্প ক্ষেত্রে নিযুক্ত তন্তুবায়দের জন্য যৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি তথা শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদানমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের আদান-প্রদান, প্রয়োজনীয় পরিমাণ সহায়সম্পদের সংস্থান এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের কাজটা করা হবে।

দ্বিতীয়ত, হস্তশিল্পকে শহুরে জীবনশৈলীতে প্রাসঙ্গিক করে তুলে একটা সমকালীন রূপ দিতে হবে। বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার মুখে টিকে থাকার জন্য ভারতীয় হস্তশিল্পকে সবল-সক্ষম করে

তুলতে নির্দিষ্ট 'ব্র্যান্ড' হিসাবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এছাড়াও, সামাজিক এবং বাণিজ্যিক—এই উভয় লক্ষ্যমাত্রাকে একসাথে মেশাতে সক্ষম এমন এক নতুন ব্যবসায়িক মডেল উদ্ভাবনের দরকার রয়েছে। বিপণন এবং 'ব্র্যান্ড' হিসাবে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করার পরিপ্রেক্ষিতে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের সূচনা করেছে 'Indian Handloom Brand'। প্রথম জাতীয় হস্তচালিত তাঁত দিবস, ৭ আগস্ট, ২০১৫ উপলক্ষ্যে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ব্র্যান্ড চালু করেন। দেশের উচ্চ গুণমানসম্পন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্যকে, সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত (Zero defects) হিসাবে তথা পরিবেশের উপর কোনও রকম কুপ্রভাব ফেলবে না (Zero effect on the environment) এমনটা সুনিশ্চিত করে নির্দিষ্ট 'ব্র্যান্ড' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা তথা বিপণনের অন্যতম উদ্যোগ এটি।

সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনের সময় ব্যবহৃত কাঁচামাল, প্রক্রিয়াকরণ, অলঙ্করণ, বয়ন, নক্‌শা-সহ সমস্ত ধরনের গুণমান নির্ধারক মাপকাঠি ধরে ধরে তথা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামাজিক এবং পরিবেশগত বাধ্যবাধকতা পালনের দিকটি কীভাবে সুনিশ্চিত করা হয়েছে—সেই সমস্ত বিষয়কে প্রচারের আলোয় এনে দুনিয়ার সামনে পেশ করতে হবে এই 'ব্র্যান্ড'।

পুরুষানুক্রমে কারিগরদের মধ্যে পণ্যের নক্‌শা প্রস্তুতির নৈপুণ্য অবশ্যই বজায় আছে। কিন্তু গ্রাহক/খদ্দেরদের রুচি এবং পছন্দমাফিক তাতে দ্রুত রদবদল করার জন্য প্রয়োজনীয় পেশাদার পথনির্দেশ জোগানোর মতো বন্দোবস্তের বেশ অভাব রয়ে গেছে। এটা এক বড়োসড়ো চিন্তার বিষয়। তবে এই সমস্যার খানিকটা হাল করতে এগিয়ে এসেছে 'National Institute of Fashion Technology' (NIFT)। প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে 'Craft Cluster Initiative' নামে একটি বিষয় ঢোকানো হয়েছে। এই নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের কারিগর এবং তন্তুবায়দের সাথে সহযোগী হিসাবে কাজ করার অনুমতি মিলেছে। এর ফলে, সংশ্লিষ্ট শিল্পক্ষেত্র কী ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

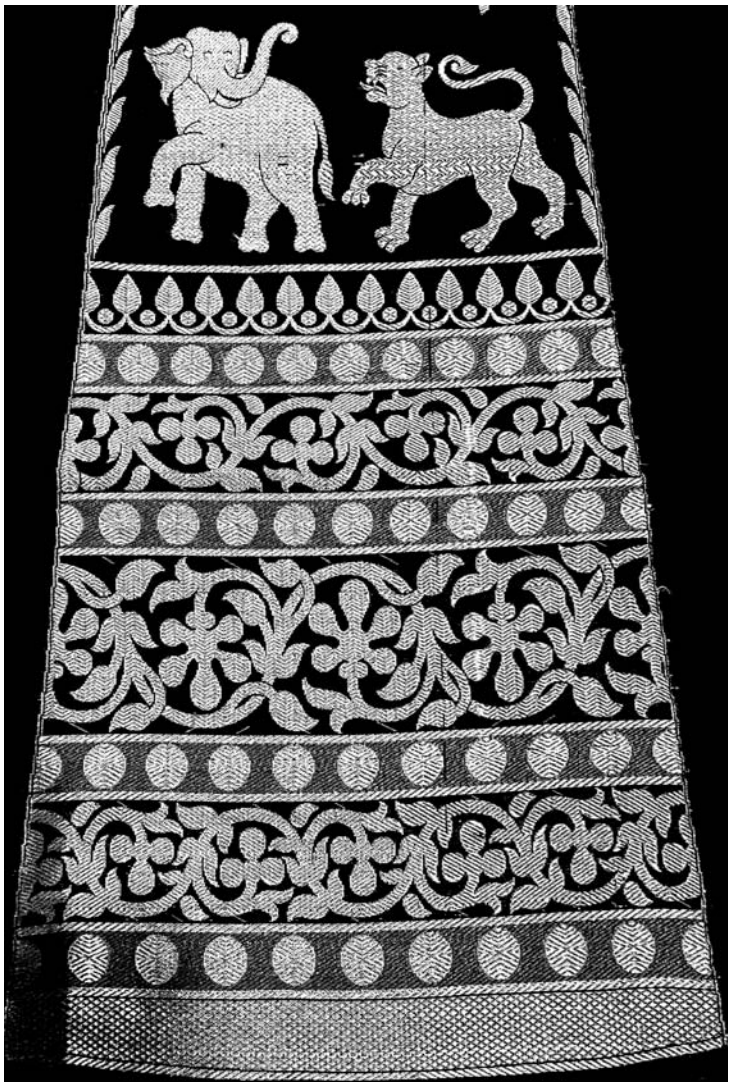

টানা পোড়েনের অসামান্য নিদর্শন

তা স্পষ্টতর হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সামনে এবং তারা সমস্যার সমাধানে নতুন নতুন ডিজাইন ও উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনের তথা নিত্যনতুন কাঁচামাল ব্যবহারের জন্য শিখিয়ে-পড়িয়ে কারিগর ও তন্তুবায় গোষ্ঠীকে যুগোপোযোগী করে তুলতে সহায়তা করছেন, তাদের সুবিধা করে দিচ্ছেন। আধুনিক বাজার ব্যবস্থায় কী ধরনের চ্যালেঞ্জ বর্তমান, সে সম্পর্কে এভাবে কারিগর ও তন্তুবায়রাও জেনে বুঝে নিতে পারছেন। কেরলে (ওয়াদাকারা, কৈলানডি এবং কোঝিকোড) কোঝিকোড ক্লাস্টারের সঙ্গে কাজ করছে NIFT, চেন্নাই। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দু'টি সুপ্রাচীন হস্তশিল্প ক্ষেত্র, হস্তচালিত তাঁত বয়ন এবং 'উরু' (Uru) নিয়ে মূলত এদের কারবার। হস্তচালিত তাঁত বয়ন ক্ষেত্রে প্রায় ৩০-টি সক্রিয় সমবায় সমিতি এদের সঙ্গে আছে। অন্যদিকে, হস্তশিল্প ক্ষেত্রে বেয়পারে অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৌকা, 'উরু'-র কাষ্ঠনির্মিত মডেল তৈরিতে নিযুক্ত কারিগরদের নিয়ে কাজকারবার চালাচ্ছে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান।

কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক সুনিশ্চিত করা তথা দিন দিন উভয় দিকেই উন্নতিসাধন আদৌ অসম্ভব নয়। তবে তার পূর্বশর্ত হল, কারিগরেরা যেন তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য একটা নিয়মিত বাজারের নাগাল সহজেই পান। একই সাথে সুলভ মূল্যে ভালো মানের কাঁচামাল যাতে তারা অনায়াসে সংগ্রহ করতে সক্ষম হন—তা সুনিশ্চিত করাটা আবশ্যিক। আজকের দিনে

গড়পড়তা কারিগররা অনবরত দুটো সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। একটি হল সরাসরি বিপণন করার মতো পরিকাঠামো নেই; এবং দ্বিতীয়ত, হল তাদের পক্ষে শহরাঞ্চলে অনায়াস যাতায়াত করাটা বেশ মুশকিলের। কারিগর এবং হস্তশিল্প তালুক (Cluster)-এর সঙ্গে বাজারের যোগসূত্রকে মজবুত করার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে প্রযুক্তি একটা বড়ো ভূমিকা নিতে পারে।

হস্তচালিত তাঁতজাত পণ্যের বৈদ্যুতিন বাণিজ্য (e-commerce)-এর মাধ্যমে বিপণনকে আরও উৎসাহ প্রদান তাই বস্ত্র মন্ত্রকের অগ্রাধিকারের মধ্যে অন্যতম। এক স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং কার্যকর উপায়ে হস্তচালিত তাঁতজাত সামগ্রীর বৈদ্যুতিন বিপণনের আরও ব্যাপক প্রসারের জন্য বিভিন্ন বৈদ্যুতিন বাণিজ্য প্ল্যাটফর্মকে সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিপণনে কাজে লাগানো হচ্ছে। এরকম একটা অত্যাধুনিক বাজার ব্যবস্থা তৈরি করতে পারলে কারিগরদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অনেকাংশে সফল হওয়া যাবে, পর্যাপ্ত উপার্জন বৃদ্ধির সূত্রে।

সরকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, অ-বাণিজ্যিক সংস্থা এবং আকাডেমি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের (Multi-stakeholder) তরফে যদি এমন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয় যে, এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব বির্নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে, তবে হস্তশিল্প ক্ষেত্র সুফল পেতে পারে। এভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য একটা সহযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা গেলে উল্লেখিত বিভিন্ন পক্ষ তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা ঠিকমতো পালন করে হস্তশিল্প কারিগরদের বিবিধ পন্থায় সহায়তা দিতে পারবে। এর এক চমৎকার উদাহরণ হিসাবে অসম ভিত্তিক সংস্থা 'North Eastern Development Finance Corporation'-এর 'Aqua Weaves'-এর কথা বলা যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান দূষণ সৃষ্টিকারী বহুবর্ষজীবী জলজ উদ্ভিদ 'hyacinth' থেকে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় পণ্যসম্ভার, যেমন—ব্যাগ, ঘর সাজানোর বস্তু এবং ব্যবহারিক উপযোগী পণ্যসমগ্রী উৎপাদন সম্ভব করেছে। তাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং আমেদাবাদস্থিত 'National Institute of Design'-এর নক্শা (design) পরিযোজন ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মাফিক উল্লেখিত পণ্যসম্ভার তৈরি করা হয়েছে। শুধু দেশের মধ্যে নয়, নেপাল ও জাপানের মতো বিদেশের বাজারেরও ভালোমতো দখল নিয়েছে এই সম্ভার। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিযুক্ত কারিগরদের উপকারে এসেছে এই উদ্যোগ।

ভারতে হস্তচালিত তাঁতজাত পণ্য এবং হস্তশিল্পে বিপুল বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য মেলে। দেশের বিবিধ অঞ্চল বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুর বৈচিত্র্য এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এসব বিভিন্ন কার্যকারণের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পণ্যের ঘাঁটি গড়ে উঠেছে।

বেশ উৎসহজনক তথ্য হল, প্রায় ১৪৩-টির মতো হস্তচালিত তাঁতজাত কাপড় (fabrics) এবং হস্তশিল্প সামগ্রীর 'Geographical Indication' (GI) এখনও পর্যন্ত নিবিদ্ধত হয়েছে। বয়ন ক্ষেত্রে GI তকমা প্রাপ্ত সুপ্রসিদ্ধ 'চান্দেরি'-র নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। হাতে বোনা এই ফেব্রিকের উৎপত্তি কবে, এ প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ১৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে। GI তকমা রয়েছে 'কোটা দোরিয়া'-রও। মূলত কৈথুন এবং রাজস্থানের বারান জেলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বহু গ্রামে এই নামের শাড়ি তৈরি হয়। টানা ও পোড়েনে বিভিন্ন 'Combination'-এ সূতি ও রেশম সুতো ব্যবহার করা হয় এই শাড়ি বোনার জন্য।

এ দেশের সুদক্ষ কারিগররা যুগ যুগ ধরে অমূল্য রত্নসদৃশ যেসব অনন্য ফেব্রিক বয়ন করে আসছেন, তার মধ্যে ইতোমধ্যেই GI তকমা প্রাপ্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সুপ্রসিদ্ধ পচমপল্লি ইক্কত, কাঞ্জিভরম সিল্ক, শ্রীকলাহস্তী কলমকারী, মাহেশ্বরী, কাঁথা (পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মহিলাদের এক বিশেষ দেশজ ঘরোয়া শৈলী), জামদানী (এক উজ্জ্বল নক্শা বিশিষ্ট নির্ভেজাল সূতি ফেব্রিক), বালুচরী এবং ওড়িশার অসাধারণ ইক্কত। তবে তালিকাটা এখানেই শেষ নয়। GI তকমা তন্তুবায় এবং কারিগর সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানভাণ্ডারকে সুরক্ষিত রাখে এবং তার অননুমোদিত ব্যবহারের বিপক্ষে আইনি রক্ষাকবচ প্রদান করে। এর ফলে সমবেতভাবে কারিগরদের একচেটিয়া অধিকার সুনিশ্চিত হয়। ফলত, আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা এবং হস্তশিল্পের অনন্য সাংস্কৃতিক রিকথ সুরক্ষিত থাকে।

আজকের দুনিয়ায় যন্ত্র-নির্ভর বৈচিত্র্যহীন উৎপাদনের উত্তরোত্তর বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ছে। সেখানে ভারতের অসংখ্য হস্তশিল্প এবং হস্তচালিত তাঁত বয়ন শৈলীর পেছনে যে কারিগরি নৈপুণ্য, কলাকৌশল এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানভাণ্ডারের অবদান আছে, তা ধরে রাখাটা এক বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জ। বাজার খুঁজে পেতে গলদঘর্ম হতে হচ্ছে; পাওয়া যাচ্ছে না উপযুক্ত দাম এবং পারিশ্রমিক। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এসব সমস্যা প্রত্যক্ষ করেই দিন দিন গ্রামাঞ্চলের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবারিক হস্তশিল্পের জাতব্যবসা সম্পর্কে উত্তরোত্তর মোহমুক্তি ঘটছে। আমাদের সমৃদ্ধ হস্তশিল্প সম্ভার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে অনুকূল মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। কাজেই দৃঢ়সংকল্প নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সামগ্রিক পরিস্থিতির মানোন্নয়নের। কারিগরদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। কারিগরদের জন্য প্রশিক্ষণ, বাজারের অনায়াস নাগাল পাওয়ার তথা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত করতে উদ্যোগী হতে হবে। যাতে তারা নিজস্ব পারিবারিক ও সম্প্রদায়ের হস্তশিল্প কলাকে আঁকড়ে থেকেও অন্তত চলনসই স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে। এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা গেলেই হাতে তৈরি কারিগরি পণ্যের দুনিয়ার অনাদিকাল থেকে ভারত যে অনন্য জায়গাটা ধরে রেখেছে তা আরও শক্তপোক্তভাবে বজায় থাকবে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ইমেল : mot_fb@nic.in, minister.textile@gov.in)

বয়ন শিল্প : কারিগরদের সামাজিক সুরক্ষা

মনে আছে, খুব ছোটোবেলায় কোনও এক পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও দপ্তরের। এত বছর বাদেও 'কপি'-টা স্পষ্ট মনে আছে। "শান্তিপুরের তন্তুজীবী, ফুলিয়া গ্রামের তাঁতি/দুয়ারে তোমার বাঁধা ওকি মহাজনের হাতি?/মহাজনের হাতি মারো, জোরসে টানো তাঁত..." এর মধ্যে দিয়ে একটা ছবি খুব সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। তা হল তন্তুবায়দের আর্থ-সামাজিক জগৎ। তাঁদের টিকি যে মহাজনের কাছে বাঁধা এই চিত্ররূপটাই ধরা পড়ে। এতো গেল অনেক অনেকদিন আগের কথা। কিন্তু সত্যি সত্যি জোরসে তাঁত টেনেও কি তারা এতদিন পরেও আদৌ নিজেদের অবস্থা ফেরাতে পেরেছে? তা হলে আজ নতুন করে কেন সরকারকে তাদের জন্য বিবিধ সুরক্ষা কবচ দিতে গুচ্ছ গুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নিতে হচ্ছে। যাইহোক, আমরা তো হাল ছেড়ে দিতে পারি না। কারণ ভারতে বয়ন শিল্পের যে সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার আমাদের উপর বর্তেছে, তাকে টিকিয়ে রেখেছেন এই সমস্ত তন্তুজীবীরাই। কাজেই দেশের বয়ন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আগে এইসব কারিগরদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাটা জরুরি। এ বিষয়ে সরকারের সাম্প্রতিক কিছু কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—**অজয় টাম্‌টা**

ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম শিল্পের মধ্যে অন্যতম হল বয়ন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রায় চার হাজার বছর আগেও, সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন মানুষজনও সুতো কাটা ও বয়ন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। গত চার সহস্রাব্দ ধরে বয়ন শিল্পক্ষেত্রের এই গৌরবময় গাথায় কোনও ছেদ পড়েনি। উন্নতির ধারা অক্ষুণ্ণই রয়েছে এবং বর্তমানে এই শিল্প দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজি-রোজগারের সংস্থান করে। এই ক্ষেত্রে আরও বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলছে। সুস্থ পরিবেশে কাজের সুযোগ সরাসরি উৎপাদিত পণ্যের গুণমান বাড়াতে কার্যকর হয়। একই কথা প্রযোজ্য বয়ন শিল্পক্ষেত্র সম্পর্কেও। তাই ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিযুক্ত সমস্ত কর্মীর কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে বিবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে, যা পক্ষান্তরে পুরো শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। বয়ন শিল্পের বিশাল আকার ও তার নানা উপক্ষেত্রের জন্য এই শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুদক্ষ কারিগর ও কর্মীর প্রয়োজন। বয়ন শিল্পক্ষেত্রের এই সব কারিগর ও কর্মীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সরকার বিবিধ কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। এর কয়েকটি নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

বিদ্যুৎচালিত তাঁত শিল্প

(ক) সমষ্টি বিমা যোজনা বা Group Insurance Scheme (GIS) : বিদ্যুৎচালিত তাঁত বয়ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত কারিগররা জীবন বিমা বা স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুযোগ-সুবিধা পান না। কারণ, সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণিভুক্ত এই মানুষেরা প্রায়শই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করেন। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে এই সব তন্তুবায়দের জন্য সমষ্টি বিমা যোজনা বা Group Insurance Scheme (GIS)-এর সূচনা করা হয় এবং দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পানাতেও তা চালু রাখা হয়। কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের আওতাধীন Textile Commissioner, Mumbai-এর দপ্তরের মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় তন্তুবায়রা নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা পাবেন :

- স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৬০ হাজার টাকা;
- দুর্ঘটনার দরুন মৃত্যু ঘটলে দেড় লক্ষ টাকা;
- দুর্ঘটনার কারণে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে গেলে দেড় লক্ষ টাকা;
- দুর্ঘটনার কারণে আংশিকভাবে পঙ্গু হলে ৭৫ হাজার টাকা।

এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কারিগর/কর্মীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য কিছু আর্থিক সহায়তা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প (Educational Assistance Scheme)-এর আওতায় উল্লিখিত বিমা প্রকল্পভুক্ত ব্যক্তিদের দু'টি পর্যন্ত সন্তানের জন্য নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বার্ষিক সর্বাধিক ২৪০০ টাকা করে শিক্ষা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এই সমষ্টি বিমা প্রকল্পের বার্ষিক প্রিমিয়াম ৪৭০ টাকা। এর মধ্যে তাঁতিকে দিতে হয় মাত্র ৮০ টাকা আর বাকি টাকা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

(খ) তন্তুবায়দের জন্য পুনর্বাসন তহবিল প্রকল্প বা Textile Weaver Rehabilitation Fund Scheme (TWRFS) : কোনও বয়ন শিল্প ইউনিট পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে এই প্রকল্পের আওতায় সেখানকার কর্মহীন কারিগরদের অন্তর্বর্তী ত্রাণ সহায়তা (interim relief) দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত সারা দেশে ৯৮-টি বন্ধ হয়ে যাওয়া বয়ন সংস্থার ১,১৭,৭৫১ জন কর্মীকে

৩১৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

হস্তচালিত তাঁত শিল্প

বিদ্যুৎচালিত তাঁত বয়ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত কারিগরদের সঙ্গে আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির নিরিখে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে কর্মরত তন্তুবায়দের বিশেষ তফাৎ নেই। হস্তচালিত তাঁত বয়নের সঙ্গে জড়িত মানুষজন প্রত্যন্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা-সহ গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। এ কারণেই তাদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা দিন দিন আরও কঠিন হয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

(ক) মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত তন্তুবায় বিমা যোজনা (MGBBY) : 'মহাত্মা গান্ধী বুনকর বিমা যোজনা'-র আওতায় তাঁতিদের বিমা সুরক্ষা প্রদান করা হয়। বিমার আওতাভুক্ত এই সব তন্তুবায়রা নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

- স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৬০ হাজার টাকা;
- দুর্ঘটনার দরুন মৃত্যু ঘটলে দেড় লক্ষ টাকা;
- দুর্ঘটনার কারণে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে গেলে দেড় লক্ষ টাকা;
- দুর্ঘটনার কারণে আংশিকভাবে পঙ্গু হলে ৭৫ হাজার টাকা।

(খ) স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (HIS) : দ্বাদশ পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটি (Cabinet Committee on Economic Affairs—CCEA) কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (RSBY)-র আদলে একটি স্বাস্থ্য বিমা যোজনার অনুমোদন দেয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এই প্রকল্পের দায়িত্বে আছে। হস্তচালিত তন্তুবায়দের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সুযোগ-সুবিধা দিতে ২০১৬ সালের ২৯ মার্চ মন্ত্রক এই মর্মে বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি করে। হাসপাতালে ভর্তি হলে এই বিমার আওতায় সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা খরচ পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আওতাধীন ১৯-টি রাজ্য হল—অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, কেরালা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ। তামিলনাড়ু মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (RSBY)-র আদলে সে রাজ্যে অন্য একটি স্বাস্থ্য বিমা যোজনা (HIS) চালু করা হয়েছে (তামিলনাড়ু রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আওতাধীন নয়)।

এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেয়। বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য অঙ্কটা ৭৫০০ টাকা। ২০১৫ সালের পয়লা অক্টোবর পর্যন্ত ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৯৪ জন তন্তুবায়ের নাম এই প্রকল্পের জন্য মনোনীত হয়েছে। মাঝে-মাঝে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার উপর কর্মশালার আয়োজন করে। সেখানে রাজ্যের হস্তচালিত তাঁত শিল্প বিষয়ক দপ্তরের কমিশনার বা অধিকর্তারা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আধিকারিকদের সাথে প্রকল্প রূপায়ণের খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

হস্তশিল্প

গ্রামীণ ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সমৃদ্ধ হস্তশিল্পের নজির ছড়িয়ে আছে। এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত কারিগরদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করতে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে।

(ক) রাজীব গান্ধী শিল্পী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা : ২০০৬-'০৭ অর্থবর্ষে এই প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং একাদশ ও দ্বাদশ পরিকল্পনাকালেও বজায় রখা হয়। এর উদ্দেশ্য কারিগরদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। নিবন্ধীকরণের জন্য কারিগর দেবেন মাত্র ৩০ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পের ৭৫ শতাংশ খরচ বহন করবে। বাকি ২৫ শতাংশ বহন করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার। জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের ৯০ শতাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

এই প্রকল্পের আওতায় কারিগর ও তার পরিবারের চার জন সদস্য স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পাবেন। বিমার আওতাধীন কোনও পরিবারের সদস্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলে সেই ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা। বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য এই অঙ্ক ৭৫০০ টাকা। এই প্রকল্পকে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে। এখনও পর্যন্ত ২৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৩৮ জন কারিগরের নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছে।

(খ) আম আদমি বিমা যোজনা : ২০০৪-'০৫ অর্থবর্ষে হস্তশিল্প ক্ষেত্রে নিযুক্ত কারিগরদের জন্য ভারতীয় জীবন বিমা নিগম জনশ্রী বিমা যোজনা বাস্তবায়িত করে। একাদশ পরিকল্পনার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটি এই প্রকল্প অনুমোদন করে। তবে অর্থব্যয় সংক্রান্ত কমিটি (Expenditure Finance Committee—EFC)-র সুপারিশ অনুযায়ী এর নতুন নামকরণ হয় আম আদমি বিমা যোজনা (ABBY)। গত তিন অর্থবর্ষে (অর্থাৎ ২০১৩-'১৪ থেকে ২০১৫-'১৬) ও চলতি ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের জুন মাস পর্যন্ত মোট ২৩ লক্ষ ৩১ হাজার ২৮৮ জন কারিগরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। আম আদমি বিমা যোজনাকে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (PMJJBY) ও প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা (PMSBY)-র সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

(গ) দরিদ্র কারিগরদের জন্য আর্থিক সহায়তা : এই প্রকল্পে কারিগরদের শেষ বয়সে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। হস্তশিল্পে জাতীয়/রাজ্য পুরস্কার বা 'শিল্প-গুরু' সম্মান প্রাপক যেসব কারিগরের বয়স ষাটের বেশি এবং বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকার কম, তাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। ২০১৪-'১৫ থেকে ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ১০৩৫ জন কারিগরকে মোট ১৬৪.০৬ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ছে।

পাটশিল্প

(ক) পাটশিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের কল্যাণের জন্য প্রকল্প—পাটকল এলাকায় পরিচ্ছন্নতা : এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য পাট শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশের বন্দোবস্ত করা। এই প্রকল্পে পাটকলে কর্মরত মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা শৌচালয়, চিলমচি (ওয়াশ বেসনি)/ হাত-মুখ ধোয়ার জায়গা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হয়। জাতীয় পাট পর্ষদ (National Jute Board) মোট খরচের ৯০ শতাংশ বা সর্বাধিক ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বহন করে।

(খ) শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে পাটকলের কর্মীদের সন্তানদের জন্য বৃত্তি : এই প্রকল্পে পাটকলের কর্মীদের সন্তানদের, বিশেষত কন্যাসন্তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে বৃত্তি দেওয়া হয়। কোনও পাটকল কর্মীর মেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাস করলে যথাক্রমে ৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকার বৃত্তি পায়।

২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষ থেকে বৃত্তি প্রকল্পের পরিধি বাড়িয়ে বৃত্তির টাকার পরিমাণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে যথাক্রমে ১৫ হাজার ও ২০ হাজার টাকা করা হয়। পেশাদারী শিক্ষার (যেমন—ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট, কস্ট অ্যাকাউন্টেন্সি, কোম্পানি সেক্রেটারি, ইত্যাদি) খরচের জন্যও আর্থিক সহায়তা প্রদানের সংস্থান করা হয়। ২০১৩-'১৪ অর্থবর্ষ থেকে এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ৬ হাজার ৭৩৩ জন শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে।

(গ) তপশিলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়-ভুক্ত পাটকল কর্মীদের জন্য জীবন বিমা যোজনা : তপশিলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়-ভুক্ত পাটকল কর্মীদের জন্য জীবন বিমা যোজনাটি প্রাথমিকভাবে ২০১৬ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০১৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ তিন বছরের জন্য চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের দু'টি অংশ আছে : (i) প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (PMJJBY) ও (ii) প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা (PMSBY)।

বয়ন শিল্পক্ষেত্রের কর্মীদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক মাঝে-মাঝে প্রকল্পগুলির উপর নজরদারি চালায়। মন্ত্রক কর্মীদের কল্যাণকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয় এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য যেসব যোজনা রয়েছে, সেগুলিকে আরও উন্নত করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী। ইমেল : mos-textiles@gov.in)

Bharti IAS Study Family

A unit of BCC

Honest and best IAS Coaching Center, Delhi Standard Coaching

We have the best faculty / Mentors

- Dr Nazrul Islam (Rtd. ADG Of Police, IPS) B Sc, MA, MBA, PhD, D Lit,), Rtd Major J R Biswas (IRPS, SAB Grade, EX CPO Indian Railways) Six Army Awardee, Sri R.K. Handa (Rtd. IPS DG Of Police) Sri Mahabir Mukhapadhyay MA, BT English, Sri B K Talukdar (Rtd. IPS, IG of Police, Professor Dr. S. Debnath PhD (Math), Advocate Sri D. Mukherjee LLB, Calcutta High Court, Professor Dr. Samir Kumar Dasgupta PhD (Sociology), Professor Sri A.K. Ghosh MA History, Ms Rajyashree Chaudhuri (Economics)

Register your name for the Seminar on "Yes you can be an IAS Officer" 23rd of Oct 2016.

- Experienced and Senior Faculty, Special care for English, Personal interaction with the Bureaucrats, Free Internet, Books reading, all well known national newspaper

Scholarship Program

- "Manmohan DSA" Scholarship Program : 100% Coaching fees off for talented students
- "Seven Sister" Scholarship Program for North East India's Students : 100% coaching fee off

Admission going on :

Address: B-13/24 (CA) Kalyani, Nadia (50 km from Sealdah, travel time 1.30 hrs.)
Near BT College, Behind Bharat Petrol Pump
Contact : 9022450555, 033-6555 0129, 7686964566
E-mail : asknowbharti@gmail.com, http://www.bhartiadministrativeservices.com

কর্মসংস্থান ও সার্বিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বয়ন ক্ষেত্রে উদ্যোগ

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশই কর্মক্ষম। জনতান্ত্রিক এই সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে হলে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। এই লক্ষ্যে অন্যতম মূল হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে বস্ত্রবয়ন ও পোশাক শিল্প। এই শিল্পের অমিত সম্ভাবনা এবং সাম্প্রতিক সরকারি প্রয়াসের কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন—**রেশমি ভার্মা**

সারসংক্ষেপ

জনসংখ্যাগত বাড়তি সুবিধা এবং ক্রমশ বেড়ে চলা শ্রমশক্তির সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে ভারতে এখন কর্মসংস্থানই আলোচনার মুখ্য বিষয়। বয়ন ও পোশাক শিল্পে প্রচুর কাজের সুযোগ থাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিরিখে এই শিল্পের সম্ভাবনা অমিত। ভারতীয় অর্থনীতির অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা তাকে কাবু করতে পারেনি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সরকার বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে দক্ষতা বিকাশের ওপর। বস্ত্র-বয়ন সংক্রান্ত চলতি নীতিগুলির সঙ্গে এইসব প্রয়াসের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বিকাশ হার ও রপ্তানি হার আরও বাড়ানো, তথা আরও বেশি কর্মসংস্থান এবং বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক ভারসাম্যের বিকাশই মূল লক্ষ্য।

আজকের নৈরাশ্যে ভরা টালমাটাল বিশ্ব অর্থনীতির মাঝে ভারতীয় অর্থনীতি যেন এক ঝলক সূর্য রশ্মি। সাম্প্রতিককালে যার বৃদ্ধি হার ৭ শতাংশের বেশি। তাসত্ত্বেও দেশের ক্রমাগত ফুলেফেঁপে ওঠা শ্রমশক্তির জন্য কাজের বন্দোবস্ত করা, বেশ উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির বিকাশের জন্য নীতিনির্ধারকরা বারে বারেই নির্ভর করেছেন বস্ত্র-বয়ন ক্ষেত্রের ওপর। ভারতও তার জাতীয় লক্ষ্য পূরণের জন্য এই ক্ষেত্রের ওপর বাড়তি জোর দিয়েছে। বর্তমান বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক নৈরাশ্য থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে, ভারত তখন নিজেকে প্রস্তুত করছে উচ্চ বিকাশ হারের পরবর্তী সোপানে উত্তরণের জন্য। একাজে সফল হতে পাখির চোখ করা হয়েছে বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক শিল্পকে।

ভারতীয় বস্ত্র-বয়নের পুনরুজ্জীবন

প্রথাগত ক্ষেত্রে সামর্থ্যের কারণে ভারত বেশ কিছু শতাব্দি ধরে সূতি ও রেশম পণ্যের অন্যতম প্রধান উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নানা বিধিনিয়ম সেই আধিপত্য খর্ব করে। স্বাধীনতার পর লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার এবং গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে শহরে আসা হাজার হাজার শ্রমিকের রুটি-রুজরি উৎস হয়ে দাঁড়ায় বস্ত্র-বয়ন শিল্প। এই শিল্পের বিকাশ ফের শুরু হয় নয়ের দশকের গোড়ায়। একদিকে উদারীকরণের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতি নিজেকে উন্মুক্ত করে, অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপে ক্রমশ বাড়তে থাকে উৎপাদন খরচ। এরই সুযোগ নেয় ভারত-সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ। সস্তা ও সুলভ শ্রমশক্তি, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও অনুকূল আর্থিক নীতি এই সব দেশকে বস্ত্র-বয়ন ক্ষেত্রে আকর্ষক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করে। ভারতীয় বস্ত্র-বয়ন শিল্প বরাবরই প্রাকৃতিক কাঁচামাল ও সুলভ শ্রমশক্তির দাক্ষিণ্য পেয়ে এসেছে। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামে বস্ত্র-বয়ন শিল্প যেমন অস্তিত্বরক্ষার জন্য রপ্তানির বাজারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, ভারতে কিন্তু তা নয়। ভারতে এর একটা বড়োসড়ো দেশীয় বাজার রয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ রপ্তানির থেকে বেশি। এইসব সুবিধার সৌজন্যে ভারত আজ বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক শিল্পে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক। ভারতের বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ চারশো কোটি ডলার, যা বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৫ শতাংশ। দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় ২ শতাংশ আসে বস্ত্র-বয়ন শিল্প থেকে, মোট রপ্তানির ১৩ শতাংশই হয় এই ক্ষেত্র থেকে।

ভারতের জনসংখ্যাগত সুবিধা

১২৮ কোটি মানুষের দেশ ভারত জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এই জনসংখ্যার প্রায় ৬৬ শতাংশ, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ৮৫ কোটি মানুষ কর্মক্ষম। ২০৩০ সালের মধ্যে সংখ্যাটা আরও ১৬ কোটি ৯০ লক্ষ বাড়বে। এই বাড়তি জনসংখ্যা বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক শিল্পের মতো শ্রমনিবিড় শিল্পের নিরিখে ভারতের পক্ষে আদর্শ। এই সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে চাইলে ভারতকে মাসে দশ লক্ষ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য বার্ষিক বৃদ্ধি হার হতে হবে ৮ থেকে ১০ শতাংশ। এই বিকাশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে এবং এর মূল লক্ষ্য থাকবে কর্মসংস্থান।

বস্ত্র-বয়ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির নিরিখে বস্ত্রবয়ন শিল্পের গুরুত্ব অসীম। বর্তমানে ৫

সারণি-১
বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক মূল্যশৃঙ্খলে সম্ভাব্য কর্মসংস্থান

(দশ লক্ষে)

ক্ষেত্র/শিল্প	মার্চ, ২০১১	২০১৭-য় সম্ভাব্য	২০১৫-১৬
বস্ত্র-বয়ন ক্ষেত্র			
তুলো/কৃত্রিম তন্তু/তন্তু বয়ন (কাপড় মিল (সুতো কাটার ক্ষুদ্রায়তন উদ্যোগ-গুলি এর মধ্যে পড়ছে, বয়ন ইউনিটগুলি নয়)	১.৪	১.৬১	১.৫৮
কৃত্রিম তন্তু/ফিলামেন্ট তন্তু শিল্প	০.২৪	০.২৮	০.২৭
বিকেন্দ্রীকৃত যন্ত্রচালিত তাঁত	৫.০৮	৫.৮৪	৫.৭১
হস্তচালিত তাঁত	৭	৮.০৫	৭.৮৮
বুনন ক্ষেত্র	০.৪৫	০.৫২	০.৫১
প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র	০.৪৪	০.৫১	০.৫০
পশম ক্ষেত্র	৩.২	৩.৬৮	৩.৬০
তৈরি পোশাক ক্ষেত্র (বুনন ক্ষেত্রের উৎপাদন ধরে)	১১.২২	১২.৯	১২.৬২
রেশম চাষ	৭.৭	৮.৮৬	৮.৬৭
হস্তশিল্প ক্ষেত্র	৮	৯.২	৯.০০
পাটশিল্প	০.২৬	০.৩	০.২৯
i) সংগঠিত পাটশিল্প	০.২৬	০.৩	০.২৯
ii) বিকেন্দ্রীভূত পাটশিল্প	০.২	০.২৩	০.২৩
মোট (I)	**৪৫.১৯**	**৫১.৯৭**	**৫০.৮৪**
অনুসারী ক্ষেত্র			
তুলো			
i) তুলো চাষ	২০	২৩	২২.৫০
ii) তুলো প্রক্রিয়াকরণ	১.৩	১.৫	১.৪৭
iii) তুলো বাণিজ্য	১৯	২১.৮৫	২১.৩৮
মোট	**৪০.৩**	**৪৬.৩৫**	**৪৫.৩৪**
মেষপালন	২.৮	৩.২২	৩.১৫
পাটচাষ	১৭	১৯.৫৫	১৯.১৩
বস্ত্র-বয়নের যন্ত্রাংশ ও অনুষঙ্গিক	০.১	০.১২	০.১২
মোট (II)	**৬০.২**	**৬৯.২৩**	**৬৭.৭৩**
সর্বমোট (I + II)	**১০৫.৪**	**১২১.২**	**১১৮.৫৭**

সূত্র : দ্বাদশ পরিকল্পনা কর্মীগোষ্ঠী প্রতিবেদন, বস্ত্রবয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

কোটিরও বেশি মানুষ এই ক্ষেত্রে সরাসরি নিযুক্ত। তুলো ও পাট চাষ, মেষপালন, বস্ত্র-বয়নের যন্ত্রাংশ নির্মাণের মতো সহযোগী ক্ষেত্রগুলির ওপর নির্ভরশীল আরও ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ।

বার্ষিক শিল্প সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত সারণি-১ থেকে কর্মসংস্থানের নিরিখে বস্ত্র-বয়নের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনামূলক অবস্থান বোঝা যাবে।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, একটি সম্পূর্ণ সংহত বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক উৎপাদন কারখানায় ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে ৩০ জনের কর্মসংস্থান হয়। আবার শুধু পোশাক উৎপাদন কেন্দ্রে ১ কোটি টাকা বিনিয়োগে কর্মসংস্থান হয় ৭০ জনের। ২০১১-'১২ সালের সর্বভারতীয় বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক শিল্প সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্রায়তন উদ্যোগ নয় এমন পোশাক উৎপাদন কেন্দ্রে ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে কাজ পেতে পারেন ৬৮ থেকে ১৬৯ জন। প্রকৃতপক্ষে, বিনিয়োগের সাপেক্ষে কর্মসংস্থানের পরিমাণের নিরিখে বস্ত্র-বয়ন শিল্প অতুলনীয়।

বস্ত্র-বয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি

কর্মসংস্থান ছাড়াও বস্ত্র-বয়ন ক্ষেত্র মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। সরকারের এই সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগের অক্লান্ত সহযোগী সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র। পোশাক শিল্পের প্রায় ৭০ শতাংশ কর্মীই মহিলা। সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির লক্ষ লক্ষ মানুষকে এই ক্ষেত্র উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সাহায্য করছে। ভারতের মতো একটি দেশে, বস্ত্র-বয়ন শিল্পের গুরুত্ব তাই সহজেই অনুমেয়। দেশের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশের বাকী গ্রামীণ এলাকায়, যেখানে উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ সীমিত ও অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধাগুলি নেই। বস্ত্র-বয়ন শিল্পে কাজ পেতে যেহেতু উচ্চ কারিগরির দক্ষতা বা বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না, তাই গ্রামের একজন সাধারণ মানুষও মাত্র ৩-৪ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিয়েই এই শিল্পে কাজ করতে পারেন।

বিশ্ব বাণিজ্যে পরিবর্তন

গত তিন দশক ধরে বিশ্ব বাণিজ্যের অবিসংবাদিত নেতা হল চিন। বিশেষ করে বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক শিল্পের বাজারের ৪০ শতাংশই গত ২০ বছর ধরে চিনের দখলে। ২০০৯ সালের অর্থনৈতিক সংকটের পর এই ক্ষেত্রে চিনের বৃদ্ধি অবশ্য বেশ কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। গড়ে ১৫ শতাংশ থেকে ২০১৪ সালে এই বৃদ্ধি হার নেমে এসেছে ৪ শতাংশে। ভবিষ্যতেও এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। মজুরি বেড়ে চলায় চিন এখন রপ্তানির বদলে অভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে বেশি মনযোগ দিয়েছে। এই শূন্যস্থান পূরণের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে ভারতের সামনে।

সারণি-২
কর্মসংস্থানের নিরিখে বস্ত্র-বয়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্র

উৎপাদন ক্ষেত্র	স্থায়ী মূলধন	নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা (লক্ষ টাকায়)	প্রতি কোটি টাকা লগ্নীতে কর্মসংস্থান
দুগ্ধজাত পণ্য	১২,০৩,৮৬৯	১,৪৫,৬০১	১২
নরম পানীয়	২৬,৭৫,২৪৭	১,৫৮,৫০৭	৬
পরিধেয় পোশাক (পশুলোম নির্মিত ব্যতীত)	১২,৮০,৫৬৪	৭,১৩,৮৩৩	৫৬
বোনা পোশাক	১৩,৬৯,১৪১	২,৬৪,২৬১	১৯
কাগজ ও কাগজজাত পণ্য	৬,৪২,৫৩৬	২,৪৮,৫২৯	৩৯
রবারজাত পণ্য	২৬,৬৮,৫১২	২,১৮,৭৫৪	৮
লৌহ ও ইস্পাত	৪,০৯,৯৯,৬৬১	৬,৫০,৬৮০	২
বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ	৪,২১,১৫৪	৭৬,৬১৯	১৮
সাধারণ যন্ত্রাংশ	৩৪,১৭,৪৫৩	৩,৩৮,৯৬৪	১০
মোটরগাড়ি	৭০,৮৮,০২০	১,৭৬,৫২৩	২

সূত্র : বার্ষিক শিল্প সমীক্ষা ২০১৩-১৪

বাজারের বৃদ্ধির পূর্বাভাস

রপ্তানির সম্ভাব্য উচ্চ বৃদ্ধি হার ছাড়াও উপভোক্তাদের ব্যয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পোশাকের জন্য বেশি খরচ করার প্রবণতার জেরে দেশীয় বাজারে এই শিল্পের বৃদ্ধি হার দুই অঙ্ক ছুঁয়েছে। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বাজারের গতিপ্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে আশা করা যায়, ভারতীয় বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক শিল্পের বাজার বর্তমানের ১১৯০০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সাল নাগাদ ৪০,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছবে।

কর্মসংস্থান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি কৌশল

বস্ত্র-বয়ন ক্ষেত্রের কর্মসংস্থান সৃষ্টির অপার সামর্থ্য এবং বিশ্ব বাজারে নতুন সম্ভাবনার দিকে চোখ রেখে সরকার এই ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে একটি নীতিকৌশল প্রণয়ন করেছে। বর্তমানের যে প্রকল্পগুলি প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং প্রথাগত ক্ষেত্রগুলিতে শক্তিবৃদ্ধি করছে, সেগুলির পাশাপাশি সরকারের তরফে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে দক্ষতার বিকাশের ওপর। ভারতীয় পোশাক শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপযোগী করে তুলতে এই ক্ষেত্রের জন্য একটি বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল, উৎপাদনশীলতার ওপর বর্তমান বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে কর্মসংস্থান ও রপ্তানিতে উৎসাহ দেওয়া।

দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি

কর্মসংস্থানের জন্য আগামী বছরগুলিতে উচ্চ বৃদ্ধি হার প্রয়োজন। এজন্য দরকার উৎপাদন ক্ষেত্রে বড়ো মাপের বিনিয়োগ। ফলত আবার এই শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে। এই চাহিদা পূরণের জন্যই দেশে দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত উদ্যোগগুলির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যেই চালু হয়ে গেছে সংহত দক্ষতা বিকাশ প্রকল্প—Integrated Skill Development Scheme—ISDS। এর ফলে বস্ত্র-বয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা ও কাজের পরিধি বাড়বে। এই প্রয়াসে বেসরকারি সংগঠন এবং রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। চলতি বছরের পয়লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ISDS-এর আওতায় ৭ লক্ষ ৭০ হাজার কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ লক্ষ ৬ হাজার জন, অর্থাৎ ৬৬ শতাংশ কাজ পেয়েছেন। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে ISDS-এ মোট ১৫ লক্ষ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়া হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার অসংগঠিত শ্রমিকদের সুদক্ষ করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। এজন্য স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের আওতায় সম্প্রতি একটি কার্যকর ও বিস্তারিত প্রশিক্ষণ

সারণি-৩
ভারতীয় বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক শিল্পের বাজারের বিকাশের পূর্বাভাস

	২০১৫-১৬	২০২৫-২৬	পরিবর্তনের হার
রপ্তানি	৪০০০ কোটি ডলার	১৫০০০ কোটি ডলার	১৪ শতাংশ
দেশীয় বাজার	৭৯০০ কোটি ডলার	২৫০০০ কোটি ডলার	১২ শতাংশ
মোট	১১৯০০ কোটি ডলার	৪০০০০ কোটি ডলার	১৩ শতাংশ

সূত্র : অভ্যন্তরীণ হিসাব, বস্ত্র মন্ত্রক, ভারত সরকার

সারণি-৪

ক্ষেত্র	প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান (লক্ষ)
পোশাক শিল্পকে প্রতিযোগিতাক্ষম করে তুলতে গৃহীত ব্যবস্থাপত্র	৯.৭
80 JJAA সংশোধনী	১২.২৫
পোশাক তৈরির জন্য অতিরিক্ত TUFS	
কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিলে অতিরিক্ত ৩.৬৭ শতাংশ অবদান	৯.৫
পোশাকের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়	
শ্রম আইনে সংশোধন	১.৭৫
তন্তু, কাপড় ও প্রক্রিয়াকরণের মতো পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডে কর্মসংস্থান	১০.৭
পরোক্ষ কর্মসংস্থান (1 : 1 ও হারে)	৫৬.৪
মোট	১০০.৩

সূত্র : অভ্যন্তরীণ হিসাব, বস্ত্র মন্ত্রক, ভারত সরকার

কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক শিল্পের জন্য গঠন করা হয়েছে ক্ষেত্রভিত্তিক পৃথক দক্ষতা পরিষদ বা স্কিল কাউন্সিল।

পোশাক শিল্পের জন্য বিশেষ প্যাকেজ

কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা বিপুল। তবে বিশ্ব বাজারের নাগাল ঠিকমতো না পাওয়া, তুলনামূলকভাবে বেশি মজুরি, উৎপাদনশীলতায় ব্যাঘাত ঘটায় এমন শ্রম সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, রপ্তানি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উৎসাহ না পাওয়ার মতো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এই শিল্পের সামনে। এগুলি কাটিয়ে উঠে বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ভারতীয় পোশাক শিল্পকে প্রস্তুত করে তুলতে সরকার এই ক্ষেত্রের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। রপ্তানিতে বিশেষ ছাড়, নির্দিষ্ট মেয়াদের কাজের মতো শ্রম সংস্কার, ওভারটাইমের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো, আয়কর আইনের 80 JJAA ধারা সংশোধনের মতো নানা সংস্থান রয়েছে এই প্যাকেজে। সরকার এবার থেকে নতুন কর্মীদের প্রথম তিন বছরের প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়োগকর্তার অংশভাগ পুরোপুরি দিয়ে দেবে। যেসব শ্রমিকের মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকার কম, তাদের ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফান্ডে শ্রমিকের দেয় অংশ ঐচ্ছিক করে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে তারা হাতে টাকা রাখতে পারেন। কাজের স্থির মেয়াদ, শ্রমের যোগান বাড়াতে সাহায্য করবে এবং চাহিদার সময়ে কাজের সুযোগ বাড়াবে। নির্দিষ্ট মেয়াদের একজন কর্মী কাজের সময়, মজুরি ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রাপ্যের নিরিখে একজন স্থায়ী কর্মীর সমান সুযোগ পাচ্ছেন। ওভারটাইমের ঊর্ধ্বসীমা তিন মাসে ৫০ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১০০ ঘণ্টা করা হয়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের উপার্জন বাড়বে। নতুন এই প্যাকেজ পোশাক শিল্পে আগামী তিন বছরে ১ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সারণি-৪-এ এটি দেখানো হল।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা বিপুল

উপসংহার

কর্মসংস্থান এবং দক্ষ শ্রমশক্তির সম্ভাব্য বৃদ্ধি বিপুল বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। দেশীয় এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ। ভারতকে আন্তর্জাতিক ম্যানুফ্যাকচারিং হাব বা উৎপাদন তালুকে পরিণত করার যে স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেখেছেন, তা সফল হবে। ভারতের রূপান্তরসাধন শীর্ষক বক্তৃতামালার সূচনা-বক্তৃতায় সিঙ্গাপুরের উপপ্রধানমন্ত্রী থারমান শন্মুগুরাতনাম বলেছেন, "বিশ্ব অর্থনীতির নৈরাশ্য ও নেতিবাচক মানসিকতা দূর করতে ভারত প্রস্তুতও—ভারত এখন সামাজিক ও মানবিক মূলধন গঠন, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জন এবং সামাজিক গতিশীলতা সুনিশ্চিত করার ওপর জোর দিচ্ছে।" বস্ত্র-বয়ন ও পোশাক শিল্পে সাম্প্রতিক উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত সরকার নতুন আখ্যান লিখতে সচেষ্ট—রপ্তানি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক রূপান্তর সাধনের আশায় উজ্জ্বল এক আখ্যান। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের সচিব। ইমেল : secy-textiles@nic.in)

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী

কর সংস্কার

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

ভারতে হস্তচালিত তাঁতসম্ভার

আজ-কাল-আগামীর গল্প

*বিত্তশালী ও ক্ষমতাধর তন্তুবায় সমবায় সংঘ এককালে এ দেশে মন্দির এবং রাজারাজরাদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করত। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর ও বাহমনী সাম্রাজ্যের সময়কার সেইসব দিন পরের যুগে আর কখনও ফিরে আসেনি। এজন্য একদিকে যেমন দায়ি তাঁতিদের শোষণে তৎপর বণিক/ব্যবসায়ী শ্রেণি; অন্যদিকে সেই সূত্রে তৈরি হওয়া সামাজিক বৈষম্য। যার হাত ধরে জাতপাতের ভেদাভেদ আরও গভীরে শেকড় ছড়ায় এবং তাঁতিরা শেষ পর্যন্ত জাতব্যবসা আঁকরেই রয়ে যান। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে কাপড়ের মিলে যন্ত্রচালিত বয়ন শুরু হলে এ দেশের পুরুষানুক্রমিকভাবে হস্তচালিত তাঁতের কারবারে যুক্ত মানুষেরা প্রতিযোগিতায় পিছু হটেন, আর্থ-সামাজিক মাপকাঠির নিরিখে দীন থেকে দীনতর হতে থাকেন। কিন্তু জাতব্যবসা 'তাঁত' ছাড়তে পারেননি; কারণ তারা যে আর কিছু কখনও শেখেননি। এভাবেই শাপে বরের মতো ব্যাপারটা ঘটে। টিকে যায় এদেশের হস্তচালিত তাঁতের ঐতিহ্য সম্ভার। আমাদের সৃজনশীল কারিগরি নৈপুণ্য ও নান্দনিক প্রকাশভঙ্গির এই সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের গলা শুনিয়েছেন—***জয়া জেটলি***

সৃজনশীল কারিগরি দক্ষতা এবং নন্দনতাত্ত্বিক প্রকাশভঙ্গির এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার বর্তেছে আমাদের উপর। কিন্তু প্রায়শই বাহ্যিক চাকচিক্যের টানে অন্যান্য সংস্কৃতির প্রতি সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি আমরা, যা একঘেঁয়েমি এবং যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট। এমনটা করার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ অবশ্যই আছে। আমরা কৃষ্টির দিক থেকে এক ভিনগ্রহী কিন্তু সমকালীন দুনিয়ায় কপট আত্মবিশ্বাস এবং নিরাপত্তার খোঁজে সতত তৎপর। ভুলে গেছি, বর্তমানে নতুন যে পরিস্থিতি ও বাস্তবতার সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দেশ, তার সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে আমাদের ঐতিহ্যও, যার মধ্যেই প্রেথিত রয়েছে আমাদের সংস্কৃতির শিকড়। এ হল সেই অনন্য ঐতিহ্য, যা শেষপর্যন্ত ভারতীয় হিসাবে আমাদের নিজস্ব অনন্যতাকে দৃঢ় নিশ্চিত করে।

ভারতকে প্রায়শই আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত স্তরের এক দেশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। বস্ত্র/বয়নের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই এই আধ্যাত্মিক ভাবনাচিন্তার রেশ চোখে পড়ে। দেশের পূর্বাঞ্চলে, বৌদ্ধ ধর্ম/সংস্কৃতির বার্তা বাহক চিত্রিত এবং মুদ্রিত প্রার্থনা ধ্বজা অথবা মন্দিরের পাথরের দেবদেবী মূর্তি তথা রাজা-রাজড়ার কাঁধের উপর শোভাবর্ধনকারী উজ্জ্বল সোনালি সুতোয় বোনা পবিত্র শ্লোক শোভিত রেশম বস্ত্র খন্ড—এসবই তার অনন্য উদাহরণ। নববধূর দীর্ঘ এবং সুখী বৈবাহিক জীবনের কামনা করে আশীর্বাণী বোনা হতো শাড়ির পাড়ে। ওড়িশার হস্তচালিত তাঁতে বোনা ইক্কত শাড়ির আঁচলে মহাকাব্যের উদ্ধৃত অংশ বিশেষ বা সহজ-সরল ভজন বোনা হতো দৃষ্টিনন্দন করার জন্য। ভারতে যে কোনও উপলক্ষে আশীর্বাদকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। কোনও তরুণ যদি জীবনের প্রথম স্বাধীনভাবে উপার্জনের অর্থ দিয়ে নিজের মায়ের জন্য হাতে বোনা একটা শাড়ি কেনে, তার মানেটাও দাঁড়াবে যে সে এক চিরায়ত পবিত্র কর্তব্য পালন করেছে। কারণ, সামান্য এই উপহারের মধ্যে দিয়ে মায়ের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

কোনও জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্রতা নির্দেশ করার ক্ষেত্রে (সাধারণ পরিধেয় বস্ত্রের বুনন ভিন্ন) অধিকাংশ হাতে বোনা বা কারুকার্যময় বস্ত্রই বিশেষ অর্থবাহী তথা তা ব্যবহার হয় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে। এই ব্যাপারটাই ভারতীয় বয়ন (শিল্প)কে এত স্বতন্ত্র এবং অর্থবহ করে তুলেছে। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুষ্টিমেয় কিছু প্রাচীন জনগোষ্ঠী এখনও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এধরনের বস্ত্রাদি ব্যবহার করে। কিন্তু ভারতে মানুষজন যেমন সর্বক্ষণ সর্বক্ষেত্রে উঠতে বসতে ব্যবহার করছে তেমনটা নয়। এর বেশ একটা তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ দেখা যায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। এসব জায়গায় মানুষ বিভিন্ন ধরনের শাল গায়ে দেন, যার বুনন এবং নক্শা বলে দেয়, যিনি পরে আছেন সেই মানুষটি কোন জনগোষ্ঠীভুক্ত তথা তার সামাজিক মর্যাদা কী? একইভাবে ভারতে যত ধরনের হাতে বোনা কাপড় তৈরি হয়, তার প্রত্যেকটিই কোনও না কোনও বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

ভারতে মুঘলরা আসার আগের যুগে পরিধেয় বস্ত্র ছিল মূলত সেলাই বিহীন। বিভিন্ন মাপের কাপড় খণ্ড হস্তচালিত তাঁতে বোনা হতো, বিভিন্ন ভাবে পরার জন্য। যেমন—ছেলেদের জন্য লুঙ্গি, ধুতি, চাদর, অঙ্গবস্ত্র, পাগড়ি, উত্তরীয়, শাল ইত্যাদি। আর মেয়েদের জন্য শাড়ি, লুঙ্গি, গিঁটবাঁধা (ঊর্ধাঙ্গের) বস্ত্রখণ্ড, মাথার অবগুণ্ঠন, ওড়না, শাল ইত্যাদি। মুঘল সম্রাটরা নিজেদের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা সম্পন্ন কারিগর এ

জরি বসানো হাতে বোনা কাঞ্জিভরম রেশমের শাড়ি।

দেশে নিয়ে আসেন, যার মধ্যে দর্জিও ছিল। পারস্যের শেরওয়ানি, পাজামা, সালোয়ার, কুর্তা, সারারা এবং কুঁচিদার লেহাঙ্গার চলন শুরু হতেই বেনারসের প্রসিদ্ধ হাতে বোনা রেশম এবং বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়ের চাহিদা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। ভারত এবং ইউরোপে চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজপুরুষদের জন্য বস্ত্র সেলাই-এর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে, ব্রিটিশরা যখন ভারতে শাসন করতে আসে, ম্যাঞ্চেস্টার এবং ল্যাঙ্কাশায়ারে কাপড়কলগুলিতে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে যান্ত্রিকীকরণ হয়ে গেছে। সুতরাং সহজবোধ্য কারণেই ঔপনিবেশিক রাজশক্তি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় হস্তচালিত তাঁত বয়ন ক্ষেত্রকে গুঁড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয়। যথেচ্ছ কর বসিয়ে তথা আরও বিভিন্ন ফন্দি ফিকিরকে তারা একাজের হাতিয়ার বানায়। স্বাভাবিকভাবেই জোর যার বেশি, সেই টিঁকে যায়। আর টিঁকে যায় প্রতিদ্বন্দিতার রাডারের বাইরে থেকে যাওয়া নগণ্য সেই সব বস্ত্রসামগ্রী। রোজকার বিবিধ কাজে ব্যবহারের জন্য ছোটো ছোটো বস্ত্রখণ্ড। যেমন—গামছা, পাগড়ি, হাফ-লুঙ্গি, বিছানার চাদর, গায়ে দেওয়ার বা কোনও কিছু ঢেকে রাখার জন্য ওয়াড়, গামছার মতো কোমর বন্ধনী, একই বস্ত্রখণ্ড এরকম বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হতো। এছাড়াও কিছু ধর্মীয় আচারের সঙ্গে জড়িত ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রও টিঁকে যায়। যেমন—হাতে বোনা গাঢ় লাল রঙের কাঁধের উপর ফেলে রাখার বস্ত্রখণ্ড। পাখির নক্শা তোলা এই বিশেষ বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করে কর্ণাটকের থিগালরু আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ভক্তিপ্রদর্শন করে নিজেদের গণ্ডদেশ বিদ্ধ করার প্রথা পালন অথবা উৎসবের সময় আগুনের উপর দিয়ে হাঁটার সময় তারা এই বস্ত্রখণ্ড কাঁধে ফেলে নেয়।

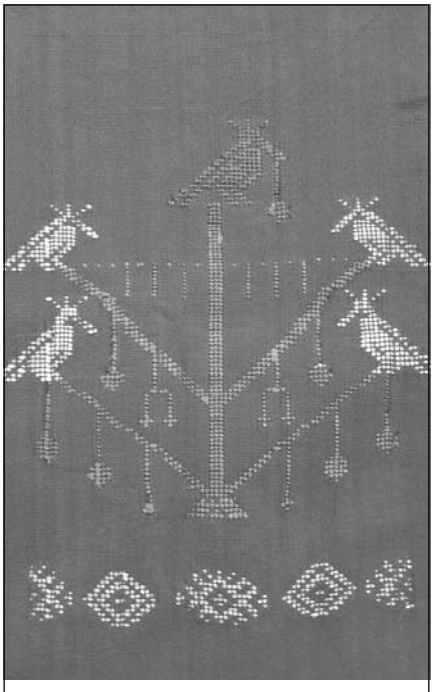

মণিপুরি সুতোর নক্শা

হস্তচালিত তাঁতের ঐতিহ্য সম্ভার যে আজও এ দেশে টিঁকে থাকতে পেরেছে তার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। এরকমই একটি কারণ হল সেই প্রাচীন কাল থেকে কিছু ক্ষেত্রে আদৌ পরিবর্তনের ছোঁয়াই লাগেনি, আজও তা একইরকম রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বুননশৈলী এবং নির্দিষ্ট নক্শা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কাপড় বোনা হয়ে থাকে। এগুলি সবই নির্দিষ্ট অর্থবাহী এবং প্রতিটির গায়েই কোনও না কোনও পবিত্রতার ধারণা আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িত। দ্বিতীয়ত, কোনও ব্যক্তির পরিধেয়-এর মধ্যেই তার নিজস্বতা ফুটে ওঠে। অর্থাৎ, সে কোন জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষ, কোন অঞ্চলে তার বাস বা তার ধর্ম কী—এসবই স্পষ্ট বোঝা যায়। তৃতীয়ত, আবহমান কাল ধরে চলে আসা যে বিষয়টি এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হল জাতিভেদ প্রথা, যা রদ করা একান্ত অসাধ্য কাজ। এর ফলে কী হচ্ছে, বংশানুক্রমিক ভাবে তাঁতিরা তাদের চেনাজানা এই পেশাতেই রয়ে যাচ্ছেন, বা বলা যায় আটকে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। উত্তরাধিকার (পেশাগত) সূত্রে পাওয়া নৈপুণ্যকেই আরও ঘষেমেজে চলেছেন। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য (উঁচু জাতের) মানুষের পেশায় যাওয়ার অবাধ সুযোগ-সামর্থ্য তাদের নেই। বিত্তশালী ও ক্ষমতাধর তন্তুবায় সমবায় সংঘ এককালে মন্দির এবং রাজারাজরাদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করত। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর এবং বাহমনী সাম্রাজ্যের সময়কার সেইসব দিন পরের যুগে আর কখনও ফিরে আসেনি। আসে সে নি, তার জন্য একদিকে যেমন দায়ি তাঁতিদের শোষণে তৎপর বণিক শ্রেণি/ব্যবসায়ীরা; অন্যদিকে সেই সূত্রে তৈরি হওয়া সামাজিক বৈষম্য। যার হাত ধরে জাতপাতের ভেদাভেদ সমাজের আরও গভীরে শেকড় গেড়েছে এবং তাঁতিরা শেষ পর্যন্ত জাতব্যবসা আঁকড়েই রয়ে গেছে। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে কাপড়ের মিলে যখন যন্ত্রচালিত বয়ন শুরু হয়, এ দেশের পুরুষানুক্রমিকভাবে হস্তচালিত তাঁতের কারবারে যুক্ত মানুষেরা আরও বেশি করে জাতব্যবসাকে আঁকড়ে ধরল। এভাবেই শাপে

কর্ণাটকের উপজাতি সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রথাগত উত্তরীয়

বরের মতো ব্যাপারটা ঘটে। টিকে যায় হস্তচালিত তাঁতের ঐতিহ্য সম্ভার।

এ দেশে বস্ত্র-বয়নের অতীত নিয়ে চর্চা করতে গেলে তখনকার দিনে খরিদ্দার কারা ছিলেন, সে ব্যাপারটাও খুঁটিয়ে দেখা দরকার। আগেই যেমনটা বলা হয়েছে, অর্ধ সহস্রাব্দ আগে, পোশাক বলতে কেবল শরীরকে আচ্ছাদিত করার জন্য কাপড় খণ্ডকে বোঝানো হতো, তার পরিমাপ বিভিন্ন রকম হলেও, আলাদা আলাদা 'কাটিং' বা 'শেপ'-এর বিষয়টি ধতর্ব্যের মধ্যে আসত না তখনও। আপামর জনতা তখন পোশাক বলতে নিজেদেরকে বিভিন্ন মাপের কাপড়খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত করতো। হস্তচালিত তাঁতে বোনা সে সব কাপড় তন্তুবায়রা সমাজের সব শ্রেণির খরিদ্দারদের সরবরাহ করতো। মুঘলরা এ দেশে সেলাই করা পোশাক প্রচলন করার পর অভিজাত এবং সমাজের উচ্চকোটির মানুষজন ব্যয়সাধ্য পরিচ্ছদের দিকে ঝোঁকেন। অন্যদিকে, সমাজের নিচুতলার মানুষজন আগের মতোই সাধারণ কাপড়চোপড় পড়তো। তার সঙ্গে অতিরিক্ত হিসাবে পাজামা, ব্লাউজ, কুর্তার মতো দু'চারটি সেলাই করা পোশাক যুক্ত হয়।

আজকের দিনে, শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদেশি সংস্কৃতি ও জীবনশৈলীর অনুকরণ করতে গিয়ে আমদানি করা পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে ঝুঁকছে। ভারতের হরেক রকম ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র সম্ভারের থেকে যোগসূত্র ছিন্ন করেছেন এরা। বিশ্বের ফ্যাশন দুনিয়া হস্তচালিত তাঁতে বোনা কাপড়কে ব্যবহার করতে আদৌ উৎসাহী নয়। অন্যদিকে, আমদানি করা সিন্থেটিকের চাকচিক্য দূর থেকেই গ্রাহকদের প্রায়শই প্রলুব্ধ করে থাকে। কখনও কখনও স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের পরম্পরাগত জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসাবে হস্তচালিত তাঁতে বোনা ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র সম্ভারকে আলাদা ভাবে কদর করলে তাদেরকে বেশ সন্দেহের চোখেই দেখা হয়। তবে ইদানীংকালে নতুন করে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলার মতো ব্যাপার স্যাপার ঘটছে, যা বর্তমান নিবন্ধে পরের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার আগে, ভারত থেকে যে কোনও ধরনের বস্ত্র/কাপড় সম্ভারের বাজার নিয়ন্ত্রিত হতো বাজার শক্তির দ্বারা। সাথে অবশ্য তৎকালীন শাসকরাও কিছু প্রনিয়ম লাগু করতেন। ১৯৪৭-এর পরে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিকাশ এবং কল্যাণকারী উদ্যোগ গ্রহণ তথা সহায়তা প্রদানের কাজটা করত সরকার। এর শুরুটা হয়েছিল মহাত্মা গান্ধী এবং জাতীয়তাবাদী খাদি আন্দোলনের তরফে প্রচেষ্টার সুবাদে। পরবর্তীকালে, প্রথমে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং পরের দিকে পুপুল জয়াকরের মতো মানুষদের সংগঠিত তদ্বিরের দরুন সরকারের তরফে উল্লিখিত পৃষ্ঠপোষকতার ধারা বজায় থাকে। কারণ, এ সমস্ত মানুষ নিজস্ব প্রভাব খাটানোর মতো জায়গায় ছিলেন। যাই হোক, স্বাধীনতার পরে শিল্পায়নের সূত্রে মিলের কাপড়, সিন্থেটিক এবং যন্ত্রচালিত তাঁতের কাপড় ঢুকে পড়ে দেশের বাজারে। সস্তা দর এবং শ্রমজীবী/চাকরিজীবী শ্রেণির মানুষদের ব্যবহারের দিক থেকে বেশি সুবিধাজনক এসব পোশাক-আশাক। এসব কারণের জন্যই তন্তুবায় শ্রেণির মানুষজনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে থাকে।

প্রথমে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবনের দিকে নজর দেওয়া হয়। এবং পরের দশকগুলিতে বাজার, রপ্তানি তথা ভরতুকির দিকে। কিন্তু এসব উদ্যোগ গ্রহণের আগে বর্তমান হাল হকিকৎ, কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটেছে বা কী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে বা কোন ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি সহায়সম্পদের একান্ত দরকার, এসব দিকে যে গুরুত্ব সহকারে সমীক্ষা চালানো উচিত ছিল, তা আদপেই করা হয়নি। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্যাদি বিবিধ সূত্র থেকে

আধুনিক চান্দের রেশমের হাতে বোনা শাড়িতে "সদা সৌভাগ্যবতী"-র আশীর্বাদ

মহিলারা হস্তবয়নের সব প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত

সহজেই পাওয়া সম্ভব। এসব তথ্য একত্রিত করে তা বিশ্লেষণ এবং নিরীক্ষণের কাজটা যথার্থ পেশাদারিত্বের সঙ্গে এখনও করা হয়ে ওঠেনি। বিক্ষিপ্তভাবে যদি তহবিল বরাদ্দ করা হয়, স্বচ্ছতা এবং কোনও রকম নজরদারির বন্দোবস্ত ছাড়াই, তবে প্রায়শই তা শেষমেশ যার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেই মানুষটি পর্যন্ত পৌঁছায় না। ফলত, বঞ্চিত তন্তুবায় শ্রেণি আরও বেশি দারিদ্র্যে ডুবে যায়। আর একেবারে চরম পর্যায়ে নিজেদের গ্রামের ভিটেমাটি, তাঁত বোনার জাতব্যবসা ছেড়ে ছুড়ে শহরে রিক্সা টানা বা বাদাম বেঁচে রুটি-রুজির সংস্থান করে।

১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে যন্ত্রচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে হস্ত ও যন্ত্রচালিত তাঁতজাত সামগ্রীর পার্থক্য বিষয়ে গ্রাহকদের সচেতন করার তথা যন্ত্রচালিত তাঁতের বাড়বাড়ন্ত নিয়ন্ত্রণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে বেশ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফে হস্তচালিত তাঁত সামগ্রীর প্রচার-প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা উত্তরোত্তর অকাজের বলেই প্রমাণিত হয়, বেসরকারি ক্ষেত্রের চাকচিক্যময় বিজ্ঞাপনের সামনে। দুর্ভাগ্যবশত, শুরুর দিকের এই দায়বদ্ধতা এবং আবেগ আতিশয্য ক্রমশ কমতে থাকে এবং সামাজিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ড, রাজ্যগুলির বিপণন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কাঠামোর মতো আলাদা আলাদা ছোটো পরিসরে ভেঙে যায়। সরকারি হস্তক্ষেপ যথোপযুক্ত দিশাতেই করা হয়; কিন্তু রূপায়ণের ক্ষেত্রে উদাসীনতা, কল্পনাশক্তির অভাব এবং অবহেলা ছিল স্পষ্টতই।

সারা দুনিয়া জুড়েই আগের সেই দশক-গুলিতে খোলা বাজারের সুযোগ সুবিধা তো ছিলই না, একই সাথে সুরুচি সম্পন্ন ক্রেতারও নিতান্ত অভাব ছিল। সুতরাং এব্যাপারটা মেনে নেওয়াই ভালো যে সেসময় বিভিন্ন দিশায় সরকারের হস্তক্ষেপের দরুনই হস্তচালিত তাঁত শিল্প এবং খাদি টিকে থাকতে পেরেছিল, যদিও সংখ্যার দিক থেকে ব্যাপক সংকোচন ঘটে।

হস্তশিল্প এবং বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি এবং অভিজ্ঞ সৃজনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কার্যকরী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হয়। পুনরুজ্জীবন ঘটাতে এবং কল্পনাশক্তির সার্থক প্রয়োগের জন্য একে এক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে সরকারের 'বিশ্বকর্মা প্রকল্প'-এর এবং ১৯৮০-র দশকের প্রদর্শনীগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। একই সাথে উল্লেখনীয় ৭০-এর দশকের শেষের দিকে তথা ৮০-র দশকের গোটাটা জুড়ে সরকারের তরফে আয়োজিত হয় শত শত হস্তচালিত তাঁত সামগ্রীর মেলা (Handloom Expos)। বিগত দু'দশকে বাজার শক্তি ধীরে ধীরে ফের কিছুটা ভূমিকা পালন করছে। ফলত, হস্তচালিত তাঁত শিল্প ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন ঘটছে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কার্যকরী বিপণন প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটছে, ফ্যাশান দুনিয়ায় উপাদান হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে তথা ভারতীয় বয়নের প্রচার-প্রসারের সঙ্গে জড়িত প্রোমোটারদের, যাদের সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ছে, তাদের স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে।

হস্তচালিত তাঁতশিল্প ক্ষেত্রে নতুন করে জোয়ার আনতে হলে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা দরকার। দয়াদাক্ষিণ্যের যোগ্য এক ক্ষয়িষ্ণু ক্ষেত্র হিসাবে নয়; বরং একে দেখতে হবে বিবিধ সম্ভাবনাময় এক ক্ষেত্র হিসাবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিকাশের জন্য চলতি প্রকল্প এবং 'যোজনা'গুলিতে আরও বেশি বাস্তব উপযোগী ধাঁচে রদবদল ঘটাতে হবে। আরও বেশি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া দরকার অপ্রথাগত, মূলত বেশি করে স্ব-নিযুক্ত ক্ষেত্রের হস্তশিল্প কারিগরদের দিশা দেখাতে। কীভাবে তারা 'মুদ্রা' ঋণ পেতে পারেন; নতুন উদ্যোগ (start-up) স্থাপনের ক্ষেত্রে কী রকম সরকারি সহায়তা পাওয়া যায়; 'Skill India' কর্মসূচি থেকে কীভাবে তারা উপকৃত হতে পারেন—এসব তাদের ভালোভাবে জানাতে বোঝাতে হবে। ব্যাংক কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও বেশি করে সংবেদনশীল করে তুলতে হবে, যাতে তারা এই ক্ষেত্রে যথাযথ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হন। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MNREGA) তন্তুবায়দের কোনও উপকারে আসেনি; কোনও হারিয়ে যেতে বসা কারিগরি নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়নি তাদের। দক্ষতা বা নৈপুণ্যকে (মুষ্টিমেয়র মধ্যে) সংরক্ষিত করে রাখাটা প্রায়শই আদৌ কোনও উপকারে আসে না। দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্তাব্যক্তি, হস্তচালিত তাঁত ক্ষেত্র এবং MNREGA-এর মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় গড়ে তোলা গেলে বিপরীত উদ্দেশ্যে কাজ চলার মতো পরিস্থিতি এড়ানো যাবে।

ন্যায়সংগত দামে সঠিক গুণমানের সুতোর জোগান পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে।

কাঞ্জিভরমের রাস্তায় টাঙ্গানো সুতো

সুতোর পরিবর্ত হিসাবে অন্যান্য তন্তু, যেমন—পাট, জৈব তুলো ও শন (linen) ব্যবহারের বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এই ব্যাপারটির দিকে ঠিকমতো নজর দিতে হবে। এটা এমন একটা এলাকা, যেখানে বয়ন এবং ফ্যাশন দুনিয়া উদ্ভাবনী অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসাবে একসাথে পা রাখতে পারে। হস্তচালিত তাঁতে বয়ন উপযোগী নতুন ধরনের কাপড় (fabric) এবং বুনট (texture) সৃষ্টি করা যেতে পারে ফ্যাশন দুনিয়ার প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে। চটজলদি ফ্যাশন শো বা বিক্ষিপ্ত ভাবে 'প্রোমাশনাল ইভেন্ট'-এর আয়োজন না করে অন্তত বছর দুয়েক ধরে যদি এব্যাপারে খেটেখুটে কাজ করা যায়, তাতে আখেরে সুফল মিলবে।

প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহারে উৎসাহিত করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কারিগরদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। হারিয়ে যেতে বসা বিবিধ প্রাকৃতিক রঙ সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করতে হবে। প্রাকৃতির রঙের ব্যবহার পরিবেশ দূষণ কমাতে ব্যাপক সাহায্য করবে। ফলত, বিশ্বজুড়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে কাপড় রাঙানোর ফলে যে বর্জ্য বের হয়, তা কোনও রকম ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াই মাটিতে মিশে যায়। ভারতে গোটা দেশ জুড়েই প্রাকৃতিক রঙ বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার এখনও বর্তমান। কাজেই, ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক রঙ আমাদের অনন্য সম্পদ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পাহাড়ি এবং উপকূল অঞ্চলে সুলভে মেলে এমন বিবিধ প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। বাঁশ, আনারস, কলা ইত্যাদি গাছপালা থেকে আন্তর্জাতিক প্রযুক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে তন্তু তৈরি করা যেতে পারে। এরকম নতুন ধরনের কাঁচামাল হস্তচালিত তাঁত ক্ষেত্রে নতুন জৈব সম্পদ সৃষ্টিতে তন্তুবায়দের কাজে লাগতে পারে।

অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট এংব নবতম ইন্ডিমার্ট-এর মতো বিশালাকার অনলাইন প্রতিষ্ঠানের সূত্রে বিপননের সুযোগ-সুবিধা দ্রুত ব্যাপক হারে বাড়ছে হস্তশিল্প এবং হস্তচালিত তাঁত ক্ষেত্রে। ছোট্টো ছোট্টো বহু বেসরকারি উদ্যোগ তাদের তৈরি অনন্য হস্তচালিত তাঁত সামগ্রী অনলাইনে নির্দিষ্ট গুটিকয় খরিদ্দারের হাতে নিয়মিত তুলে দিচ্ছে। এসব বাজারের উপকারিতা কী এবং চোরা ফাঁদ কোথায় কোথায় পাতা আছে, সেই ব্যাপারগুলো তন্তুবায়দের জেনে বুঝে নেওয়াটা জরুরি। তাহলেই তারা নির্ধারিত সময়সূচি এবং বরাৎ অনুযায়ী পণ্য জোগান দেওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে বাজার দখল করতে পারবেন। নিজেদের পণ্য সামগ্রী, নৈপুণ্যকে সর্বসাধারণের সামনে মেলে ধরার জন্য হস্তশিল্প কারিগরদের নিজস্ব 'ফেসবুক অ্যাকাউন্ট', এমনকী ওয়েবসাইট খুলতেও শিখতে হবে।

এক রাজ্য থেকে অনত্র বিক্রিবাট্টার জন্য পণ্য সামগ্রী পাঠাতে কাগজপত্রের সেসব আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করতে হয়, আমাদের সহজ সরল অথচ প্রতিভাধর তন্তুবায় এবং তন্তুবায় উদ্যোগগুলির তা বোধগম্য হয় না। নতুন 'পণ্য ও পরিষেবা কর' (GST) ব্যবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবায়িত হচ্ছে, আন্তঃরাজ্য পণ্য আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বর্তমান নিয়মকানুন জটিল এবং সেই সূত্রে বহু মানুষের কাছে অজানাই থেকে যাবে। করারোপ সংক্রান্ত ভয়ভীতি এবং আজকের দিনের এ সংক্রান্ত আধুনিক পন্থাপদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞতার দরুন বাজারের সাবলীল নাগাল এবং ব্যাপক প্রসার খুব বেশি করে বাধার মুখে পড়ছে।

দেশের বাজারে বিক্রিবাট্টা বাড়ানোর জন্যও এক বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে। এর ফলে ক্রয়ক্ষমতা, সাংস্কৃতিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক অভিরুচি বাড়বে। ভারতীয় রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নানাবিধ উদ্দেশ্যসাধন বিভিন্ন ধরনের বাজারের বিকাশ ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে রপ্তানি বাজারের দিকে বাড়তি নজর দিতে হবে; বিষয়টিকে আর উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। এখানে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। হস্তচালিত তাঁত শিল্পে এখনও পর্যন্ত একসাথে সঠিক গুণমানের বিপুল পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয়নি বলে রপ্তানি বাজারে এই পণ্য সম্ভারের জোগান খুব বেশি সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে যন্ত্রচালিত তাঁতে উৎপাদিত পণ্য সম্ভারই হস্তচালিত তাঁতজাত বলে বিক্রি এবং রপ্তানি করা হয়ে থাকে। বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে এই ব্যাপারটি একদিন না একদিন আমাদের সামনে গুরুতর সমস্যা ডেকে আনবে।

সরকারের সাথে এক স্বচ্ছ, খোলামেলা এবং অকপট অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে সহযোগী হিসাবে একসাথে মিলে মিশে কাজ করার জন্য অ-সরকারি ক্ষেত্রকে এখন পর্যন্ত টেনে আনা যায়নি। এদেরকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। অ-সরকারি সংস্থাগুলি (NGOs) যাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করার

জন্য প্রস্তাব জমা দেয় সেজন্য সরকারের তরফে বিশেষ চেষ্টা চালাতে হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, NGO-গুলির কর্মকাণ্ড যে অঞ্চলে, সেখানে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি সুফল দেবে, সে ব্যাপারে যদি তারা সরকারকে অবহিত করে, তবে সেই যথার্থ বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতেই আরও বেশি কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়ন করা সম্ভবপর হবে।

গোটা দেশ জুড়ে বহু তন্তুবায় পরিষেবা কেন্দ্র (Weavers Service Centre) গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯৮০-র দশক জুড়ে এগুলি বেশ কার্যকরভাবে কাজ চালিয়েছে এবং আজও চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত স্থানীয় স্তরেই এগুলি ভালো কাজ করছে এবং বাইরের লোকেরা এ সম্পর্কে জানেন কম। এসব কেন্দ্র তন্তুবায়দের সঙ্গে যোগসূত্র এবং শক্তিশালী আদানপ্রদান ব্যবস্থা গড়ে তুলে সুন্দর সুন্দর প্রদর্শনী, প্রদর্শন ও বিকাশ কেন্দ্র ইত্যাদির বন্দোবস্ত করতে পারে। এগুলিকে যুগোপোযোগী করে আকর্ষণীয় ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে ডিজিট্যাল তথ্য ব্যবস্থার আওতায় আনা যেতে পারে। ফলত, স্বচ্ছতা বজায় থাকবে এবং সংগৃহীত তথ্যদি (data) প্রয়োজন মতো আদান প্রদান করা যাবে। উল্লিখিত কেন্দ্রগুলির কার্যকলাপ এবং ব্যাপকতর সম্ভাবনার জায়গাগুলি চিহ্নিত করতে স্বাধীনভাবে সমীক্ষা চালানো বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। অথচ তন্তুবায়দের গাউড করতে এবং সাধারণ মানুষের কাছে সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলির দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে তা জরুরি। চাহিদা বাড়লে সুদক্ষ নিপুণ কারিগরির তন্তুবায়দের সাহায্য করতে শিক্ষনবিশ তাঁতিদের দলকে কাজে লাগাতে পারে এসব কেন্দ্র। ফলে শেষোক্ত শ্রেণি সাহায্য করতে গিয়েই অনেক কিছু শিখে নিতে পারবে। তথ্য-সংরক্ষণ (documentation) উত্তর-পুরুষদের জন্য নিতান্ত জরুরি। কাজেই এই বিষয়ে কাজ করতে কেন্দ্রগুলিতে উৎসাহপ্রদান করতে হবে এবং সংগৃহীত তথ্যাদি অনলাইন আদানপ্রদানের সুযোগ করে দিতে হবে।

আগামী দিনে কোন পথে হাঁটতে হবে, তা নির্ধারণ করার জন্য এক বড়োসড়ো মাপের দক্ষতা সমীক্ষা কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। এই কর্মসূচিতে তন্তুবায় জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বর্তমানে কী কী ধরনের কারিগরি দক্ষতা/নৈপুণ্য বজায় আছে তার একটা মানচিত্র তৈরি তথা তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার দিকগুলিকে সমীক্ষার আওতায় আনতে হবে। এর ফলে, নির্দিষ্ট রীতিবদ্ধ পন্থায় তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। ফটোগ্রাফি, হিসাবরক্ষণ, শো-উইন্ডো বিন্যাস, প্রদর্শনী সজ্জা, মানুষজনের চাহিদামতো নির্দিষ্টভাবে প্যাকেজিং এবং অন লাইন বিক্রিবাটার জন্য নিয়মবিধি প্রস্তুত ইত্যাদি নতুন নতুন দক্ষতা যোগ করা গেলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে নৈপুণ্যের প্রসার ঘটানো সম্ভবপর হবে।

আজকের দিনে হস্তচালিত তাঁতকে ঘিরে আগ্রহের এক সাড়া জাগানো বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। একে, বিশ্বজুড়ে চালু নামীদামি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের একচেটিয়া কারবারের এক অর্থবহ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যেতে পারে। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। উল্লিখিত ব্র্যান্ডের পণ্য সামগ্রী গোটা বিশ্বের বাজারেই একই প্রকরণ ও মানের; অর্থাৎ কিছুদিনের মধ্যেই একঘেঁয়েমি আসতে বাধ্য। পক্ষান্তরে, ভারতের হস্তচালিত তাঁতজাত খাঁটি সুতির তন্তু থেকে তৈরি পণ্যসম্ভার ক্রেতাদের 'আম' নয় 'খাস' বৈশিষ্ট্যের স্বাদ জোগাচ্ছে। নির্দিষ্ট ক্রেতার রুচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পণ্য ছাড়াও পরম্পরা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত আন্তরিক উষ্ণতার স্পর্শ মিলছে। মিলছে বিপুল বৈচিত্র্য থেকে পছন্দমতোটি বেছে নেওয়ার সুযোগ। প্রত্যেকের নিজের নিজের যে কোনও দরকার মেটাতে সব ধরনের পণ্যের সুবিধা; সর্বোপরি প্রতিটি বয়নের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোনও না কোনও কৃষ্টির গল্প কথা, পণ্যের সঙ্গে যা উপরি পাওনা।

হস্তচালিত তাঁত-এর প্রসারে উদ্যোগী হতে বহু কোম্পানিকে সাহায্য করেছে সোশ্যাল মিডিয়া। বস্ত্র মন্ত্রকের তরফে চালু করা হয়েছে #Iwearhandlooms ট্যাগ। এপ্রসঙ্গে #100 saris pact-এর মতো পূর্বতন উদ্যোগেরও উল্লেখ করা যায়। পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্তরেও অনেক মানুষ এধরনের উদ্যোগ চালাচ্ছেন। এরই সম্মিলিত ফলস্বরূপ বাজারে এক নতুন খরিদ্দার শ্রেণি উঠে এসেছেন, যারা আন্তরিকভাবে হস্তচালিত তাঁতের দিকে ঝুঁকছেন।

'Make in India', 'Skill India'-র মতো বেশ কিছু অভূতপূর্ব কর্মসূচি হাতে নেওয়ার দৌলতে ভারত বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধির অর্থনীতি হিসাবে আন্তর্জাতিক মহলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পাশাপাশি, আর তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে গণ্য হচ্ছে না, বরং ভারত স্বীকৃতি আদায় করে গিয়েছে এক প্রভূত সম্ভাবনাময় অঞ্চল হিসাবে। এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক পরম্পরার উত্তরাধিকার-সহ আধুনিকতার পরিচায়ক যাবতীয় ক্ষেত্রে ভারত এখন বিকাশের পূর্ণতার দিকে এগোচ্ছে। এই সাফল্য কাহিনীর সূত্র ধরেই, ভারতের হস্তশিল্প, পরম্পরাগত শিল্প এবং হস্তচালিত তাঁতের আগামীদিনে নতুন খরিদ্দার কারা হতে পারেন, সে ব্যাপারে আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। এই সৃজনশীল কৃষ্টিগত সম্পত্তিকে বিশ্বের দরবারে পেশ করার জন্য প্রচার-প্রসার, গুণগত মান বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সত্যি। কিন্তু তার থেকে বেশি করে আজ যেটা দরকার, তা হল হস্তচালিত তাঁতকে পেশা হিসাবে যারা আঁকড়ে আছেন তাদের উৎসাহিত করতে হবে। আজকের গতিশীল প্রাণবন্ত ভারতের এই আর্থিক বৃদ্ধির গল্পের সঙ্গে ওইসব তন্তুবায়দেরও যুক্ত করতে হবে।

সম্ভাবনা অতুল, তবে সমস্যাও আছে অনেক। যাইহোক এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটা হল এক সৃজনশীল এবং অনুপ্রেরণা দানে সক্ষম ব্যবস্থাপত্রের বিকাশ ঘটাতে হবে। ভারতে পরতে পরতে ঐতিহ্যের যে সমহার, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে এই ব্যবস্থাপত্র। এদেশের মানুষের হরেক রকম অনন্য কারিগরি নৈপুণ্য, কলাকৌশল, দক্ষতা, পন্থা-পদ্ধতি আজও বাকি বিশ্বের কাছে অজানাই রয়ে গেছে। তাকে দুনিয়ার সামনে মেলে ধরতে হবে। সর্বোপরি, তন্তুবায় জনগোষ্ঠীর জন্য সার্থকভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দিয়ে তাদের সত্যিকারের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বাদ এনে দিতে হবে। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক 'দস্তকারি হাট সমিতি'-র প্রতিষ্ঠাতা এবং হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প বিশেষজ্ঞ। ইমেল : dastarihaat@gmail.com)

বাংলার হস্ততাঁত শিল্প এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টা

*বাংলার তাঁতশিল্প এককালে বিশ্বজয় করেছিল। কোম্পানির প্রথম আমলে বাংলা থেকে উৎপাদিত কাপড় ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে রপ্তানি হতো। তখন চাহিদার সাথে সাথে রোজগারের জন্য চাষি এবং তার পরিজনেরা হস্ততাঁতে পূর্ণ সময়ের কাজ শুরু করে। বর্তমানে এই শিল্পের ঐতিহ্য অনেকটা ম্রিয়মান। তার অন্যতম কারণ হল আধুনিক ক্রেতাদের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী বস্ত্রসামগ্রী উৎপাদনে কিছুটা অসফলতা। সেই সঙ্গে পাওয়ারলুমে উৎপাদিত সস্তার বস্ত্রসামগ্রী। তাঁত শিল্পের এরকম আবহে বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁত শিল্পের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার, তাঁত শিল্পীদের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে। রাজ্য সরকারের এই সব উদ্যোগ নিয়ে বর্তমান নিবন্ধের স্বল্প পরিসরেও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন—***

রবীন্দ্রনাথ রায়

বাংলার তাঁতশিল্প এককালে বিশ্বজয় করেছিল। বাংলার মসলিনে বোনা জামদানী আর রেশমের বালুচরী তাঁতশিল্পের অনন্য অলঙ্করণ। কোম্পানির প্রথম আমলে বাংলা থেকে উৎপাদিত কাপড় ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে রপ্তানি হতো। তখন চাহিদার সাথে সাথে রোজগারের জন্য চাষি এবং তার পরিজনেরা হস্ততাঁতে পূর্ণ সময়ের কাজ শুরু করে। ধীরে ধীরে বাংলার কয়েকটি জেলায় বিশেষ ধরনের শাড়ি উৎপাদিত হতে শুরু করে। যেমন হুগলি জেলায় বেগমপুরী এবং ধনেখালী শাড়ি, নদিয়ার ফুলিয়া ও শান্তিপুরে টাঙ্গাইল ও শান্তিপুরী শাড়ী এবং জামদানী শাড়ী। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে বালুচরী আর স্বর্ণচরী, নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ জেলা রেশম শিল্প বাংলার তাঁর শিল্পের পীঠস্থান হয়ে ওঠে। বাংলার তাঁত শিল্পে শুধুমাত্র একটি শিল্প নয়, এটি বাঙালির দীর্ঘ বর্ণময় ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বর্তমানে এই শিল্পের ঐতিহ্য অনেকটা ম্রিয়মান। তার অন্যতম কারণ হল আধুনিক ক্রেতাদের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী বস্ত্রসামগ্রী উৎপাদনে কিছুটা অসফলতা। সেই সঙ্গে পাওয়ারলুমে উৎপাদিত সস্তার বস্ত্রসামগ্রী। তাঁত শিল্পের এরকম আবহে বর্তমান রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁত শিল্পের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার, তাঁত শিল্পীদের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে।

তৃতীয় হস্ততাঁত-সুমারি (২০০৯-'১০) অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে হস্ততাঁতে নিযুক্ত পরিবারের সংখ্যা—৪,০৬,৭৬১, হস্ততাঁতে নিযুক্ত শ্রমিক ও সহায়ক—৬,৬৫,০০৬ জন আর হস্ততাঁতের সংখ্যা—২,২৭,৬৯৭।

তাঁত শিল্পীরা অসংগঠিত। সেজন্য এদের নিয়ে প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি এবং একটি শীর্ষ সমবায় সমিতি (তন্তুজ) গঠিত হয়েছে স্বাধীনোত্তরকালে। বর্তমানে প্রায় ৫০০-টি প্রাথমিক তন্তুবায় সমিতি রয়েছে। প্রতিটি সমিতিতে কম করে ১০০ জন তাঁত শিল্পী রয়েছেন। বর্তমানে সমবায় বহির্ভূত তাঁত শিল্পীদের জন্য অন্য প্রকল্প রয়েছে। যেমন—স্বয়ম্ভরগোষ্ঠী (SHG), মহল্লা উন্নয়ন প্রকল্প (Cluster Development Scheme), এবং গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প (Group Approach)। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকাধীন বা মহাজন প্রথার ব্যক্তিগত তাঁত। মহল্লা উন্নয়ন প্রকল্পে তাঁত শিল্পী থাকেন ৩০০ থেকে ৫০০ জন এবং গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পে থাকেন কমপক্ষে ১০ জন।

রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় যেমন মহল্লা উন্নয়ন প্রকল্প এবং গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প চলছে তেমনি কয়েকটি প্রকল্প রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ আর্থিক সহায়তায়ও চলছে। দুটো প্রকল্পের উদ্দেশ্য মোটামুটি একই রকম : (১) তাঁত শিল্পীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, (২) উন্নত তাঁত ও সরঞ্জাম সরবরাহ, (৩) উন্নত নক্শা কেন্দ্র স্থাপন (CAD), (৪) প্রশিক্ষিত ডিজাইনার নিয়োগ, (৫) কর্মশালা তৈরি, (৬) কমন ফেসিলিটি সেন্টার এবং রং কারখানা স্থাপন, (৭) সূতো ব্যাংক স্থাপন, (৮) বাজার সমীক্ষা এবং উৎপাদন পরিকল্পনা, (৯) বিভিন্ন প্রদর্শনী/মেলা, ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মেলা/প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে তাঁতজাত বস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণ।

তাঁত বস্ত্রের বিপণন

বাংলার গ্রামেগঞ্জে উৎপাদিত তাঁত সামগ্রী বিপণনের জন্য ১৯৫৪ সালে থেকে তন্তুজ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে ৮৪-টি বিক্রয় কেন্দ্র এবং সম্প্রতি ফ্লিপকার্ট এবং অ্যামাজনের মাধ্যমে তন্তুজ ই-কমার্স চালু করেছে। এছাড়া সরকারি

রেশমের উপর কাঁথা স্টিচ

সৌজন্যে : Directorate of Textiles, (Handloom, Spinning Mills, Silk Weaving & Handloom Based Handicrafts Division, Govt. of WB—www.westbengalhandloom.org]

প্রচেষ্টায় মঞ্জুষা, বঙ্গশ্রী এবং রেশমশিল্পী মহাসংঘ সীমিত পরিমাণে তাঁত বস্ত্রের বিপণন করছে। ২০১৪ সালে রাজ্য সরকারের বিপণনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ "বিশ্ববাংলা" ব্র্যান্ড স্থাপন। একই ছাদের নিচে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী এবং হারিয়ে যাওয়া প্রচলিত তাঁতবস্ত্র, হস্তশিল্প সামগ্রী, পুস্তক, গান এবং মিষ্ট দ্রব্যের অনন্য সমাহার। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের (৫ শতংশ + ৫ শতাংশ) যৌথ আর্থিক সহায়তায় সমবায় সমিতিগুলোর জন্য চালু আছে "মার্কেটিং ইনসেন্টিভ প্রকল্প"। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বাজারে প্রতিযোগিতা মূল্যে তাঁতবস্ত্র বিক্রয় নিশ্চিত করা। বিগত তিন বছরের তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের গড়ের উপর শতকরা ১০ শতাংশ অনুদান দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকারের অনুপ্রেরণা এবং আর্থিক সহায়তায় ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি শিল্প ও বস্ত্র দপ্তর জেলা স্তরে এবং জাতীয় স্তরে তাঁতবস্ত্র মেলা/প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। শারদোৎসবের প্রাক্কালে আয়োজন করা হয় রাজ্যভিত্তিক বাৎসরিক তাঁতবস্ত্র মেলা "বাংলার তাঁতের হাট"। ২০১৫ সাল থেকে নিউটাউন রাজারহাটে "বিশ্ব বাংলা হাটে" স্থায়ী তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিপণনের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রূপায়িত করছে :

(ক) লিনেন বস্ত্র উৎপাদন প্রকল্প : নদিয়া জেলার ফুলিয়ায় ১০০ শতাংশ লিনেন সুতো দিয়ে হস্ততাঁতে কাপড় বানানো হচ্ছে এবং ডিজাইনার নিয়োগ করে বিভিন্ন পরিধেয় সামগ্রী তৈরি করে অদূর ভবিষ্যতে বিপণন করা হবে।

(খ) সিল্ক ম্যারেজ শাড়ি : নতুন ডিজাইন এবং নতুন ঘরানায় হাল্কা সিল্কের কাপড়, যা বিয়ের সময় মেয়েরা পরতে পারে তার জন্য পাইলট প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়েছে। শীঘ্রই বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে।

(গ) সস্তা মূল্যের সূতি শাড়ি উৎপাদন এবং বিপণন : অর্ধদক্ষ তাঁত শিল্পী যারা উন্নত মানের বস্ত্র উৎপাদনে অক্ষম, তাদের কর্মসংস্থান এবং অন্যদিকে গরিব মানুষ যাতে সস্তা অথচ উপযুক্ত মানের সূতি শাড়ি পান— এই দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে। এর জন্য রাজ্য সরকার প্রতিটি সূতি শাড়ির উপর প্রায় ১০০ টাকা ভরতুকি দিয়ে থাকে। উপরোক্ত শেষ দুটো প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা তন্তুজ।

কাপড়ের পাকা রং এবং রংয়ের গুণমান ধরে রাখার জন্য রাজ্য সরকার ১৪১.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফুলিয়ায় ৪-টি আধুনিক রং কারখানা স্থাপন করেছে।

Geographical Indication of Goods (Registration & Protection) Act, 1999-এর অধীনে এ রাজ্যের তাঁতবস্ত্রের নিবন্ধীকরণের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে বালুচরী, শান্তিপুরী এবং ধনেখালী শাড়ি নিবন্ধীকৃত হয়েছে।

রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের যৌথ প্রয়াসে আরও কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প রয়েছে; যেমন :

(১) মুর্শিদাবাদ মেগা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, (২) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কম্প্রিহেন্সিভ হ্যান্ডলুম

টাঙ্গাইল

সৌজন্যে : Directorate of Textiles, (Handloom, Spinning Mills, Silk Weaving & Handloom Based Handicrafts Division, Govt. of WB—www.westbengalhandloom.org]

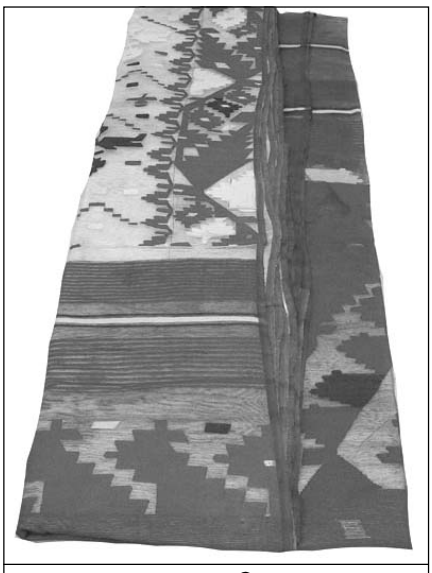

জামদানি

সৌজন্যে : Directorate of Textiles, (Handloom, Spinning Mills, Silk Weaving & Handloom Based Handicrafts Division, Govt. of WB—www.westbengalhandloom.org]

ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, (৩) ন্যাচারাল ফাইবার মিশন প্রকল্প, (৪) ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি (ফুলিয়া, জেলা : নদীয়া) স্থাপন এবং (৫) ইন্টিগ্রেটেড স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিম (ISDS) : ২০১৫-'১৬ আর্থিক বর্ষ থেকে ISDS রূপায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে ২৪৯৫০ জন হস্ত তাঁত শিল্পী প্রশিক্ষিত হবেন।

বাংলার তাঁতশিল্পের আরও প্রসার ঘটাতে রাজ্য সরকারের কয়েকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হল :

(১) পশ্চিমবঙ্গ "হ্যান্ডলুম সারকিট" ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট : ২০১৪,

(২) হস্ততাঁত শিল্পীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র নীতি (২০১৩-'১৮),

(৩) "তাঁতসাথী" প্রকল্প (২০১৬-'১৭) এবং

(৪) "তাঁতশ্রী" প্রকল্প (২০১৬-'১৭)।

● **পশ্চিমবঙ্গ "হ্যান্ডলুম সারকিট" ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প ২০১৪ :**

হস্ত তাঁত শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলনের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। ৩ বছর সময় সীমার মধ্যে ৯৬,১১৪ জন হস্ততাঁত শিল্পী এবং এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কর্মীদের আধুনিক তাঁত ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে হাতে-কলমে প্রশিক্ষিত করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে ৯২-টি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, ৫-টি অ্যাডভান্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং ১-টি হ্যান্ডলুম সেন্টার ফর এক্সসেলেন্স চালু করা হবে। রাজ্য সরকারের কারিগরী শিক্ষা দপ্তরের অধীন West Bengal Handloom Development and Export Promotion Society এই প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। "হ্যান্ডলুম সারকিট"-এর অধীনে State Design Facilitation Centre, বিধাননগর তন্তুজ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ডিজাইনার দিয়ে প্রায় ১২০ জন তাঁত শিল্পী ডিজাইনার হিসাবে প্রশিক্ষিত হয়েছেন।

● **পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র নীতি (২০১৩-'১৮) :**

এই রাজ্যের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫ বছরের জন্য বস্ত্র নীতি ঘোষণা করেছে। এই বস্ত্র নীতিতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার হস্ততাঁত শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এই শিল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকল্প চালু করেছে, যেমন :

(১) প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি এবং হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার বা গ্রুপের ক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধনের জন্য ঋণের সুদে ৬ শতাংশ ছাড়।

(২) তাঁতঘর-সহ বাসগৃহ প্রকল্প, স্বাস্থ্য বিমা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পের সঙ্গে ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পকে সংযুক্ত করা।

(৩) এই বস্ত্র নীতি প্রকাশের ১ বছরের মধ্যে সমস্ত তাঁত শিল্পীকে স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের আওতায় আনা এবং ২ বছরের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী বুনকর বিমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় আনা।

(৪) তাঁত শিল্পীর বাসগৃহে বিদ্যুৎ ব্যবহারকে গৃহস্থালীর খরচ হিসাবে গণ্য করা।

(৫) বর্তমান চালু ১০ শতাংশ মার্কেটিং ইনসেন্‌টিভ (যেখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমান অবদান)-এর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ রাজ্য সরকার দেবে, কিন্তু অনুদানের উর্দ্ধসীমা ৫ লক্ষ টাকা।

(৬) তাঁতবস্ত্র রপ্তানির মূল্যের উপর ১০ শতাংশ হারে ভরতুকি।

● **"তাঁতিসাথী" প্রকল্প :**

তাঁত শিল্পীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক অভূতপূর্ব প্রকল্প (ব্যয় বরাদ্দ : ১২০ কোটি)। সম্ভবত সারা ভারতবর্ষে আর কোনও রাজ্যে এরকম প্রকল্প নেই। রাজ্যের এক লক্ষ তাঁত বিহীন তন্তুবায়দের গর্ত তাঁত (Pit loom) এবং তাঁতের সরঞ্জাম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৪০ শতাংশ তাঁত বিভিন্ন তাঁত শিল্পী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিলি করা হয়েছে।

● **"তাঁতশ্রী" প্রকল্প :**

এই প্রকল্পে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় (৯.৭ কোটি টাকা) একটি সুসংহত তাঁত কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। একই জায়গায় সূতো ও রংয়ের বাজার, তাঁতবস্ত্রের প্রদর্শনী ও বিপণন, ক্রেতা-বিক্রেতা মিলন ক্ষেত্র, তন্তুজের তাঁতবস্ত্র সংগ্রহ কেন্দ্র, হস্ততাঁত উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস, ব্যাংক, ATM এবং তাঁত শিল্পীদের জন্য গেস্ট হাউস। এই প্রকল্পে নদিয়া জেলার নবদ্বীপ এবং বর্ধমান জেলার কালনা ও কাটোয়ার প্রায় পঞ্চাশ হাজার তাঁত শিল্পীরা উপকৃত হবেন।

তাঁত শিল্পীদের শনাক্ত করে তাদের যেমন পরিচয় পত্র (Weavers' Card) দেওয়া হয়েছে, সাথে সাথে অক্ষম তাঁত শিল্পীদের জন্য রাজ্য সরকার "বার্ধক্য ভাতা" চালু করেছে। ৪২৭৯ জন উপভোক্তা এই সুবিধা পাচ্ছেন। রাজ্য সরকার প্রতি উপভোক্তাকে মাসে ৭৫০ টাকা করে প্রদান করে।

নানা চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে হস্ততাঁত শিল্প আজ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে এই শিল্প কিছু স্বকীয়তার দারিদার : যেমন—দূষণহীন শিল্প, পরিবেশ-বান্ধব, স্বল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থানে সুযোগ, কম মূলধনের নিয়োগ, সাধারণ যন্ত্রপাতি এবং অতি অল্প বিদ্যুতের ব্যবহার এবং প্রচুর দক্ষ তাঁত শিল্পী।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তন্তুজ।)

BE FOCUSED

পুজোর গন্ধে চারিদিক ম ম করছে। এরই মাঝে বেজে উঠেছে হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগের রণ দামামা। ক্লার্ক ও গ্রুপ-ডি নিয়োগ হচ্ছে হাজার হাজার। এমন সময় **WBCS** পরীক্ষার্থীরা কিছুটা বিভ্রান্ত। কিন্তু তোমাদের ফোকাসড্ থাকতে হবে। **WBCS** এর কক্ষপথ থেকে লক্ষচ্যুত হলে চলবে না।

WBCS-2014 : অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ঐতিহাসিক সাফল্য

120 জন চূড়ান্ত ভাবে সফল হল WBCS-2014 এর চারটি গ্রুপে

Chandan Das, DSP

Rajni Subba, CDPO

Mohatashim Akhtar, DSP

Aquib Alam, RO

Shayan Ahmed, DSP

Abhishek Basu, EXE

অভিষেক–২০১৬

WBCS-2013 -তে সফল ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হল কলেজ স্কোয়ারে গত ২৮ শে আগষ্ট, ২০১৬। ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দিলেন মাননীয় মন্ত্রী **জাভেদ আহমেদ খান** মহাশয়।

Dibakar Das, DSP

Amartya Debnath, CTO

Nargis Sultana, RO

Md. Habibur Rahaman, RO

Moutoshi Gupta, CDPO

Ripan Baul, DSP

Every exam requires certain orientation that sailed us towards it and for WBCS it is proper strategy and dedication with adequate amount of perseverance. To complete the journey you need to pass through an interview process and this was where I was very much tensed. Academic Association helped me immensely in shaping my views and guide me in the right direction to achieve my goal. **– Suraiya Gaffar, CTO (Rank-1) WBCS-2014**

২০১১ সাল থেকে একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সামিম স্যারের আর্টিকেল পড়ে খুবই উপকৃত হই। ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার স্ট্যাটিজিক দিকগুলির ব্যাপারে অবহিত হই স্যারের লেখা পড়ে। তখন থেকে স্যারের ফ্যান হয়ে যাই। সামিম স্যার ও অ্যাকাডেমিকের অন্যান্য স্যারদের কাছে প্রয়োজনীয় সাজেশন পাই যা ইন্টারভিউ বোর্ডে আমাকে অনেক স্মার্ট, স্বচ্ছ ও সাবলীল করে তোলে। **Samim Biswas, DSP (WBCS 2014), LRO (WBCS 2013)**

অ্যাকাডেমিক টেস্ট সিরিজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইয়ারবুক

সামিম সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে চলেছে ডব্লুবিসিএস প্রিলি পরীক্ষার একমাত্র কমন যোগ্য মকটেস্টের বই **অ্যাকাডেমিক টেস্ট সিরিজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইয়ারবুক** মকটেস্ট গুলি সেট করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং চূড়ান্ত সম্পাদনা করেছেন অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সাম্মানিক ডিরেক্টর সামিম সরকার। এতে আপনি পাবেন **২০টি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ মকটেস্টের প্রশ্ন উত্তর এবং ২০১৬ সালের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সম্পূর্ণ আপডেট। এছাড়াও এতে পাবেন বিগত ৩ বছরের প্রিলি পরীক্ষার সম্পূর্ণ সমাধান। বইটি প্রকাশিত হতে চলেছে ২৫শে নভেম্বর, ২০১৬**

WBCS - 2015 C/D INTERVIEW

আপনি কি জানেন WBCS - 2015 A/B গ্রুপের ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে, কি প্রশ্ন করা হয়েছে ? আপনার সাফল্য 100% সুনিশ্চিত করতে আজই যোগদান করুন আমাদের স্পেশাল গ্রুমিং কোর্সে। এখানে আপনি পাচ্ছেন - ●WBCS -2015 , 2014, 2013, 2012, 2011 ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন ১৫০০+ প্রশ্ন ● কমপ্লিট স্টাডি কিট। ● WBCS টপারদের সামনে প্রচুর মক ইন্টারভিউ। ● আই. এ. এস - টপারদের 'সাকসেস ফান্ডা' ● ACTO, Jt BDO কে প্রথম চয়েস দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি। ● ইংরাজিতে কথা বলার দূর্বলতার দূরীকরণের উপায়। এবং আরোও অনেক কিছু.....

WBCS - 2017 নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে। পোস্টাল কোর্স চালু আছে।

Academic Association
The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in
9674478644
9038786000

Study Centres :
●Barasat-9800946498 ●Uluberia-9051392240 ●Birati-9674447451
●Berharampur-9474582569 ●Paschim Medinipur-9474736230

খাদি : আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক

*দেশের দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের কাছে বাড়তি উপার্জনের পথ খুলে দিতে যে খাদি কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা তাই কালক্রমে হয়ে ওঠে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক তথা জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক। গান্ধীজীর হাত ধরে নেহাতই আর্থিক এক কর্মসূচি কীভাবে হয়ে উঠল রাজনৈতিক সংগ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ার, কীভাবেই বা তা দেশবাসীকে একসূত্রে গাঁথল? লিখেছেন—***এ. আন্নামালাই**

'এ পৃথিবীর সমস্ত জীবিত প্রাণীর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই খাদির মূল বক্তব্য। আশেপাশের জীবকূলের অনিষ্ট সাধন করতে পারে এমন সমস্ত কার্যকলাপ পরিহার করার অপর নামই খাদি। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে যদি এই ধারণা একবার গেঁথে দেওয়া যায়, তাহলে আমাদের ভারত কী অভিনব এবং অনন্য সাধারণ ভূখণ্ড হয়ে উঠবে।' (সিডব্লিউএমজি, ৩৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২০)। গান্ধীজী সকলের মধ্যে খাদির এই মূল ধারণাটা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানবজাতিকে এক সূত্রে গাঁথতে। খাদি শুধু অঙ্গে জড়ানোর জন্য এক বস্ত্র খণ্ড মাত্র নয়। এর মধ্যে রয়েছে গভীর দর্শন, গভীরভাবে এর অনুশীলন প্রয়োজন।

১৯১৭ সালে চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন গান্ধীজী। ভিলওয়ারা গ্রামে এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। কথায় কথায় জানতে পারেন পরনের কাপড়টা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনও কাপড় নেই মহিলার। নীল চাষ এবং নীলকর সাহেবদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করেই মূলত দানা বেঁধে উঠেছিল চম্পারণ সত্যাগ্রহ। যে চাষিদের রক্ত ঝরানো নীল দিয়ে কাপড়-চোপড় রঙ করা হয়, সেই চাষিদের গায়েই কাপড় ওঠে না! একটা সময় তুলো উৎপাদনে আমরা ছিলাম প্রথম সারিতে। কিন্তু সেই তুলো দিয়ে তৈরি পণ্যসামগ্রীতেই কৃষকদের কোনও অধিকার থাকত না। এ দেশে উৎপাদিত তুলো কাঁচামাল হিসেবে চলে যেত ইংল্যান্ডে। ম্যাঞ্চেস্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় কলে সেই তুলো দিয়ে কাপড় তৈরি হতো। সেই কাপড় আবার ফিরে আসত ভারতের বাজারে। কোথায় গেল এ দেশের গৌরবময় অতীত? গান্ধীজী যেখানে জন্মেছিলেন, সেখানেও সুতোকাটা ও বয়নশিল্পের এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের বাজারের রাশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসার পরে রাতারাতি ছবিটা বদলে যায়। নিজেদের কায়েমি স্বার্থপূরণের জন্য ইংরেজ শাসকের দল গ্রামভারতের বয়ন শিল্পের কাঠামোটাই পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

দেশের গৌরবময় বয়ন ঐতিহ্য

এক ফারাওয়ের সমাধিতে নীল দিয়ে রঙ করা এ দেশের সুতির ইক্কত শাড়ির সন্ধান মিলেছে। মহেঞ্জোদাড়োর ধ্বংসস্তূপে পাওয়া গেছে গোলাপি উদ্ভিজ্জ রঙে রাঙানো কাপড় খণ্ড। ভারতীয় উপমহাদেশের অতি চমৎকার কাপড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন গ্রিক ও রোমান ব্যবসায়ীরা। কাপড়ের নানান ধরনের নক্‌শা ও বস্ত্রবয়নের বিভিন্ন ঘরানায় পরিচয় পাওয়া যায় অজন্তা-ইলোরার অপরূপ সব গুহাচিত্রে। এ দেশের এক একটা অঞ্চলে কাপড়ের নক্‌শার স্বতন্ত্র ঘরানা ছিল—কাপড় বোনা, রঙ করা, ছাপ তোলা—বিভিন্ন পর্যায়ে চলত এই নক্‌শার কারুকাজ। অঞ্চলভেদে কাপড়ের মান ও ধরনও হতো আলাদা। বয়ন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা ছিলাম অগ্রগণ্য।

কাপড় ছিল এ দেশের গৌরব, অহংকার। বেশ কয়েকটি দেশ তো ভারত থেকে কাপড়ের আমদানি বন্ধই করে দিয়েছিল। বহু দেশের রাজরাজারা এ দেশের কাপড় ছাড়া অন্য কোনও পরিধানই গায়ে চড়াতেন না। এগুলি সবই হাতে সুতো কেটে এবং হাতেই বোনা হতো। সেই অর্থে একে প্রাচীনকালের খাদি বলা যেতেই পারে।

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যন্ত্রচালিত তাঁত শিল্পের দাপটে ভেঙে পড়ে ভারতের হাতে বোনা বয়নশিল্পের ঐতিহ্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রণীত আইন বলে ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন রীতি চালু হয় এ দেশে। এই নতুন আইন অনুযায়ী, এ দেশে উৎপাদিত সমস্ত তুলো জলের দরে ইংল্যান্ডে রপ্তানি করতে হতো এবং সেসময় ইংল্যান্ডের কাপড় কলে তৈরি কাপড় ছেয়ে গিয়েছিল ভারতের বাজার। এই কাপড় ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিল না এ দেশের মানুষের কাছে। বাধ্য হয়েই এই কাপড় কিনতে হতো তাদের।

দেশের লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় কর্মহারা হয়ে পথে বসলেন। ভারতের ঐতিহ্যবাহী হাতে বোনা বয়ন শিল্পকে জোর করে ঠেলে দেওয়া হল ধ্বংসের দিকে। দেশের বয়ন শিল্পের প্রথাগত জ্ঞান হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে।

খাদি আন্দোলন

এবার এলেন গান্ধীজী...''লন্ডনে ১৯০৮ সালে প্রথম চরখা দেখলাম আমি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এক প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। সে সময় বহু ভারতীয়র সংস্পর্শে আসি। তাদের মধ্যে শিক্ষার্থী ও অন্যান্যরাও ছিলেন। ভারতের

পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হতো। মুহূর্তের মধ্যে একটা কথা বুঝে গিয়েছিলাম যে, চরখা ছাড়া স্বরাজ অর্জন সম্ভব নয়। এও বুঝেছিলাম যে, প্রত্যেককে সুতো কাটতে হবে। তখন তাঁতযন্ত্র ও চরখার তফাৎটা আমি বুঝতাম না এবং 'হিন্দ স্বরাজ'-এ তাঁতযন্ত্র (Loom) শব্দটির দ্বারা আমি চরখা (Wheel)-কেই বুঝিয়েছি (সিডব্লুউএমজি, খণ্ড ৩৭, পৃষ্ঠা-২৮৮)।

গোখলের পরামর্শ মতো এ দেশের মানুষের হালহকিকৎ খতিয়ে দেখতে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন গান্ধীজী। গ্রামগুলির শোচনীয় অবস্থা দেখেছেন নিজের চোখে। বছরের অর্ধেক সময় কৃষকদের হাতে কোনও কাজ থাকে না। চম্পারণ কাণ্ডের পর এ দেশে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করেন তিনি। চাষবাস ছাড়াও চাষিদের জন্য বিকল্প কোনও পেশার কথা চিন্তা করতে থাকেন, যাতে করে তাদের সময় ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার হয় এবং সঙ্গে কিছুটা উপার্জনও হয়। এই সময়ই সুতোকাটা ও কাপড় বোনার কথা তার মাথায় আসে। আহমেদাবাদের কাপড় কলগুলির মালিকদের সাহায্যে আশ্রমে কাপড় বোনার কর্মযজ্ঞ শুরু করেন। পরে আবার উপলব্ধি করেন, এই কর্মযজ্ঞে ভারতের কলকারখানাগুলিই লাভবান হচ্ছে, সরাসরি কৃষকদের কোনও উপকার হচ্ছে না। ব্রোচ-এ অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গুজরাট শিক্ষা সম্মেলনে গঙ্গাবেন মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হয় গান্ধীজীর। ভদ্রমহিলা ছিলেন অত্যন্ত কর্মতৎপর। এঁকেই সুতো কাটার সনাতন পদ্ধতি ও তার যন্ত্রপাতিগুলি খুঁজে আনার দায়িত্ব দিলেন গান্ধীজী। ভারতের তখনকার পরিস্থিতি ছিল এমনই।

'গুজরাটের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রাপ্ত ঘুরে শেষপর্যন্ত বরোদা রাজ্যের বিজাপুরে চরখার খোঁজ পেলেন গঙ্গাবেন। সেখানে বহু লোকের বাড়িতেই এই ধরনের চরখা ছিল...কিন্তু অকেজো কাঠের টুকরো হিসাবে সেগুলোর স্থান এখন হয়েছে কুলুঙ্গিতে। নিয়মিত তুলোর জোগান এবং উৎপন্ন সুতো বিক্রিবাট্টার আশ্বাস পেলে ফের তারা সুতো কাটার কাজ শুরু করতে পারে বলে জানান গঙ্গাবেনকে। এই সুখবরটা আবার আমার কাছে পৌঁছে দেন গঙ্গাবেন' (সিডব্লুউএমজি, খণ্ড ৩৯, পৃষ্ঠা-৩৯১)।

গঙ্গাবেন, মগনলাল গান্ধী ও আশ্রমের অন্যান্য বিশ্বস্ত সহযোগীদের সাহায্যে হাতে সুতো কাটা ও কাপড় বোনার প্রাচীন ঐতিহ্য আবার ফিরিয়ে আনলেন গান্ধীজী। আশ্রমবাসীদের মধ্যেই খাদি নিয়ে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। পরে একে দেশজোড়া আন্দোলনের রূপ দেওয়ার কথা চিন্তা করেন গান্ধীজী। হাতে কাটা সুতো দিয়ে হাতে বোনা কাপড়ের এক নতুন 'ব্র্যান্ড নেম' চালু হয় তাঁর হাত ধরে—'খাদি'। 'খাদি'-র মধ্যে যে দর্শন রয়েছে, তা গান্ধীজীরই অবদান। খাদিকে কেন্দ্র করেই শুরু হল কংগ্রেসের নতুন কর্মসূচি।

স্বদেশি ভাবনা

"স্বদেশির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে খদ্দর। খদ্দর ছাড়া স্বদেশি যেন প্রাণহীন দেহ, শুধু সম্মানজনক সমাধি বা দাহ পর্বের অপেক্ষা। খদ্দরই একমাত্র স্বদেশি কাপড়। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাষায় যদি স্বদেশির অর্থ বিশ্লেষণ করতে হয়, তাহলে বলতে হবে যে স্বদেশি মূল ভাবনাই হল খদ্দরই...অর্থাৎ খদ্দরই স্বদেশির প্রাণবায়ু। স্বদেশির নামে যেসমস্ত জিনিসপত্র তৈরি হচ্ছে সকলে সেগুলি ব্যবহার করছে কি না তা দিয়ে স্বদেশির বিচার করা যায় না বরং এই সমস্ত জিনিসপত্র তৈরির কাজে সকলে অংশগ্রহণ করছে কি না সেই নিক্তিতেই স্বদেশিকে যাচাই করতে হবে। তাই কলে তৈরি কাপড়কে আংশিক অর্থে স্বদেশি বলা যেতে পারে। কারণ দেশের লক্ষ লক্ষ জনতার একটা সামান্য অংশই এই ধরনের কাপড় উৎপাদনে অংশ নিতে পারে। কিন্তু খদ্দর তৈরিতে যোগ দিতে পারে শত সহস্র মানুষ।" (ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৭/৬/১৯২৬)

এইভাবেই স্বদেশি আন্দোলনের পুনর্জাগরণের জমিটা প্রস্তুত করেছিলেন গান্ধীজী। দেশবাসীর কাছে বিদেশি বস্ত্র পরিহার করার আহ্বান জানান তিনি। স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলেন এবং খাদিকে করে তোলেন জাতীয়তাবাদের প্রতীক। অহিংস উপায়ে সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন ও শোষণের প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে 'খাদি'-কেই বেছে নেন তিনি।

বিকেন্দ্রীকৃত উপায়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর কাজেও খাদিই ছিল তাঁর অন্যতম হাতিয়ার। ধীরে ধীরে খাদিই হয়ে ওঠে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। খাদি আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলতে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি।

প্রথম দিকে খাদির সাদা রঙ নিয়ে একটু সমস্যা দেখা দেয়। মহিলাদের জন্য রঙিন কাপড় তখন তৈরি করা যেত না। রঙিন পাড় ছাড়া একদম সাদা কাপড় পরতে আপত্তি ছিল গৃহস্থ বাড়িতে মেয়েদের। কারণ শুধু সাদা শাড়ি বৈধব্যের প্রতীক। তাই সাদা রঙকে পবিত্রতা বা সারল্যের প্রতীক বলে বর্ণনা করেন গান্ধীজী। সাধারণ মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য স্ত্রী কস্তুরবা ও আশ্রমের অন্যান্য মেয়েদের সাদা শাড়ি পরতে বলেন তিনি।

খাদির অর্থকরী দিক

এ দেশের গ্রামের মানুষজন, বিশেষ করে গ্রামের মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথ সুপ্রশস্ত করেছিল খাদি আন্দোলন। এই খাদি আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপুল সংখ্যক মহিলার অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ। গান্ধীজী বলেছিলেন, "যোলো বছরের ঊর্ধ্বে প্রত্যেক সক্ষম নারী ও পুরুষের জন্য তার ক্ষেতে, কুটিরে এবং এমনকী ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামে, কলকারখানায় যতদিন না পর্যন্ত না ন্যায্য পারিশ্রমিক-সহ কাজের ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয় কিংবা প্রত্যেকটি মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপনের অধিকার পূরণ করার জন্য গ্রামগুলির বদলে যথেষ্ট সংখ্যক শহর না তৈরি হয়, ততদিন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীকে প্রকৃত আর্থিক সুরাহা দিতে পারে খদি। আমরা যতদূর কল্পনা করতে পারি ততদিন পর্যন্ত খাদি যে নিজের জমি ধরে রাখতে পারে, এটুকু বোঝানোর জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা।" (খাদি—হোয়াই অ্যান্ড হাউ, পৃষ্ঠা-৩৫)

উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকৃত এই পদ্ধতি আয় বণ্টনের ক্ষেত্রেও একটা সমতা আনবে। গান্ধীজীর মতে, 'উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুমি কোনমতেই সম্পদের সম বণ্টন করতে পারবে না। কারণ মানুষ এতে রাজিই হবে না। কিন্তু তুমি এমনভাবে সম্পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে পার, যাতে উৎপাদনের আগেই ন্যায্য বণ্টন সুনিশ্চিত করা যায়। খাদির ক্ষেত্রে এটা সম্ভব।' 'গ্রামীণ সৌরমণ্ডলে খাদি হল সূর্য। অন্যান্য শিল্পগুলি হল বিভিন্ন গ্রহ, যারা সূর্য থেকে পাওয়া তাপ, অর্থাৎ বেঁচে থাকার রসদের বিনিময়ে সূর্য, অর্থাৎ খাদিকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। খাদি ছাড়া অন্যান্য শিল্পের বিকাশ কোনও মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু গত সফরের সময় আমি এও উপলব্ধি করেছি যে, অন্যান্য শিল্পের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত খাদিও এর চেয়ে বেশি এগোতে পারবে না। গ্রামজীবনের অবসর সময়টুকু লাভজনকভাবে কাজে লাগাতে গেলে গ্রামজীবনের সমস্ত দিক ছুঁয়ে যেতে হবে।' (হরিজন ১৬/১১/১৯৩৪)

কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ চাপ বুঝতে পারছিলেন গান্ধীজী। তাই কংগ্রেসের সাংগঠনিক সহায়তা ছাড়াই আলাদাভাবে খাদি কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯২৫ সালে গড়ে তোলেন নিখিল ভারত তন্তুবায় সংঘ (অল ইন্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন)। এই সংঘের তত্ত্বাবধানের খাদি সংক্রান্ত কর্মসূচি পৌঁছে যায় দেশের প্রতিটি প্রান্তে এবং দেশজুড়ে ব্যাপক সমর্থন পায় এই কর্মকাণ্ড।

স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন প্রতীক

কালক্রমে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠে চরখা এবং খাদি হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক। ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে জনতার শক্তির এক অভূতপূর্ব পালাবদলের সাক্ষী থাকল গোটা দেশ। এ দেশের জনতা একসময় পুলিশের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের সূচনার পরে খাদি বস্ত্র পরিহিত সত্যাগ্রহীদের ভয় পেতে শুরু করে পুলিশ। প্রথমে যা ছিল নেহাতই এক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, তাই ক্রমে হয়ে দাঁড়ায় এক শক্তিশালী রাজনৈতিক হাতিয়ার!

'ক্লোদিং গান্ধী'জ নেশন' গ্রন্থে খুব সুন্দর এক মন্তব্য করেছেন লিসা ত্রিবেদী...'ঔপনিবেশিক প্রজাদের জাতীয় নাগরিকে পরিণত করেছিল খাদি। নতুন ধরনের এই পোশাক প্রচলন করে দেশের অভিজাত মহলকে বৃহত্তর জাতীয় জনসম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তোলার এক সহজ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন স্বদেশির উদ্যোক্তারা। নতুন ধরনের এই পোশাক ঔপনিবেশিক এবং সনাতনী এই দু'টি ঘরানার কাছেই ছিল সমান চ্যালেঞ্জের। একদিকে তথাকথিত খাদি বস্ত্র পরনে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি হিসাবে সর্বজনীন শ্রম ও স্বয়ম্ভরতার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছিলেন...খুব সহজভাবে বলতে গেলে ভারতীয় উপনিবেশের বিভিন্ন অংশের মানুষজনকে এক বা একই ধরনের জনসম্প্রদায়ের অংশ হিসাবে ভাবতে সাহায্য করেছিল খাদি। প্রতিটি মানুষকে একটি অভিন্ন 'ভারতীয়' সত্তায় পুরোপুরি বাঁধতে খাদি যদি ব্যর্থ হয়েও থাকে, তাহলেও বলতে হয় যে, দৃশ্যগতভাবে খাদি ঔপনিবেশিক এবং প্রথাগত ঘরানার বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল।

শহরের বাসিন্দাদের জন্য ফ্যাশন দুরস্ত খাদির কাপড়-চোপড়ের জোগান দিতে গিয়ে কাপড় কলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা রেখে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি কিন্তু মোটেই খাদির মূল লক্ষ্য নয়। খাদির মূল লক্ষ্য কৃষিকাজের পরিপূরক একটি শিল্প হয়ে ওঠা। সেই লক্ষ্য কিন্তু এখনও পূরণ হয়নি।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য খাদি কর্মকাণ্ডকে স্বয়ম্ভর হতে হবে এবং গ্রামগুলিতে খাদির ব্যবহার ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামগুলি যেমন নিজেদের সারা বছরের খোরাকির ফসল যা নিজেরাই ফলায়, তেমন করেই ব্যক্তিগত পরিধানের খাদিও তাদের নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে। বাড়তি যদি কিছু থাকে, তবে তা বিক্রি করা যেতে পারে। (হরিজন, ৬/৭/১৯৩৫)

আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

শ্রমের মর্যাদা, বিকেন্দ্রীকরণ, অহিংসা এবং সারল্য—খাদির এই মূল দর্শনের সঙ্গে আপস না করেও একে কীভাবে আরও সুলভ ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বা 'স্বদেশি আন্দোলন'-এর মতো চালিকাশক্তির অনুপস্থিতিতে নিজস্ব দর্শনের জোরে এখন টিকে থাকতে হবে খাদিকে।

সূতিবস্ত্র পরিবেশবান্ধব, আমাদের দেশের আবহাওয়ায় ভীষণ উপযোগী, ত্বকের পক্ষে ভালো এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক। কাপড় কলে তৈরি সমস্ত রকমের সূতিবস্ত্রের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহারের মধ্যেই খাদির আসল পরীক্ষা। খাদির ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী উপযুক্ত প্রযুক্তি বেছে নিলে উৎপাদন প্রক্রিয়া হবে পরিবেশ-বান্ধব। বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন পদ্ধতির ফলে সাধারণ মানুষের কাছে আয়ের ন্যায্য বণ্টনের পথ প্রশস্ত হবে। আয়ের ন্যায্য বণ্টন সম্ভব হলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে।

দীর্ঘস্থায়ী ও পরিবেশ-বান্ধব বিকাশের পথে সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে খাদি। খাদি আন্দোলনকে আমজনতার আন্দোলন হয়ে উঠতে হবে এবং খাদিকে আমাদের জাতীয় পোশাক করে তুলতে হবে। জনসাধারণের মানসিকতা ইচ্ছেমতো গড়ে নেওয়া যায় এবং জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি খাদির সপক্ষে অনুকূল করে তুলতে হবে, আমাদের যাতে তারা খাদিবস্ত্র ব্যবহারে উৎসাহী হন। খাদির ব্যবহার ছড়িয়ে দিলে মানবজাতির এক প্রাচীনতম দক্ষতাকে ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে পারব আমরা।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক ন্যাশনাল গান্ধী মিউজিয়ামের অধিকর্তা। ইমেল : nationalgandhimuseum@gmail.com)

ভারতের কাপড় ও পোশাক রপ্তানির নয়া বাজার

প্রাক্-শিল্প যুগে ভারত ছিল বৃহত্তম কাপড় রপ্তানিকারী দেশ। কম দাম অথচ সরেস ভারতের কাপড়ের বেশ ভালো বাজার ছিল বিদেশে। এদেশি বয়নশিল্পীরা বহু ধরনের কলাকৌশলে নিপুণ ছিলেন। চাহিদার রকম ফেরের সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতে পারতেন চটজলদি। বিশ্ব বাজারে ভারতের সেদিন আর নেই। চিন এখন সবচেয়ে বড়ো রপ্তানিকারী। বস্ত্রশিল্পে এগিয়ে আসছে বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ইথিওপিয়া ও মায়ানমারের মতো দেশ। বস্ত্র রপ্তানিতে মূলত আমেরিকা ও ইউরোপীয় সংঘের উন্নত বাজার ভারতের ভরসা। তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে রপ্তানি বাড়ানোর কিছু সুলুকসন্ধান দিয়েছেন কলমচি—**অদিতি দাস রাউত**

প্রাক্-শিল্প যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতের খ্যাতি ছিল তার রকমারি কাপড়ের সুবাদে। ইবন বতুতার মতো বহু বিদেশি পর্যটক সুলতানি আমলের বাজারে অত্যুৎকৃষ্ট কাপড়ের পসরার ফলাও করে বিবরণ দিয়ে গেছেন। সুপ্রাচীনকালে ভারতের কাপড় পাড়ি দিত চিন, ইন্দোনেশিয়া এবং রোম সাম্রাজ্যে। একসময় রোমের বাণিজ্য নৌবহরের জায়গা নেয় আরব বণিকরা। তারপর এই বাণিজ্য চলে যায় পর্তুগিজদের হাতে। এ ঘটনা পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ভাস্কো দা গামা ভারতে পৌঁছনোর পরে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি এ দেশে ঘাঁটি গাড়ে এবং লাভজনক এই বাণিজ্যে ভাগ বসায়। ভারত ছিল বৃহত্তম কাপড় রপ্তানিকারী। কাপড়ের ব্যবসা তুঙ্গে ওঠে আঠারো এবং উনিশ শতকে।

মুঘল যুগে বাইরে থেকে এ দেশে আসত মূলত সোনারুপো, রেশম, ঘোড়া, হাতির দাঁত, মণিমানিক্য, মখমল ও সোনারুপোর জরি। রপ্তানির মধ্যে ছিল হরেক ধরনের কাপড়, নীল, মসলাপাতি এবং অন্যান্য পণ্য। স্থলপথ ছিল বিপজ্জনক। বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র ও নদীপথ ছিল অনেক বেশি সুবিধের। শত শত বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সমুদ্র বাণিজ্যে রমরমা ছিল ভারতের কাপড়েরই।

কম দাম অথচ সরেস ভারতের কাপড়ের বেশ ভালো বাজার ছিল বিদেশে। এসব বাজারের বিশেষ চাহিদার দিকে খেয়াল রেখে ভারতে সুদক্ষ নক্শাকাররা পোশাকের প্যাটার্ন বানাত। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাত নতুন নতুন বুনন এবং নক্শা নিয়ে। ভারতীয় বয়নশিল্পী ও কাপড় রাঙানোর কারিগরেরা বহু ধরনের কলাকৌশলে নিপুণ ছিলেন। চাহিদার রকমফের হলে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারতেন চটজলদি। ইংরেজি অভিধানে ঠাঁই করে নেওয়া ক্যালিকো, পাজামা, মসলিন, গিংহাম, শাল, ডাংগারি, চিন্টস এবং খাকি শব্দগুলি থেকে ভারতের কাপড়ের জনপ্রিয়তা ঠাহর করা যায়।

বিশ্ব বাণিজ্য

ইতিহাসের ডামাডোল সইতে হয়েছে ভারতের কাপড়কে। ঔপনিবেশিক জমানায়, ভারতে ঢালাও আমদানি হয়েছে কলে তৈরি সস্তার কাপড়। ঘরে বসে হাতে বোনা সুতোর কাপড় মার খেল। বহু তাঁতশিল্পী খোয়ায় তাদের রুজি-রুটি। আর এই খুব হালে, বিশ্বায়ন ও পরিবর্তন হাজির করেছে গুচ্ছের চ্যালেঞ্জের এক যুগ। ভারতের হস্তচালিত তাঁতের রকমারি সম্ভাড় তা সত্ত্বেও টিকে আছে মহার্ঘ পণ্যের তকমা নিয়ে। বাজারে আছে এর এক আলাদা কদর।

গত কয়েক বছর জুড়ে, বিশ্বে বাণিজ্যে চলছে মন্দা। উন্নত বড়োসড়ো দেশগুলিতে এই মন্দার কমবেশি প্রভাব পড়ছে। উন্নয়নশীল জগতে বিকাশ মাঝারিয়ানার। এ বছর বিশ্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির হার ঢিমেতোলে চলে ২০১৫ সালের মতোই ২.৮ শতাংশ থেকে যাবে বলে অনুমান। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হিসেবে ২০১৬ সালে উন্নত দেশগুলির আমদানির পরিমাণ কম থাকবে। উন্নয়নশীল এশীয় দেশগুলিতে অবশ্য আমদানি বৃদ্ধির আশা। সংস্থার অর্থনীতিবিদদের কথায়, ২০১৭ সালে বিশ্ব বাণিজ্য বাড়বে ৩.৬ শতাংশ। বিশ্ব বাণিজ্যে এখন স্বভাবতই চ্যালেঞ্জের পরিবেশ। উদীয়মান অর্থনীতিগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ক্রমশ বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় সংঘের মতো সাবেক বাজার অবশ্য আমাদের কাপড় ও পোশাক-পরিচ্ছদ রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রয়ে গেছে। বড়োসড়ো অনেক উদীয়মান অর্থনীতির দেশ বৃহৎ অর্থনৈতিক আবহের এক চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্ক-সহ প্রায় সব এহেন অর্থনীতিতে ২০১৬ সালে মাঝারি বিকাশ এবং চিনে এর একটু কম হবে বলে হিসেব করা হচ্ছে। বিকাশে এই ভাঁটার টান দীর্ঘদিন চলার সম্ভাবনা।

এই পটভূমিতে, চিনা অর্থনীতিতে মন্দার আঁচের তাৎপর্য অনেকখানি। এর প্রভাব পড়বে উদীয়মান অর্থনীতি, ছোটোখাটো উন্নয়নশীল দেশ ও পরিবর্তনের মুখে দাঁড়ানো, অর্থাৎ সন্ধিক্ষণের দেশগুলিতে। উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে ইউরো অঞ্চলের পলকা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার এর দরুন ঘা খেতে

পারে এ আশঙ্কা আছে বইকি! বহু মহিলা ও অদক্ষ কারিগরদের কাজ জুগিয়ে শিল্পায়নের এক সোপান হিসেবে বহুকাল ধরে বিবেচনা করা হয় কাপড় শিল্পের বিকাশকে। চিনা অর্থনীতি এখন বেশি দক্ষতার অন্যান্য শিল্পকারখানা এবং দ্রুত বেড়ে চলা পরিষেবা ক্ষেত্রের দিকে ঝুঁকছে। এর দরুন সে দেশের অর্থনীতিতে কাপড়শিল্পের পরিসর সংকুচিত হলে, সেই সুযোগ ভারতের কাজে লাগানো উচিত। তা সত্ত্বেও, মনে রাখতে হবে, চিনই থাকবে কাপড় ও পোশাক-পরিচ্ছদের বৃহত্তম রপ্তানিকারী। আমাদের বাজার পছন্দের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলিও। এসব চুক্তি বাণিজ্যের গতিমুখ বদলে দিতেও পারে। আমাদের পক্ষে তা সুবিধজনক নাও হতে পারে।

বিশ্বে কাপড় রপ্তানির বাজার

বর্তমানে বিশ্বে পোশাক-পরিচ্ছদের বাজার ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের। সবচেয়ে বেশি কেনাকাটা হয় ইউরোপীয় সংঘের দেশগুলিতে। বছরে ৩৫ হাজার কোটি ডলার। বিশ্বে চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক বিকাশ হার ৫ শতাংশ। এই হিসেব মোতাবেক ২০২৫ সালে বিশ্বের বাজার দাঁড়াবে ২ লক্ষ ১০ হাজার ডলার।

চিন সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারী। বিশ্বে রপ্তানির ৩৫-৩৯ শতাংশ ওই দেশের কব্জায়। এরপর আছে ইউরোপীয় সংঘ, বাংলাদেশ, হংকং, ভিয়েতনাম, ভারত, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, আমেরিকা ও কম্বোডিয়া। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি, ৩৫-৩৮ শতাংশ আমদানি করে ইউরোপীয় সংঘ। আমেরিকা ও জাপানের আমদানি যথাক্রমে প্রায় ১৮ এবং ৬ শতাংশ। তারপর হংকং, কানাডা, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড এবং চিনের স্থান। এই সাত দেশের আমদানি অবশ্য বেশ কম।

আগামী বছর পাঁচেক বস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদে বড়ো জোগানদার থাকবে চিনই। কাপড় কল তৈরি ও তার আধুনিকীকরণ সে দেশ লগ্নি টানতে বেশ সফল হয়েছে এবং কাপড় কলের যন্ত্রপাতি আমদানিতে তারা অগ্রণী। বিশ্ব বাজারের বাড়বাড়ন্ত হলে তাদের পক্ষে ভালো। তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়তে থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারের মন্দা চিনকে কাবু করতে পারবে না।

ভারতের রপ্তানি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হিসেবে, ২০১৪-তে ৫.৮ শতাংশ শেয়ার নিয়ে বিশ্বে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারী। ওই বছর মোট রপ্তানির অঙ্ক ৪ হাজার ১০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে কাপড়ের অংশভাগ ১৮৩০ কোটি ডলার। এক্ষেত্রে বিশ্বে মোট রপ্তানি ৩১ হাজার ৪০০ কোটি ডলার। পোশাক রপ্তানিতে ভারত ছয় নম্বর। বিশ্বে এই রপ্তানির ৩.৭ শতাংশ ভারতের দখলে। তৈরি পোশাক রপ্তানি বাবদ আয় ছিল ১৮০০ কোটি ডলার। এক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্যের অঙ্ক ৪৮ হাজার ৩০০ কোটি ডলার।

আন্তর্জাতিক বাজারের দৈন্যদশা এবং দেশে জ্বালানি, পরিবহণ বাবদ বাড়তি খরচ ও জটিল শ্রম আইন-সহ বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় বস্ত্রশিল্প রপ্তানিতে বেশ এগিয়ে আমরা। ২০১৫-'১৬ সালে ভারতের মোট রপ্তানিতে বস্ত্রশিল্পের অবদান ছিল ১৪ শতাংশ।

নতুন নতুন উৎপাদন কেন্দ্র

কম মজুরিজনিত ভারতের আপেক্ষিক সুবিধে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মতো দেশ-এর প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে ধীরে ধীরে ক্ষয় পাচ্ছে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী বস্ত্রশিল্পের অবদান সেখানকার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সিকিভাগেরও বেশি। বাংলাদেশ কাপড় ও পোশাকে বিশ্বের এক মূল উৎপাদক কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসতে চলেছে। বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনাম তো আছেই, কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া ও মায়ানমারের মতো দেশও তৈরি পোশাকের বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন নতুন মুখ হয়ে উঠছে। আগামী বছর কয়েকের মধ্যে পোশাক শিল্পে মায়ানমার দ্রুত এগিয়ে আসবে। ২০২০ সাল নাগাদ সেখানকার পোশাক শিল্পে কাজ জুটবে পনেরো লক্ষের মতো মানুষের। সেখানে ২০১৫ সালে এই শিল্পে কর্মীর সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ২ লক্ষ ৩০ হাজার। বিদেশে পাঠাতে আরও বেশি পরিমাণ পোশাক তৈরি ও তার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে মায়ানমার এক জাতীয় রপ্তানি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলক বস্ত্রশিল্পে পাকাপোক্ত ঠাঁই করে নেওয়ার যাবতীয় আবশ্যক রসদ ইথিওপিয়ার আছে—কাঁচামাল, কম মজুরি ও জ্বালানি খরচ। সে দেশের সবচেয়ে বড়ো সম্বল তুলোর স্থানীয় উৎপাদন। বিদেশি লগ্নি টানার লক্ষ্যে কাপড় কলের আধুনিকীকরণে তারা এখন তৎপর। দ্য আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড অপারচুনিটি অ্যাক্ট, দ্য কমন মার্কেট অব ইস্টার্ন অ্যান্ড সাদার্ন আফ্রিকা এবং বহু দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি মারফত রপ্তানির নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। "অস্ত্র বাদ দিয়ে সব কিছু" (এভরিথিং বাট আর্মস) কর্মসূচি মাফিক ইউরোপীয় সংঘের বাজারে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশগুলির জন্য শুল্ক ছাড়ের সুবিধেও পাচ্ছে ইথিওপিয়া।

বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া, মায়ানমার ও ভিয়েতনামের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৬.৬, ৭, ৯.৬, ৭ এবং ৬.৭ শতাংশ। এসব দেশ এখন উৎপাদন ও রপ্তানির নতুন ঠিকানা। চিন থেকে লগ্নি ও উৎপাদন সরে আসতে থাকায় এদের সুবিধে হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উপভোক্তাদের সংখ্যাও ফেঁপে উঠবে। এতে বাড়তি মওকা পাবে কাপড় শিল্পে প্রবেশকারী নতুন দেশগুলি। যাদের অধিকাংশ এশিয়ার দেশ।

টেক্সটাইল ইনটেলিজেন্স লিমিটেডের মতে, ২০০০ সালে দ্য আফ্রিকান গ্রোথ অ্যান্ড অপারচুনিটি অ্যাক্ট রূপায়িত হওয়া ইস্তক আফ্রিকার কাপড় আমদানি বাজারের প্রসার হয়েছে অনেকখানি। সাহারা-লাগোয়া কয়েকটি দেশের জন্য আমেরিকার বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত কাপড় রপ্তানির সুযোগ দিয়ে এই অঞ্চলের বস্ত্রশিল্পকে উৎসাহ জোগানো এই চুক্তির আংশিক উদ্দেশ্য। এই

আইন হওয়ার পর, সাহারা-লাগোয়া কয়েকটি দেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। বেড়েছে এই অঞ্চলে পোশাকের উৎপাদন। মার্কিন বাজারে ঢোকার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার পেতে হলে এসব পোশাক অবশ্যই এই অঞ্চলে (বা আমেরিকায়) উৎপাদিত পণ্য থেকে তৈরি করতে হবে।

নাইজিরিয়া ও ইথিওপিয়ার মতো সঠিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চললে আফ্রিকার অন্যান্য দেশের সম্ভাবনাও বিপুল। আফ্রিকায় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অর্ধেক আসে এগারোটি দেশ থেকে। দেড় কোটি পরিবার মধ্যবিত্ত শ্রেণির। ২০৩০ নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৪ কোটি ২০ লক্ষ। তবে কি না, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং জল ও বিদ্যুৎ-সহ পরিকাঠামো সমস্যাদির দরুন আফ্রিকার সামনে চ্যালেঞ্জ দস্তুরমতো বহাল।

ভারতের কাপড় ও পোশাকের সম্ভাব্য নতুন বাজার

কৌতূহলের কথা, আমাদের কাপড় রপ্তানির প্রধান ১০-টি দেশের সঙ্গে ভারতের কোনও অবাধ বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি নেই। ব্যত্যয় কেবলমাত্র সাফটার সদস্য বাংলাদেশ। রপ্তানি বৃদ্ধি বজায় রাখা সুনিশ্চিত করতে আরও বাজার খুঁজে দেখা জরুরি। তুলো বা পশমের মতো প্রাকৃতিক তন্তুর চেয়ে মানুষের তৈরি কৃত্রিম তন্তুর আন্তর্জাতিক চাহিদা বেশি। কাঁচামালের দাম ও মজুরি বাবদ খরচের ওঠাপড়ার দরুন ছোটোখাটো উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে তা অনিশ্চয়তা ডেকে আনতে পারে। এছাড়া, বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দ্রুত বদলে যাওয়া ফ্যাশন ও খদ্দেরদের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার কেরামতি থাকা চাই।

ভারতের রপ্তানির বেশির ভাগটাই উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের উন্নত বাজারে। সেখানে কিন্তু চাহিদা পড়ার ইঙ্গিত মিলছে। ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) অনুমোদিত হলে প্রতিযোগীদের কাছ থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে ভারতীয় রপ্তানিকারীরা। আগামী দিনে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি আছে উন্নয়নশীল উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলিতে। এসব দেশ তুলনায় উচ্চ বৃদ্ধি হার অর্জন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওই দেশগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থা আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনার দরুন দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাজার বাড়ানোর জন্য লাতিন আমেরিকা, আসিয়ান, ইউরেশিয়া, ওয়ানা (ওয়েস্ট এশিয়ান অ্যান্ড নর্থ আফ্রিকান রিজিয়ন) এবং তুরস্ক, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের দিকে নজর দেওয়া উচিত। রেখাচিত্র-১ এই আভাস দেয়। রেখাচিত্র-১ এবং রেখাচিত্র-২-এ একটা ধাঁচ বা প্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে।

ওয়ানায় বিকাশ হার বেড়ে চলেছে। এই অঞ্চলে ইজরায়েলের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ভারতের আলোচনা এগোচ্ছে। ইজরায়েলি পোশাক শিল্প অধিকাংশ কাঁচামালের জন্য আমদানির মুখাপেক্ষী। পোশাক আমদানিতে সে দেশের চক্রবৃদ্ধি হারে বিকাশ হার ৫ শতাংশ (২০১৫ সালে দেড়শো কোটি ডলার। ভারতের অংশভাগ মাত্র ১ শতাংশ। অবশ্য ইজরায়েল ৬ শতাংশ ঘরসজ্জার কাপড় আমদানি (২০১৫ সালে ২০ কোটি ডলার) করে ভারত থেকে।

আফ্রিকা মহাদেশে তুলো ও কাপড় উৎপাদনে মিশর বৃহত্তম দেশ। মিশরীয় অর্থনীতিতে বস্ত্রশিল্পই সবচেয়ে বড়ো। সেখানকার বস্ত্রশিল্প তন্তু, ফেব্রিক ও অন্যান্য জিনিসের জন্য আমদানি-নির্ভর। মিশরের পোশাক আমদানি এক লাফে চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে ২০১৫ সালে হয় ১৭ শতাংশ (২০ কোটি ডলার)। এতে ভারতের ভাগ ছিল

রেখাচিত্র-১

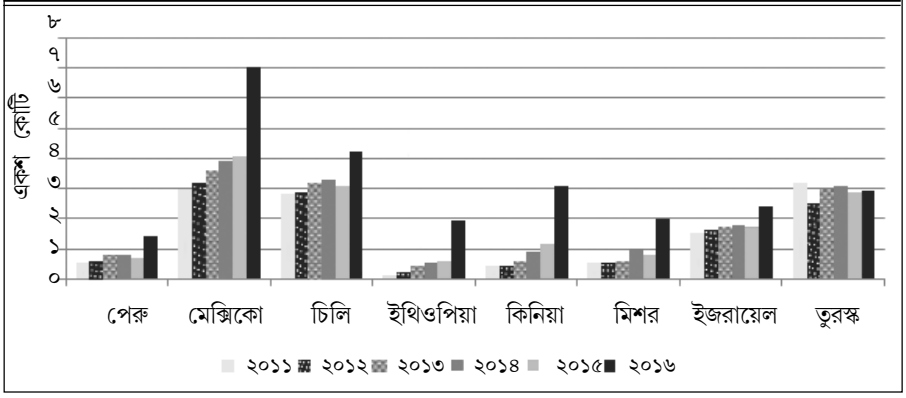

রেখাচিত্র-২

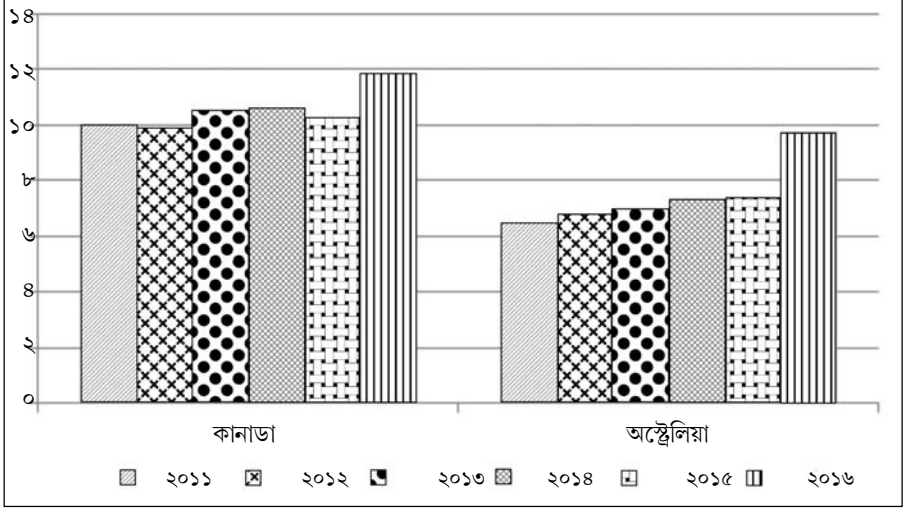

মাত্র ১ শতাংশ। মিশরে কাপড় ও পোশাক শিল্প সব স্তরে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন। বস্ত্র অর্থনীতি মূলত তুলো-নির্ভর। আজকাল অবশ্য দেশটিতে মানুষের তৈরি কৃত্রিম তন্তুজাত বস্ত্রের চাহিদা বাড়ছে। বাড়ছে মানুষের তৈরি কৃত্রিম তন্তুবস্ত্রের আমদানি। ভারত হচ্ছে সে দেশের এক বড়ো জোগানদার।

ভারতে উৎপাদিত মানুষের তৈরি কৃত্রিম তন্তুবস্ত্রের এক মস্ত বাজার তুরস্ক। পোশাক শিল্পের কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিস সেখানে পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় না। সেজন্য ভরসা আমদানি। ২০১৫ সালে তুরস্ক ২৯০ কোটি ডলারের কাপড় ও পোশাক বাইরের থেকে নিয়ে আসে। বর্তমানে এই বাজারের মাত্র ২-৩ শতাংশ ভারতের দখলে।

গত কয়েক বছরে, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ছাড়াও, শক্তি, জ্ঞান আদানপ্রদান এবং জি-২০, ব্রিকস, ইবসার (ইন্ডিয়া, ব্রাজিল, সাউথ আফ্রিকার) মতো বহুপাক্ষিক মঞ্চে লাতিন আমেরিকার সঙ্গে ভারতের গাঁটছড়া বেড়েছে। চিলি ও মার্কোসুরের সঙ্গে ভারতের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি আছে। মার্কোসুর উপ-আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সদস্য হল আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা। সহযোগী দেশ—বলিভিয়া, চিলি, পেরু, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর এবং সুরিনাম। এই বন্দোবস্তের দৌলতে ভারত এবং এলএসি অঞ্চলের (ল্যাটিন আমেরিকা অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান কান্ট্রিজ) ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সামনে বিস্তর সুযোগ হাজির হয়েছে। বস্ত্র বাণিজ্যের দিক থেকে, মেক্সিকো, পেরু ও চিলি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। মেক্সিকো ও চিলি কাপড় ও পোশাকে বৃহত্তম আমদানিকারীদের মধ্যে অন্যতম। ২০১৫ সালে মেক্সিকো, চিলি ও পেরু পোশাক এবং গৃহসজ্জার কাপড় আমদানি করে যথাক্রমে ৪১০ কোটি ডলার, ৩১০ কোটি ডলার ও ৭০ কোটি ডলার। এলএসি দেশগুলিতে স্থানীয় শিল্পসংস্থাগুলি প্রতিযোগিতায় তেমন তুখোড় নয় এবং এই দেশগুলি চাইছে আমদানির জন্য চিনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে। চিলিতে পোশাক ও গৃহসজ্জার কাপড় আমদানির মাত্র ১ এবং ৩ শতাংশ যায় ভারত থেকে। মেক্সিকো মাত্র ৩ শতাংশ করে পোশাক ও ঘর সাজানোর কাপড় আমদানি করে এদেশে থেকে। পেরুর পোশাক ও গৃহসজ্জার কাপড় আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের ভাগ নিছক ২ শতাংশ করে। এসব তথ্য থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে যে এই অঞ্চলের দেশগুলিতে ভারত থেকে রপ্তানি বাড়ানোর ঢের সুযোগ আছে।

অন্যান্য উন্নত বাজার : ওশেয়েনিয়া ও কানাডা

মূল্য সংযোজিত পণ্য (পোশাক) রপ্তানির ক্ষেত্রে চিরাচরিত বাজারগুলির (উন্নত দেশসমূহ) গুরুত্ব অব্যাহত থাকবে। কানাডায় কারিগরি কাপড় শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটছে। সাম্প্রতিক তথ্যের ভিত্তিতে কানাডায় কারিগরি কাপড়ে রপ্তানি ২০১৫ সালের ৮৬০ কোটি মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে হবে ৯৩০ কোটি। কারিগরি কাপড় শিল্পে প্রযুক্তি বদলাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে রপ্তানিও পালটাচ্ছে। উত্তর আমেরিকা হচ্ছে কারিগরি কাপড়ের সবচেয়ে বড়ো উপভোক্তা। কানাডার সঙ্গে ভারতের এক পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির আলোচনা চলছে। ওই দেশে ভারত কারিগরি কাপড় রপ্তানির তত্ত্বতালাশ করতে পারে।

ভারতের কাপড় শিল্পে সবচেয়ে দ্রুত বেড়ে চলা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে কারিগরি কাপড় অন্যতম। এখন বিশ্বে মোট কারিগরি কাপড় উৎপাদনের প্রায় ৯ শতাংশ যা ভারতে। ২০১৩ সালে এক্ষেত্রে অর্থমূল্যে ভারতের উৎপাদন ছিল ১১৬০ কোটি ডলার। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইটিএ) ২০১৬ সালের রিপোর্ট মোতাবেক, ২০১৭ সালে তা বেড়ে হবে ২৬০০ কোটি ডলার।

অস্ট্রেলিয়ায় কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ, জুতো ইত্যাদি উৎপাদনের শিল্প নানা রকমের। তৈরি হয় রেডিমেড পোশাক, কার্পেট, জুতো, গাড়ি শিল্পে ব্যবহার্য কারিগরি কাপড়ের মতো হরেক কিসিমের জিনিস। ২০১৫ সাল নাগাদ অস্ট্রেলিয়ায় পোশাকের বাজার এখনকার আড়াই হাজার কোটি ডলার থেকে বাড়বে সাড়ে চার হাজার কোটি ডলারে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 'কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক কো-অপারেশান এগ্রিমেন্ট' (সিইসিএ) চুক্তি সম্পন্ন হলে ভারত এই বাজারের সুযোগ নিতে পারে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের বাণিজ্য উপদেষ্টা। ইমেল : adrout@nic.in)

To advertise in Yojana (Bengali), contact
(033) 2248-2576/6696

যোজনা (বাংলা) পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে
(০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬/৬৬৯৬ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও একটি আইন

*১৯৮৭ সালের জুট প্যাকেজিং মেটিরিয়ালস অ্যাক্ট (জে. পি. এম. আইন) ভারতীয় পাটশিল্পের রক্ষাকবচ। এটি কার্যকর হবার ফলে নিঃসন্দেহে পাটচাষিদের স্বার্থরক্ষা হয়েছে, বেড়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। অন্যদিকে আবার এই আইনই কীভাবে আত্মতৃপ্তির নিষ্ক্রিয়তা এনে পাটশিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার অন্তরায় হয়েছে, কীভাবে শিল্পটি তার টিকে থাকার স্বার্থে একক পণ্য ও একক বাজারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করাই এই নিবন্ধের মূল উপজীব্য। লিখছেন—***সুব্রত গুপ্ত**

ভারতে দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পাটের স্থান তুলোর ঠিক পরে। পাটের একাধিক আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কিত উপযোগিতা রয়েছে। এটি একটি এমন বায়োডিগ্রেডেবল বা জীবাণু-বিয়োজ্য তন্তু, যা বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দূষণ সৃষ্টিকারী প্ল্যাস্টিকের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। চাষাবাদের ক্ষেত্রে এই তন্তু কৃষকদের পরিপূরক আয়ের সূত্র, কারণ পাটচাষ হয়ে থাকে সেই সব তুলনামূলকভাবে অধিক বৃষ্টিপাত এলাকার নিচু জমিতে, যেখানে অন্য কোনও বাণিজ্যিক শস্যের চাষ সম্ভবপর নয়। পাট চাষের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন আনুমানিক ৪০ লক্ষ কৃষিজীবী মানুষ। তন্তুটির প্রক্রিয়াকরণ এবং পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে কর্মরত রয়েছেন আরও ৩.৫ লক্ষ মানুষ। প্রত্যাশিতভাবেই দেশের পূর্বাঞ্চলীয় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পাটের অবদান যথেষ্ট।

বিগত দুই শতাব্দী ধরে পাটের অপরিহার্যতার অন্যতম কারণ হল এর সামর্থ্য, যাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে নানান ধরনের প্যাকিং সামগ্রী ও মজবুত দড়ি। তুলোর তুলনায় স্থূলত্ব বেশি বলে পোশাক তৈরিতে এই তন্তুর ব্যবহার সম্ভব নয়, তাই সাধারণত প্যাকিং-এর কাজেই এটির ওপর নির্ভর করা হয়ে থাকে। কৃত্রিম তন্তুর প্রচলন ঘটার ফলে প্যাকিং-এর কাজে পাটের ব্যবহার কমতে থাকে। কারণ কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন তেমন ব্যয়বহুল নয়। সর্বোপরি এই তন্তু একাধিক নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণেরও ক্ষমতা রাখে। আজকের দিনে অবশ্য পরিবেশ সচেতনতা বেড়েছে, তাই প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে পাটের ফলন আবার অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

সারণি-১

বর্ষ	কাঁচা পাটের মোট উৎপাদন ('০০০ এমটি)	পাট সামগ্রীর মোট উৎপাদন ('০০০ এমটি)	সরকারি খাতে মোট চাহিদা (বি-টুইল) ('০০০ এমটি)	পাটজাত সামগ্রীর মোট উৎপাদনে বি-টুইলের শতাংশ)	কাঁচা পাট উৎপাদনে বি-টুইলে পাটের শতাংশ
২০০৬-'০৭	১৮০০.০	১৩৫৬.৩	৪০০.৭	২৯.৫	২২.৩
২০০৭-'০৮	১৭৮২.০	১৭৭৬.০	৫৫৭.৯	৩১.৪	৩১.৩
২০০৮-'০৯	১৪৭৬.০	১৬৩৩.৭	৫৭২.২	৩৫.০	৩৮.৮
২০০৯-'১০	১৬২০.০	১৩২৩.৩	৫৩০.৭	৪০.১	৩২.৮
২০১০-'১১	১৮০০.০	১৫৬৫.৭	৬৮৮.৬	৪৪.০	৩৮.৩
২০১১-'১২	১৮৪৫.০	১৫৮২.৪	৮৬৪.২	৫৪.৬	৪৬.৮
২০১২-'১৩	১৬৭৪.০	১৫৯১.৫	৮৮৪.১	৫৫.৬	৫২.৮
২০১৩-'১৪	১৭৮২.০	১৫২৭.৭	৭৭৮.১	৫০.৯	৪৩.৭
২০১৪-'১৫	১২৯৬.০	১২৬৭.১	৭২৭.৫	৫৭.৪	৫৬.১
২০১৫-'১৬	১৪৪০.০	১২১৭.২	৮২৯.০	৬৮.১	৫৭.৬

টীকা : বি-টুইলের উল্লেখ সরকার কর্তৃক সরাসরি চটের বস্তা ক্রয় সংক্রান্ত

দামের দিক থেকে অনেক সস্তা বলে, এক সময় প্ল্যাস্টিকজাত প্যাকিং সামগ্রীর যথেচ্ছ ব্যবহার পাটকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয়। সিমেন্ট, সার প্রভৃতি উৎপাদন সংস্থায় প্ল্যাস্টিক প্যাকিং সামগ্রীর ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই প্রেক্ষিতে চটকল ও পাট চাষিদের স্বার্থরক্ষার্থে বিশেষ করে চটের বস্তার ওপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে একটি আইন প্রণয়ন করার কথা ভাবা হয়।

জুট প্যাকেজিং মেটিরিয়ালস অ্যাক্ট : আশীর্বাদ না অভিশাপ

১৯৮৭ সালের জুট প্যাকেজিং মেটিরিয়ালস অ্যাক্ট (প্যাকিং সামগ্রীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ব্যবহার) প্রজ্ঞাপিত হয় ওই বছরের ১১ মে তারিখে। পাটজাত সামগ্রীর মোড়ক, আবরক বা আধারের ব্যবহারে কী কী পণ্য বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে, তা প্রতি বছর সরকারের থেকে ওই আইনের আওতায় নির্দিষ্ট করা হয়। বিগত তিন দশকে ওই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে ভারতীয় পাটশিল্প নিঃসন্দেহে লক্ষণীয়ভাবে উপকৃত হয়েছে।

বিশ্বের আর এক প্রথম সারির পাট উৎপাদক দেশ বাংলাদেশে এই সেদিন পর্যন্ত এ ধরনের কোনও আইনি রক্ষাকবচ ছিল না। সে দেশে বাধ্যতামূলক জুট প্যাকেজিং মেটিরিয়াল, ২০১০ কার্যকর হয় ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে। আদতে আইনটি ২০১৪ সাল শেষ হবার আগে পর্যন্ত কার্যকর হয়নি বলে খবরে প্রকাশ। বিভিন্ন পণ্যের মোড়ক বা আধার হিসাবে সে দেশের সরকার ভারতের মতো সরাসরিভাবে পাটের বস্তা কেনে না। প্যাকিং সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার পরোক্ষভাবে সহায়তা ও সমর্থন দিয়ে থাকে। নিহিতার্থ হল, বাংলাদেশে পাটশিল্পের স্বার্থরক্ষায় সংশ্লিষ্ট আইনটির কার্যকারিতা নির্ভর করছে পাটজাত প্যাকিং ব্যবহারে সে দেশের সরকার বেসরকারি বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে কতটা উৎসাহিত করতে পারছে তার ওপর।

ভারতে বর্তমানে খাদ্যশস্য ও চিনির প্যাকেজিং-এ চটের বস্তা ব্যবহৃত হচ্ছে। খাদ্যশস্যের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তা ও গাঁটরির অধিকাংশই সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি চটকলগুলি থেকে কেনা হয়ে থাকে। জে. পি. এম. আইনের রক্ষাকবচের দিকটি সারণি-১-এ স্পষ্ট করা হয়েছে। বিগত দশকে (২০০৬-'০৭ থেকে ২০১৫-'১৬) পাটজাত সামগ্রীর মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক খাদ্যশস্য প্যাকেজিং-এ চটের বস্তা এবং কাঁচা পাটের মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্যাকেজিং-এ কাঁচা পাটের ব্যবহার সংক্রান্ত অনুপাত আলোচ্য সারণির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

খাদ্যশস্য ও চিনি উভয় পণ্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ১০০ শতাংশ প্যাকেজিং-এর ধারাবাহিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত ঘটনা হল সংরক্ষণের দ্বারা ওই দুই পণ্যের সংগ্রহ চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী বৃদ্ধি পেয়েছে কেবলমাত্র বিগত দশকটিতে। সরকারি প্রয়াসে ২০০৬-'০৭ সালে ৪ লক্ষ এমটি বি-টুইল ক্রয়ের তুলনায় ২০১৫-'১৬ সালে কেনা হয় প্রায় ৮.৩ লক্ষ এমটি বি-টুইল, যা কিনা এক দশকে মাত্র ১০৭ শতাংশ বৃদ্ধি! আলোচ্য সময়ে কাঁচা পাটের উৎপাদন ১৮ লক্ষ এমটি থেকে কমে হয়েছে ১৪.৪ লক্ষ এমটি। তাহলে আলোচ্য সময়ে কাঁচা পাটের সরকারি সদ্ব্যবহারজনিত কার্যকর সংরক্ষণ বেড়েছে ২২.৩ শতাংশ থেকে ৫৭.৬ শতাংশ। এই একই সময়ে পাটশিল্পজাত সকল সামগ্রীর মধ্যে সরকার কর্তৃক বি-টুইল ক্রয়ের পরিমাণ বেড়েছে ২৯.৫ শতাংশ থেকে ৬৮.১ শতাংশ। বিগত বছরগুলিতে প্রকৃত সংরক্ষণ কতটা বেড়েছে তা নিচের রেখাচিত্র-১-এ তুলে ধরা হল।

আশা করা হয়েছিল যে, সংরক্ষণকালে ভারতীয় চটশিল্পে বিস্তৃতিকরণ, নতুন সামগ্রীর উৎপাদন, নতুন বাজারে প্রবেশ এবং বিপণনের প্রসার ঘটবে। উলটে দেখা গেল যে, চটশিল্প তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে উত্তরোত্তর জেপিএম আইনের শরণাপন্ন হয়ে পড়ছে। আরও লক্ষ্য করা গেল যে, শিল্পটি দেশীয় ও রপ্তানি বাজারে বেসরকারি ক্রেতাদের কাছে পৌঁছনোর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে।

সারণি-২
ভারত ও বাংলাদেশ : পাট সামগ্রীর উৎপাদন ও রপ্তানি

কাঁচা পাট উৎপাদন ('০০০ গাঁট)			মোট রপ্তানি (ভারতীয় লক্ষ টাকার হিসেবে)	
বর্ষ	ভারত	বাংলাদেশ	ভারত	বাংলাদেশ
২০০৮-'০৯	৮২০০	৫১৭২	১২১৬১.৬	৫৬০৪৫.৮
২০০৯-'১০	৯০০০	৫৯৪৫	৮৫৯৪.৬	—
২০১০-'১১	১০০০০	৭৮০৩	১৮৫৪১.৫	৯০৯৪৬.০
২০১১-'১২	১০২৫০	৭৪০৫	২০৯৪৯.৬	৮১৯৪১.৪
২০১২-'১৩	৯৩০০	৭৫৭২	১৯৯১৮.০	৯৬৫৭৮.৭
২০১৩-'১৪	৯০০০	৮০০০	২১২১৯.৫	৮৯১৭২.৭
২০১৪-'১৫	৭২০০	—	১৮১৩৮.১	৯৭২৯৫.৯
২০১৫-'১৬	৬৫০০	—	১৮৮৯৩.৯	১০৯৫৬৫.৫

কাঁচা পাট উৎপাদন (ভারত) : পাট উপদেষ্টা পর্ষদ
কাঁচা পাট উৎপাদন (বাংলাদেশ) : এফএও
রপ্তানি (ভারত) : ডিজিসিআই অ্যান্ড এস, কলকাতা
রপ্তানি (বাংলাদেশ) : বাংলাদেশ রপ্তানি প্রসার ব্যুরো (www.epb.gov.bd)

পাটের তন্তু

বর্তমানে অবস্থাটা এরকম দাঁড়িয়েছে যে, চটশিল্প বেঁচে আছে খাদ্যশস্য প্যাকিং-এর কাজে ব্যবহার্য বি-টুইল বস্তার ওপর, যার একমাত্র ক্রেতা হল সরকার। বাংলাদেশের চটশিল্পের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় চটশিল্পের এই প্রতিযোগিতা বিমুখতার আংশিক কারণ হল সংরক্ষণের নীতি। প্রমাণিত হয় যে, জেপিএম আইনটি ভারতীয় চটশিল্পকে যথোচিত উৎসাহ জুগিয়ে বিস্তৃতিকরণের পথে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। নতুন সামগ্রীর উদ্ভাবন, নতুন বাজার সৃষ্টি এ সবের ক্ষেত্রে অগ্রগতির হার খুবই সামান্য।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের চটশিল্প কিন্তু প্রতিযোগিতার আসরে সার্থক ভূমিকা নিতে পেরেছে। সে দেশের পাটশিল্প কাঁচা পাটের উৎপাদন বা রপ্তানি আয়ের নিরিখে ভারতের চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। সারণি-২-এ ২০০৮-'০৯ সাল থেকে শুরু করে কাঁচা পাটের উৎপাদন এবং পাটজাত সামগ্রীর রপ্তানি বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের তুলনামূলক চিত্রটি পেশ করা হল (হিসাবটি সংশ্লিষ্ট বছরের গড় বিনিময় হারের ভিত্তিতে সমতুল্য ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত)। প্রমাণিত হয় যে, পাটশিল্পে সংরক্ষণের আচ্ছাদন সত্ত্বেও ভারতে কাঁচা পাটের উৎপাদন নিম্নমুখী হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে উৎপাদন। রপ্তানি বাজারেও ধারাবাহিক সাফল্যের পরিচয় রেখে সে দেশে গড় বার্ষিক আয় ভারতীয় টাকায় পৌঁছেছে ৮৮৭৮ কোটি ৭০ লক্ষে, যেখানে ভারতের বার্ষিক আয় ১৭৩০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

রেখাচিত্র-১
পাট সামগ্রীর মোট উৎপাদনে সংরক্ষণের শতাংশ

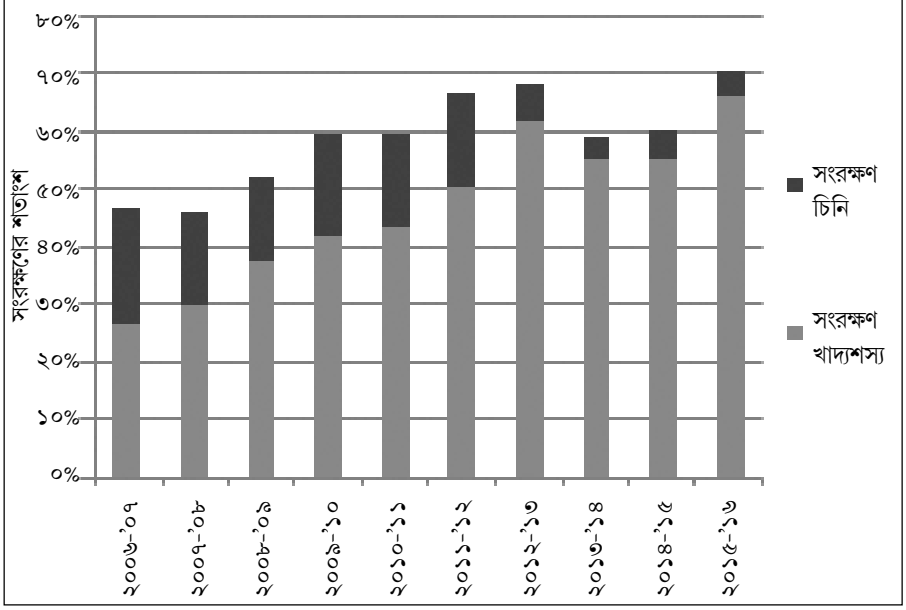

রেখাচিত্র-২
কাঁচা পাট উৎপাদনে সংরক্ষণের শতাংশ

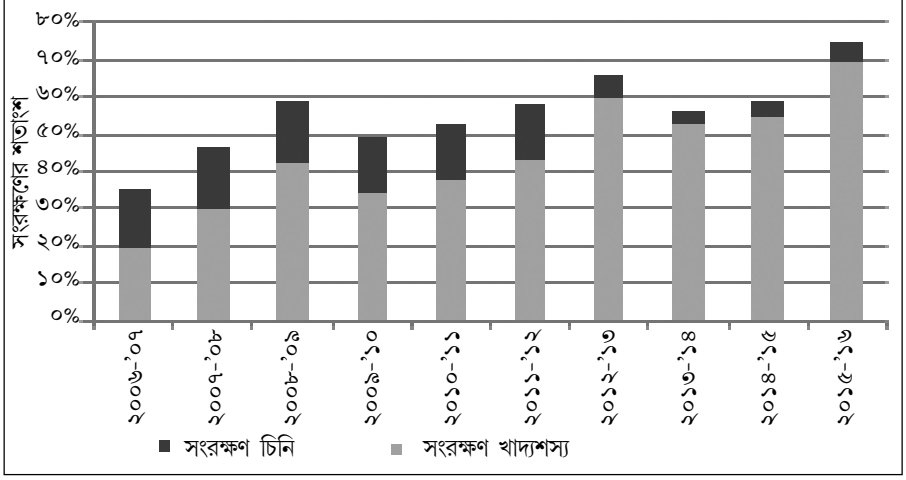

ভারতীয় চটকলগুলি একদিকে বিদেশের বাজারে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে নি, অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা সস্তা সামগ্রীর ধাক্কায় দেশীয় বাজার পিছু হটছে। ভারতীয় পাটশিল্প প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে না পারার কারণগুলি হচ্ছে বাংলাদেশে অনুসৃত বিভিন্ন নীতি, সে দেশের কয়েকটি অন্তর্নিহিত উৎপাদন ব্যয় সংক্রান্ত সুবিধা এবং ভারতীয় উৎপাদকদের তুলনামূলকভাবে শিথিল প্রয়াস। জানা গেছে যে, ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে মজুরির হার অন্তত ৩০ শতাংশ কম হবার দরুন সে দেশের চটকলগুলি উৎপাদন ব্যয়ের ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ সুবিধা পাচ্ছে এবং সে দেশে বিদ্যুতের মাশুলও প্রায় ৩৫ শতাংশ কম। সর্বোপরি পাটজাত সামগ্রীর ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ রপ্তানি ভরতুকি (তন্তুর ক্ষেত্রে ৭.৫ শতাংশ) ধরলে সহজেই বোঝা যায় বিদেশের বাজারে দামের দিক থেকে বাংলাদেশ কেন ভারতকে পিছনে ফেলেছে। অন্যদিকে, আবার বাংলাদেশ থেকে পাটজাত সামগ্রীর শূন্য আমদানি শুল্কের অর্থ হল ওই আমদানির প্রভাবে দেশীয় বাজারে ভারতীয় পাটজাত সামগ্রী ক্রমশ পিছু হটছে। অন্ধ্রপ্রদেশে তো একাধিক দড়ি তৈরির কারখানা, বাংলাদেশের সস্তা আমদানির দরুন বন্ধ হয়েছে।

তন্তু ও কাপড়ের উন্নতিসাধন

ভারতীয় পাটশিল্পের পক্ষ থেকে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, ভারতে প্রস্তুত তন্তু মূলত সাধারণ মানের অথবা নিম্ন মানের (টিডি-৫ থেকে টিডি-৮), যার পরিমাণ মোট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। এই ধরনের তন্তু সাধারণত মোটা সুতোয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা কিনা বি-টুইলের মতো স্থূলতর বস্তার বয়নে কাজে লাগে। যুক্তি দেখান হয়

যে, যেহেতু ভারতে স্থূলতর তন্তু তৈরি হচ্ছে, তাই দেশের চটকলগুলিও বাধ্য হচ্ছে বস্তা তৈরি করতে। যার বিপণনের দায়িত্ব সরকারের। এই যুক্তি পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। যথেষ্ট চাহিদা এবং উচ্চমানের তন্তুর ন্যায়সঙ্গত দরদাম না পেলে কৃষকই বা কেন ওই ধরনের তন্তু উৎপাদনে উৎসাহী হবেন? এখন চাহিদার বেশিরভাগই সাধারণ এবং গড়পড়তার চেয়েও নিম্নমানের তন্তুতে সীমিত, তাই কৃষকরাও বাড়তি যত্ন ও প্রয়াস নিয়ে উচ্চমানের তন্তু উৎপাদনে অনীহা বোধ করে থাকেন।

পাটসামগ্রীর প্রসারে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য চাই পাটতন্তুর প্রক্রিয়াকরণকে উচ্চমূল্য ও উচ্চ গুণমানের লক্ষ্যে চালিত করা। একমাত্র এভাবেই তন্তু ও সুতোর মানোন্নয়ন ঘটিয়ে উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরি করা হলে বাজারে তার কদর ও উচ্চমূল্য পাওয়া যাবে। পাট অর্থনীতিতে এ ধরনের পরিবর্তন আনা হলে মূল্য সংযোজিত 'প্রিমিয়াম' সামগ্রী উৎপাদিত হবে এবং যার ফলে পাটচাষি, শ্রমিক ও কারিগররা আরও বেশি মজুরি/মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

উচ্চমানের তন্তু উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষকদেরও উন্নততর কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে শংসিত বীজ, পংক্তিভিত্তিক রোপণ ও সময় মতো আগাছা নির্মূলের বড়ো ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান চাষের ধরনধারণ চারাগাছের সুষম ও স্বাস্থ্যকরভাবে বেড়ে ওঠার অনুকূল নয়। সর্বোপরি সঠিক সময়ে সার এবং কীটনাশক পৌঁছনোও খুব জরুরি।

তন্তু উৎপাদনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পূর্ণাঙ্গ পাট গাছে জল সেচন করা। গ্রাম এলাকায় সীমিত জলসম্পদের ওপর নিত্যই বাড়তি চাপ আসছে, তাই জলে ভেজানোর ধাপে সঠিক গুণমানের জলের ব্যবহার ক্রমশ কমছে। চালু প্রক্রিয়ায় চাষিরা সাধারণত নিকটবর্তী নয়ানজুলির নোংরা ও কর্দমাক্ত জল দিয়ে দায়সারাভাবে কাজ সারছেন। এটাই হল খুব সাধারণ অথবা নিচু মানের তন্তু ফলনের অন্যতম কারণ।

পাট গাছ

রেটিং বা জলে ভেজানোর কৌশল

এই সব সমস্যার সুরাহার জন্য ২০১৫ সালে শুরু হয় জুট-আইসিএআরই প্রকল্প (জুট : ইমপ্রুভড কালটিভেশন অ্যান্ড অ্যাড-ভান্সাড রেটিং একসারসাইজ)। প্রকল্পটিতে যেসব পদ্ধতি গুরুত্ব পাচ্ছে, তা হল, হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে কৃষকদের প্রত্যয়িত বীজ সরবরাহ করা, পংক্তিভিত্তিক বীজ রোপণের কাজে সহায়তা দেওয়া। কিছু দিন অন্তর নেইল-উইডারের সাহায্যে আগাছা নির্মূল করা এবং সীমিত জলের এলাকায় নতুন প্রযুক্তিতে জল দেবার কাজকে উৎসাহ দেওয়া।

পাট গাছে রেটিং বা জল দেবার তিনটি প্রযুক্তি অবলম্বন করে সাফল্যের আভাস পাওয়া গেছে। একটিতে ফালি সংগ্রহের জন্য পাট গাছে ডিকর্টিকেশন করা হয়। এরপর বিভিন্ন ধরনের উৎসেচক মিশিয়ে কৃত্রিম আধারে জলে ভেজানো পর্ব সম্পন্ন হয়। পাট বিশেষজ্ঞ সংস্থার সঙ্গে পরামর্শক্রমে

বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প উৎসেচক প্রস্তুতকারী সংস্থা নভোজাইম এই প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। খুব সীমিত পরিমাণ জলের সাহায্যে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে জলে ভেজানো পর্ব সম্পূর্ণ হয় (প্রচলিত পদ্ধতিতে লাগে ১৮-২২ দিন)।

অন্য প্রযুক্তিটি জুট আইকেয়ারের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে হাতে নেওয়া হয়েছে। এটিতে ব্যাকটেরিয়া সমষ্টিকে তাদের স্বাভাবিক লালন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যার সাহায্যে জলের প্রচলিত উৎসের ওপর নির্ভর করেই চাষিরা ১০-১২ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পাট গাছ জলে ভেজানোর পর্ব দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে পারবেন। আইজেআইআরএ তৃতীয় যে প্রযুক্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে, তাতেও বিভিন্ন ধরনের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু বা মাইক্রোবের সমষ্টি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই দুই প্রযুক্তি কৃষকরা সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন, কারণ এগুলি তাদের চিরাচরিত রেটিং বা জলে ভেজানোর পদ্ধতির সঙ্গে বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উল্লেখিত প্রযুক্তির সাহায্যে একদিকে জলে ভেজানো পর্ব কম সময়ে সম্পন্ন হবে, অন্যদিকে তন্তুর অন্তত এক থেকে দেড় গ্রেড উন্নতিসাধন সম্ভব হবে।

আসল কথা হল, যদি উন্নত কৃষি পদ্ধতি ও সুপ্রযুক্ত রেটিং বা জলে ভেজানোর কৌশল চালু করা হয়, তাহলে উৎপাদনশীলতাও অন্তত ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সেই সঙ্গে তন্তুর গুণগত মানে উন্নতির ফলে চাষিদের আয়ও অন্তত ২৫ শতাংশ হারে বাড়তে পারে।

পাটতন্তুর উৎপাদন ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার অপরিহার্য। উন্নত মানের যন্ত্রপাতিই সূক্ষ্ম সুতো এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উচ্চমূল্যবিশিষ্ট কাপড়ের উৎপাদন সুনিশ্চিত করতে পারে। এখন কম্পোজিট চটকলগুলিতে যেসব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম রয়েছে, সেগুলি সেই ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসছে। এমনকী যেসব মিলে আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে, তাও কেনা হয়েছিল পাট প্রযুক্তি মিশনের সহায়তায় বিগত শতকের আশির দশকে।

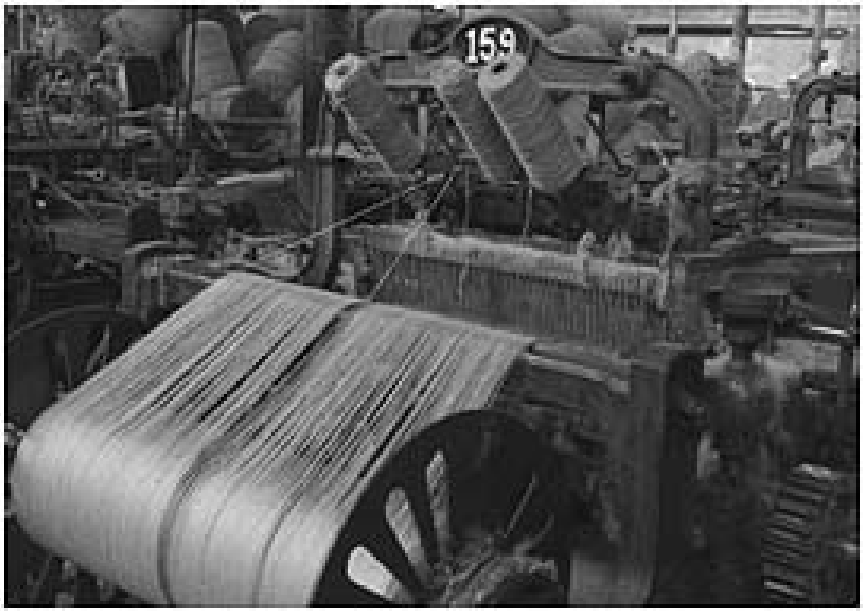

পাট-তন্তু বুনন যন্ত্র

পাট-জাত পণ্য

বস্ত্রশিল্পের সাম্প্রতিকতম রূপান্তরের দরুন ভারতে সুতো ও কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, পাটশিল্প ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেনি। অন্যান্য জাতের তন্তু প্রযুক্তির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সর্বোচ্চ মানের পাট প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্য একাধিক প্রকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। একমাত্র এ পথেই চটকলগুলিকে সূক্ষ্মতর তন্তু ও উচ্চমূল্যবিশিষ্ট সামগ্রী উৎপাদনের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রকৌশল ক্রেতাদের যুগোপযোগী চাহিদা মেটাতে পারবে এবং চটকলগুলিতে উন্নত শ্রম-উৎপাদনশীলতার সুফল আনতে সক্ষম হবে।

অন্তহীন সামগ্রী ও সম্ভাবনা

প্রক্রিয়াজাত পাট তন্তু সুতলি ও ব্লেন্ডেড-সহ বিভিন্ন জাতের কাপড় ব্যবহার করে বিগত বছরগুলিতে অ-চিরাচরিত ও মূল্যযুক্ত

সামগ্রী বাজারে এসেছে। এগুলির মধ্যে নানান নক্‌শার হ্যান্ড ব্যাগ, কেনাকাটার ব্যাগ, সফট লাগেজ, জুতো, পাটজাত গৃহসজ্জাসামগ্রী, যেমন—ফুলের তোড়া, অলঙ্কার, ওয়াল হ্যাঙ্গিং ইত্যাদির কথা উল্লেখ করতে হয়। নক্‌শাখচিত পরদা ও ঢাকনি-সহ গৃহসজ্জার নানান উপকরণ হিসাবে পাটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পাশ্চাত্য ও পশ্চিম এশীয় দেশগুলিতে হাতে বোনা কার্পেট ইত্যাদির জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য ধরনের পাটজাত সামগ্রী, যেমন—পাট বর্জ্য থেকে তৈরি হ্যান্ড ব্যাগ, খাবার টেবিলের টুকিটাকি সরঞ্জাম, শোবার ও বসার ঘরের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, যেমন—কুশন ও টিভি কভার, ম্যাট্রেস ইত্যাদি, অফিসে ব্যবহার্য কলমদানি, কাগজপত্র রাখার ট্রে, ফাইল কভার ও ক্যালেন্ডার—এ সবের চাহিদাও আস্তে আস্তে বাড়ছে। পরিবেশ সচেতন ক্রেতারা একটু বেশি খরচ করতে দ্বিধান্বিত হন না, কারণ তারা সিনথেটিক বা কৃত্রিম জিনিসের বদলে পাটজাত সামগ্রীকেই বেছে নেন। বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করে যারা পাটজাত সামগ্রীর বিস্তৃতিকরণ এনেছেন, তাদের অনেকেই পাটচাষ এলাকার স্বনিযুক্ত মানুষ। ক্ষুদ্রায়তন ক্ষেত্রের এদের মধ্যে যারা মহিলা, তারা যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গেও।

এছাড়া হ্যারডস, স্যালভাটোর ফেরাগামো, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার ও IKEA-র মতো খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলিও পাটজাত জিনিসপত্র ও পাটমিশ্রিত কাপড়ের বিপণনে আগ্রহ দেখাচ্ছে। ওয়ালমার্ট, ক্যারিফোরের মতো সুপরিচিত শপিং চেন ছাড়াও ব্রিটিশ সংস্থা টেসকো, ASDA, ওয়েটরোজ, সেইন্সবেরি প্রভৃতিতে ইতিমধ্যেই পাটের শপিং ব্যাগ বিক্রি করা হচ্ছে।

এখন সবচেয়ে জরুরি হল ক্রেতাদের পরিবর্তনমুখী রুচির সঙ্গে তাল রেখে নতুন নতুন নক্‌শা বোনা এবং পশ্চিমের দেশগুলির বাজারে উচ্চমানের বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনিসপত্র পৌঁছিয়ে দেওয়া। উল্লেখ করতে হয় যে গ্লস্টার লাইফস্টাইল, অ্যাঙ্গেস, ক্লাব, আর্বার, ব্যালিফ্যাবস-এর মতো ভারতীয় ব্র্যান্ডগুলি ইতোমধ্যেই ওই সব বাজারে প্রবেশ করেছে।

বয়নকৃত কাপড় ছাড়াও স্থূলতর জাতের পাট তন্তু দিয়ে নির্মিত আর একটি সামগ্রী গুরুত্ব অর্জন করে কারিগরি বস্ত্রশিল্প বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাড়ির তাপমাত্রা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও গাড়ির অভ্যন্তর অংশে অ-বয়নকৃত পাটজাত কাপড় ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্থূলতর তন্তু এককভাবে অথবা মোটা সুতোয় পাকিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে অ-বয়নকৃত অথবা বয়নকৃত জুট জিও-টেক্সটাইল (জেজিটি)। সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং-এর বিভিন্ন কাজে কৃত্রিম জিও-টেক্সটাইল-এর বদলে উদ্ভাবনমূলক টেকনিকাল বা কারিগরি টেক্সটাইল ব্যবহার করার দিকটি যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। এই বিশেষ ধরনের কাপড়ের উদ্ভাবন ও উৎপাদন শুরু হয়েছে একাধিক ভূমিক্ষয়জনিত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে। রাস্তা নির্মাণ, নদী বাঁধ রক্ষা, ঢালু জমির ব্যবস্থাপনা, এমনকি রেলপথ স্থাপনের কাজেও এগুলির প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়েছে। বিশেষ ধরনের পাটজাত এই কাপড় পরিবেশ-বান্ধব ও জীবাণু বিয়োজ্য, তাই কেন্দ্রীয় বস্ত্রশিল্প মন্ত্রক স্থির করেছে যে সারা দেশে যাবতীয় পূর্ত সংক্রান্ত কাজকর্মে জেজিটি ব্যবহার করা হবে।

জেপিএম আইনের সীমা ছাড়িয়ে

পাটশিল্পের সম্ভাবনা অন্তহীন। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং উৎপাদন সামগ্রী সব কিছুই আছে। অভাবটা হচ্ছে উদ্যোগহীনতার। তেমনভাবে উদ্যোগী হলে উচ্চমূল্য ও মানের জিনিস তৈরি করে আরও আয় সৃষ্টির সুযোগ আসত, শিল্পটিও এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারত। বাংলাদেশের উদাহরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে দেশের পাটশিল্পকে তাদের নিজেদের চেষ্টাতেই ঘুরে দাঁড়াতে হয়েছে। সরকারের তরফে এই 'সরে দাঁড়ানো'-র নীতি অনুসরণ করার ফলে বাংলাদেশে কাঁচা পাট উৎপাদনে উন্নতি এসেছে, বেড়েছে রপ্তানি আয়ও। বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছে বলেই বাংলাদেশের পাটশিল্প আজ প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পেরেছে। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছনোর পরই সে দেশের সরকার পাটশিল্পকে বাধ্যতামূলক প্যাকেজিং-এর সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে, যাতে সেই সহায়তা শিল্পটিকে বাড়তি উৎসাহ জোগায়। তা সত্ত্বেও সেখানকার চটকল-গুলিকে কিন্তু প্রতিযোগিতার অর্থনীতিতে অংশ নিতে হয়।

ভারতে একটি বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। জেপিএম আইন এখানকার পাটশিল্পের সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন, বাকিটা অন্যান্য সামগ্রীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর দরুন ভারতের পাটশিল্পের অস্তিত্ব উত্তরোত্তর ওই আইনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং প্রশাসনিক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা শিল্পটিকে প্রতিযোগিতার বাজার থেকে দূরে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে আর কালবিলম্ব না করে জেপিএম আইনের রক্ষাকবচ নিয়ে গভীরভাবে ভাবা দরকার এবং এটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাতে করে ভারতের পাটশিল্প প্রতিযোগিতামুখী হয়ে বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারে। যদি চটকল কর্মী ও পাটচাষিদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যপূরণ করতে হয় তাহলে পাটসামগ্রীর মূল্য সংযোজন, বিস্তৃতিকরণ, নতুন বাজারে প্রবেশ ও বিপণন কৌশলের কোনও বিকল্প নেই। যতদিন ভারতীয় পাটশিল্প জেপিএম আইনে সীমাবদ্ধ থেকে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে অনীহা দেখাবে, ততদিন তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অধরাই থেকে যাবে। উত্তরণপর্বে পাটশিল্পের স্বার্থ রক্ষার্থে জেপিএম অবশ্যই থাকবে। সম্ভবত আইনটির আওতায় সংরক্ষণের মাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস করার পাশাপাশি আধুনিকীকরণ ও বিস্তৃতিকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে সহায়তা দিতে পারলে এই শিল্পের অবলুপ্তির আশঙ্কা দূর হতে পারে। সুতরাং এখনই বিশ্ব বাজারে পৌঁছনোর জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নিতে হবে। সেই সঙ্গে ভিন্ন ধরনের সাহায্যের মডেলের জন্য সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে, যে মডেলে প্রাধান্য পাবে পাটশিল্পের আধুনিকীকরণ, বিস্তৃতিকরণ এবং বিশ্ব বাজারের উপযুক্ত প্রতিযোগিতামুখী উৎপাদন।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীনস্থ জুট কমিশনার পদে কর্মরত। নিবন্ধটিতে লেখকের ব্যক্তিগত মতামত প্রতিফলিত হয়েছে, ভারত সরকারের নয়। ইমেল : subratagupta65@gmail.com)

খাদি : আমাদের বুনিয়াদি শক্তি

এক আধুনিক জাতি হিসাবে নিজেদের বিশ্বের দরবারে তুলে ধরাটা যে আজকের প্রেক্ষাপটে নিতান্ত জরুরি, সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু তা করতে কোন পথ বেছে নিতে হবে, তা নিয়ে ব্যাপক বিভ্রম রয়েছে। জগৎসভায় ফের শ্রেষ্ঠ আসন পেতে আমরা ভারতীয়রা মূলত পরিকাঠামোগত বিকাশ, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও কারিগরি সামর্থ্য বৃদ্ধি, সামরিক বল আরও বাড়ানো, শৈল্পিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি—এ রকম কয়েকটি বিষয়কেই পাখির চোখ করেছি। কিন্তু সামনে এগোতে হলে যে কোনও জাতির ক্ষেত্রেই নিজেদের মৌলিক বুনিয়াদি সামর্থ্যের জায়গাটা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আমাদের এরকমই একটি বুনিয়াদি শক্তি। ১৯২০ সাল নাগাদ স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে জাতীয়তাবাদের অন্যতম রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গান্ধীজী চালু করেন 'খাদি'। 'স্বাধীনতার উর্দি' তকমা দিয়ে খাদিকে তিনি ভারতের স্বয়ং-সম্পূর্ণতার সনাতন প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেন। আর স্বাধীনতার পর, খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ আয়োগ খাদিকে হাতিয়ার করে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জাতি গঠনে নিয়োজিত হয়। তবে শুধু গ্রামের মানুষের রুটি-রুজির জোগাড় করাই নয়, দেশ-বিদেশের বাজারে ফ্যাশন-তন্ত্র হিসাবেও খাদির অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবেশ-বান্ধব হিসাবেও খাদি টেক্কা দিচ্ছে অন্য যে কোনও ফেব্রিকের সাথে। তাই কেবল গ্রামীণ কর্মসংস্থানের তকমা ছেড়ে আজ আমাদের খাদিকে বিশ্বের দরবারে নতুন করে তুলে ধরাটা নিতান্তই সময়ের দাবি। খুব সম্প্রতি তাই যথার্থ ভাবেই প্রধানমন্ত্রী স্লোগান তুলেছেন, "আজাদি কে পহাল খাদি ফর নেশন, অ্যান্ড আজাদি কে বাদ খাদি ফর ফ্যাশন।" লিখেছেন—**ভি. কে. সাক্সেনা**

এক আধুনিক জাতি হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলাটা নিতান্ত জরুরি। আমাদের কথাবার্তায় ইদানীং বেশি করে উঠে আসছে প্রসঙ্গটি। এ কাজে সফল হতে কোন পথে এগোনো দরকার, তার রূপরেখাও আমরা প্রায় তৈরি করে ফেলেছি। পরিকাঠামো, বৈজ্ঞানিক চেতনা, কারিগরি সামর্থ্য, সামরিক বল, শৈল্পিক উৎকর্ষ—এ রকম হরেক অনুষদ, যা কিছু আধুনিকতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নয়ন বা বিকাশ সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হবে। অথচ, সামনে এগোতে হলে নিজেদের মৌলিক সামর্থ্যের জায়গাটা সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকাটা কিন্তু আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও জাতিকে তার অতীত এবং শিকড়ের কাছে ঋণী থাকা উচিত। একই সাথে, একটা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বেশি বেশি করে নির্ভর করতে হয় সেই সব বুনিয়াদের উপর, দীর্ঘদিন ধরে যা আমাদের পথ চলার সঙ্গী।

দীর্ঘ কয়েক শতক আমরা ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিলাম। অথচ জাতি হিসাবে কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের নিজস্ব স্বতন্ত্র পথ ধরেই এগিয়ে গেছি আমরা। মহাত্মা গান্ধী খুব দ্রুত এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, আমাদের ভবিষ্যৎ নিহিত আছে তৃণমূল স্তরে নিজেদের অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের মধ্যে। এই ভবিষ্যৎকে আমদানি করা মূল্যবোধের বুনিয়াদের উপর গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব

নয়। সেটা ছিল ১৯২০ সাল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্ধেকটা সময় ইতোমধ্যে অতিবাহিত। স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে জাতীয়তাবাদের অন্যতম রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গান্ধীজী চালু করলেন 'খাদি'। 'স্বাধীনতার উর্দি' (The Livery of Freedom) হিসাবে তকমা দিয়ে খাদিকে তিনি ভারতের স্বয়ং-সম্পূর্ণতার সনাতন প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে, একদিকে ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দেন যে ভারত তার নিজস্ব সহায়সম্পদের মাধ্যমেই বেঁচেবর্তে থাকতে সক্ষম। অন্যদিকে, একই সাথে, ভারতীয়দের সামনেও গর্ববোধ করার মতো একটা সুযোগ তৈরি করে দেন। দৈনন্দিন ব্যবহারের কাপড়চোপড় নিজে হাতে বোনার মাধ্যমে নিজের জীবনে সমৃদ্ধি বয়ন করার এক অনন্য পথ দেখান তাদের।

খাদি এবং গ্রামাঞ্চলের উৎপাদনশীলতা জাতীয়তাবাদের এক মহৎ সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় সমাজ যে গ্রামাঞ্চলের আমজনতার উদ্যোগ এবং অবদানের উপর ভর করে অনুপমেয় ভাবে গড়ে উঠেছে—সেই বিষয়টা গোটা বিশ্বের সামনে এর ফলে প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয় দেশের পক্ষে। এভাবেই, খাদির পরিচয় শুধুমাত্র এক খণ্ড কাপড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। খাদি হয়ে ওঠে শান্তির বার্তাবাহী দূত; আমাদের স্বাধীনতা এবং জাতীয় অস্তিত্বের বিমূর্ত প্রতীক বিশেষ।

স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত সরকার একটি বিধিবদ্ধ পর্ষদ হিসাবে খাদি এবং গ্রামোদ্যোগ আয়োগ (Khadi and Village Industries Commission—KVIC) গঠন করে KVIC আইন ১৯৫৬-র অধীনে।

স্বয়ং-সম্পূর্ণতার যে শক্তি একটি জাতিকে গড়ে তুলেছিল এ ছিল তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। বিপুল পরিমাণ মানব সম্পদ আছে, কাজ করার তীব্র ইচ্ছাও আছে, অথচ অর্থনৈতিক সম্পদের অভাব বড়ো বেশি— এমন একটি জাতির সামনে করণীয় কী? অবশ্যই তাদের সম্মিলিত মানব শক্তি এবং প্রতিভা/দক্ষতাকে কাজে লাগে এমন জাতীয় পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করা। এভাবেই স্বচ্ছল জীবনযাপনের জন্য অর্থ উপার্জনে ব্যক্তি বিশেষকে সহায়তাও করা হয়। খাদি এবং গ্রামোদ্যোগকে ঘিরে এই যে মাতামাতি, ভারত আর কখনও এত বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং উপযুক্ত বিষয়ে এমন সঠিক পদক্ষেপ নেয়নি।

রাজস্থানের দৌসায় খাদির এক মহিলা কারিগর

খাদির উৎপাদন পরিমাণগত দিক থেকে গোটা বিশ্বের মধ্যে বৃহৎতম গ্রামীণ উৎপাদনশীল কর্মসূচি। এর মাধ্যমে হাজার হাজার পরিবার সরাসরি তাদের উৎপাদন গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়; কোনও রকম দালাল/ফড়ে বা জটিল বিপণন ব্যবস্থাপত্রের সাহায্য না নিয়েই। ফলত, একদিকে যেমন গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের কাজের ন্যায্য মূল্য হাতে পায়; অন্যদিকে, গ্রাহকরাও তাদের ব্যয়িত অর্থের পুরো সুফল পান। জাতির জন্য খাদি হল নিঃসন্দেহে এক অমূল্য ঐতিহ্যবাহী সম্পদ।

৫০০০-এরও বেশি প্রতিষ্ঠান এবং ৩.২০ লক্ষেরও বেশি অতিক্ষুদ্র (micro) শিল্পোদ্যোগী এক বিশাল নেটওয়ার্ক মেশিনারি গড়ে তুলেছে; যার মাধ্যমে ভারতে KVIC-র লক্ষ্য এবং কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। এক কোটিরও বেশি মানুষ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন উৎপাদন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। খাদির কাজ-কারবার মূলত মহিলা-কেন্দ্রিক। খাদির ৪০ শতাংশেরও বেশি কারিগর মহিলা। গ্রামোদ্যোগ কর্মসূচিতে মহিলাদের অংশভাগ ৩০ শতাংশ। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের ক্ষেত্রে বার্ষিক মোট ব্যবসা মূল্য (Turnover) ৪০ হাজার কোটি টাকা। এর পুরোটাই আসে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের পণ্য থেকে। এই অর্থের ৪০ শতাংশ ব্যয় করা হয় গ্রামাঞ্চলের জনগোষ্ঠীগুলিকে জীবিকা সহায়তা দেওয়ার জন্য খাদি কর্মকাণ্ড চালাতে।

শ্রীনগরের পামপোরের কাছে নতুন চরখা ও তাঁত মিল

আজকের দিনে, গোটা বিশ্ব যখন জলবায়ু পরিবর্তন এবং শিল্পায়নের ক্রমপ্রসারিত কার্বন ফুট প্রিন্ট-এর প্রতিকূল/ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনায় ব্যস্ত; সে সময় ভারতের উচিত বিশ্বের দরবারে খাদি শিল্পের শূন্য কার্বন ফুটপ্রিন্ট-এর বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরা। বিশেষত যখন, সিন্থেটিক বা কৃত্রিম বস্ত্র শিল্প যেভাবে ক্ষতি করে চলেছে পরিবেশের, তার সমস্তটা এখনও আমরা জেনে বুঝে উঠতে পারিনি। বিশ্বজুড়ে বার্ষিক যে পরিমাণে বস্ত্র (Textile) উৎপাদন হয়, হিসাব করে দেখা গেছে সেই কাপড়ের পরিমাণ ৬০ বিলিয়ন কিলোগ্রামেরও বেশি। এই পরিমাণ কাপড় উৎপাদন করতে ব্যাপক পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি এবং জল প্রয়োজন হয়। হিসাব করে দেখা গেছে ১,০৭৪ বিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ (বা ১৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা) এবং ৬ থেকে ৯ ট্রিলিয়ন লিটার জল ব্যবহার হচ্ছে এ কাজে। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণকারী শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল সিন্থেটিক বস্ত্র

শিল্পক্ষেত্র। সর্বমোট কার্বন উৎপাদনের ১/২০ অংশই এই শিল্পের অবদান।

এদিকে, খাদির ক্ষেত্রে সুতো কাটা এবং বয়ন, সব কিছুই হয় হাতে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনও ধাপেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয় না। পুরো ব্যাপারটাই হাতে চালানো যন্ত্রের মাধ্যমে হয়, কার্বন নিঃসরণের কোনও সুযোগই নেই। এ রকমই অনেক কারণে আগামী দিনের তন্তু হিসাবে ফেব্রিক শিল্পে এক ইর্ষণীয় জায়গা দখল করবে খাদি। এই মৌলিক দিকটিকে মূলধন করেই বিশ্বের দরবারে খাদিকে আমাদের পৌঁছে দিতে হবে; এর আধুনিক প্রাসঙ্গিকতাকে ব্যাখ্যা করে, পরিচ্ছন্নতর এবং সুস্থায়ী বিশ্বের জন্য খাদি ভবিষ্যতে কী ভূমিকা নিতে পারে, তা তুলে ধরতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে সঠিক অর্থেই বলেছেন, "আমরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চাই ভারতের গ্রামে গ্রামে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে খাদির।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে খাদিকে এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেন, তার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ হল খাদির সঙ্গে যুক্ত কারিগরেরা। জাতি গঠনে এই সব অন্তরালবর্তী মানুষ যে ভূমিকা নিতে সক্ষম, তা প্রকাশ্যে আনেন তিনি। খুব সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী একটি স্লোগান দেন, "আজাদি কে পহলে খাদি ফর নেশন অ্যান্ড আজাদি কে বাদ খাদি ফর ফ্যাশন", অর্থাৎ, স্বাধীনতার আগে জাতির জন্য এবং স্বাধীনতার পর ফ্যাশনের জন্য খাদি। তিনি আরও বলেন, "খাদির ব্যবহারকে আমাদের আরও বেশি করে উৎসাহিত করা উচিত। অন্তত একটি খাদি পণ্য কিনুন। খাদি সামগ্রী কিনলে আপনি একজন দরিদ্র মানুষের ঘরে সৌভাগ্য দীপ জ্বালাবেন।" এই আবেদনের পর, গত বছরে খাদি কাপড় এবং বস্ত্রের বিক্রিবাটা ২৯ শতাংশ বেড়ে যায়। সেই ধারা এখনও বজায় আছে। আধুনিক সমাজের ক্রমাগত বদলে যেতে থাকা চাহিদাকে ফেব্রিক হিসাবে খাদি সার্থকভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে। আজকের দিনে হাজার হাজার উৎপাদন কেন্দ্র ফিউশন ফেব্রিক পণ্যসম্ভার তৈরি করছে। যারা ব্যবহার করবেন, তাদের মর্জিমাফিক বিভিন্ন অনুপাতে সূতি,

আইএফআর, বিশাখাপত্তনম-এ খাদি ইন্ডিয়ার স্টলে প্রধানমন্ত্রী

পলিয়েস্টার, রেশম এবং অন্যান্য কাঁচামাল মিলিয়ে মিশিয়ে এসব পণ্যসম্ভার তৈরি হচ্ছে।

আজকের নতুন ট্যাগ লাইন হল "এক তন্তু, এক জাতি" (One yarn, One Nation)। 'খাদি'র বদলে 'খাদি ইন্ডিয়া' নামে নতুন ব্র্যান্ডিং হয়েছে। "এক তন্তু, এক জাতি" ট্যাগ লাইনের অধীনে KVIC এক মাস ধরে (৫ মে থেকে ৪ জুন, ২০১৬) শ্রীনগরে জাতীয় খাদি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। জঙ্গি নাশকতা বিধ্বস্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ ধরনের প্রদর্শনী এই প্রথম। প্রদর্শনীতে সারা দেশ থেকে ১৯৮-টি খাদি প্রতিষ্ঠানের তৈরি পণ্যসম্ভার তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে ৫৬-টি প্রতিষ্ঠান ছিল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের। এক লক্ষের বেশি ক্রেতা সমাগম এবং ২ কোটির বেশি অর্থমূল্যের বিক্রিবাট্টার মধ্যে দিয়েই প্রদর্শনী কতটা সফল সেই ছবিটা স্পষ্টতর হয়। মে, ২০১৬-এ KVIC কাশ্মীরের পামপোর-এর কাছে ২৫-টি চরখা এবং ৫-টি তাঁতযন্ত্র-সহ একটি ইউনিট চালু করে। জঙ্গি নাশকতা বিধ্বস্ত পরিবারগুলির জন্য জম্মুর নাগ্রোটা গ্রামে ন্যাপকিন সেলাইয়ের একটি প্রকল্পও চালু করেছে; যেখানে ২৯৬ জন মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে।

বিশ্বের ফ্যাশন মানচিত্রে এক ধামাকাদার আত্মপ্রকাশের জন্য KVIC আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ডিজাইনার শ্রীমতী ঋতু বেরিকে কমিশনের পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োগ করে। মূলত কীভাবে রেডিমেড খাদি বস্ত্র সম্ভারে স্টাইল এবং 'স্টেট অফ দ্য আর্ট মাল্টি-ফ্যাশন ডিজাইন' যুক্ত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্যই এই নিয়োগ। সাথে সাথে দেশের এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদিকে কীভাবে প্রমোট করা যায় সে বিষয়ও পরামর্শ দেবেন ঋতু বেরি।

এই হল সংক্ষেপে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের (KVIC) ইতিহাস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দরিদ্রতম শ্রেণি তথা গ্রামীণ আমজনতাকে উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত করে তাদের রুটি-রুজির বন্দোবস্ত করার দূরুহ দায়িত্ব শুরু থেকেই কাঁধে তুলে নিয়েছে KVIC। এভাবেই এই প্রতিষ্ঠান ভারতে গ্রামাঞ্চলের বিকাশের জন্য অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে জাতির সেবায় নিয়োজিত। হরেক রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রামোদ্যোগের সৃষ্টি,

পৃষ্ঠপোষকতা, সহায়তা প্রদান এবং সেগুলিকে সুস্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখা—এরকম বিবিধ উপায়ে গ্রামীণ বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে KVIC। এই প্রতিষ্ঠানের গ্রামোদ্যোগের মাধ্যমে তৈরি একেবারে সামনের সারির পণ্য হল খাদি।

আমাদের অনামা শহীদ সেনানীদের স্মারক হল চক্র। সেরকমই আমার চিরদিনের বিশ্বাসকে, চরখা হল নামগোত্রহীন সেই গ্রামীণ আপামর জনতার প্রতিভূ, যারা জাতির জনকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, তাঁর দেখানো পথের অনুসরণে আত্মনির্ভরশীলতা এবং শ্রমের মর্যাদাকে বেছে নেন। শুধুমাত্র একটি তন্তু বয়ন করে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনে পদাতিক সৈনিক হিসাবে শরিক হওয়া অগণিত সেইসব মানুষের পরিচয় আমরা হয়তো পুরোপুরি জানি না, বা মনেও করতে পারি না; কিন্তু যখন আমরা চরখার গুণকীর্তন করি, তার মধ্যে দিয়েই প্রতীকীভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় সেইসব অজানা মানুষদের উদ্দেশ্যে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার বিশ্বাস, স্বরাজের প্রতীক এই চরখার প্রতিকৃতি দেশের রাজধানীর কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থাপন করা উচিত। আমাদের যা কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, সে ব্যাপারে ক্রমাগত মনোযোগ আকর্ষণ করতেই একই উদ্যোগ নিতান্ত জরুরি।

চরখার গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে, নয়া দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তিন নম্বর টার্মিনালে KVIC বার্মা টিকের তৈরি বিশ্বের বৃহত্তম চরখার প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছে। সুবিশাল এই চরখার উচ্চতা ১৭ ফুট, লম্বায় তা ৩০ ফুট এবং চওড়ায় ৯ ফুট; আর এর ওজন হল ৪ টন। এখানে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ যাত্রা বিরতির মাঝে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ভারতের এই ঐতিহাসিক প্রতীক চিহ্নকে তারিফ করার সুযোগ পায়। এছাড়াও, নয়াদিল্লির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আমাদের জাতীয় বায়ুসীমার প্রবেশপথ (Gateway)। আকাশের এই প্রবেশ দ্বারে চরখার উপস্থিতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, স্বরাজের জন্য ১৯২৪-এ মহাত্মা

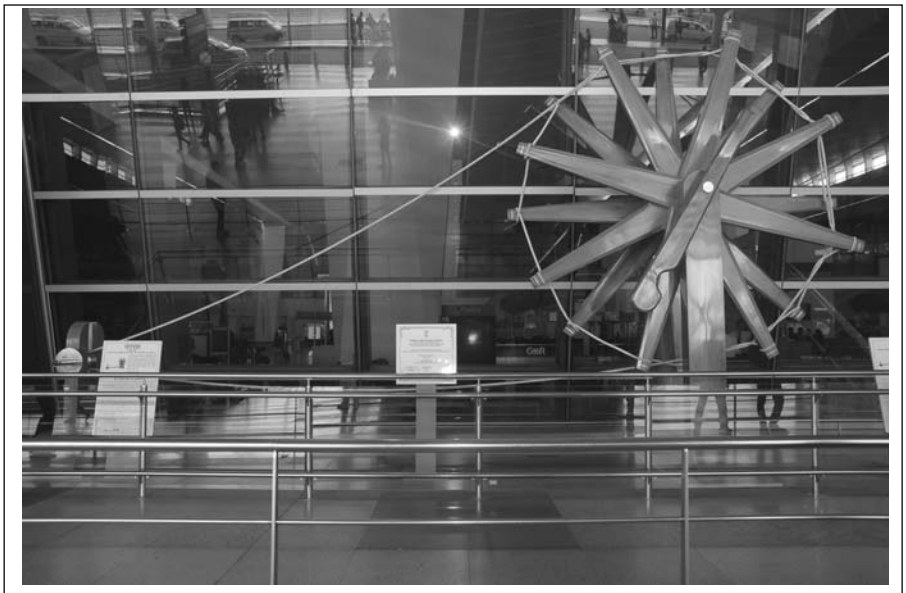

নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিশ্বের বৃহত্তম কাষ্ঠনির্মিত চরখার প্রতিরূপ

গান্ধীর সেই তূরী নিনাদের মতো উদাত্ত আহ্বান, যা আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে ডানা মেলতে সাহায্য করেছিল।

KVIC-র অন্যতম প্রধান মিশন হল গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি। প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি (Prime Minister's Employment Generation Programme—PMEGP) যবে থেকে চালু হয়েছে, এর আওতায় প্রায় ২০ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা গেছে। KVIC-এর কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলির অন্যতম প্রধান অবদান হল তা গ্রামের সাধারণ মানুষের কাজের খোঁজে শহরে পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা অনেকটা ঠেকাতে পেরেছে। ফলত, গ্রামাঞ্চলে সমৃদ্ধি ঘটাতে দেশীয় প্রতিভাকে কাজে লাগানোর বাতাবরণ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে KVIC-র তরফে বিবিধ কর্মসূচি ও উদ্যোগ চালানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি পর্ষদের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসাবে আমার কিছু স্বপ্ন, কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে। রুগ্ন গ্রামোদ্যোগগুলিকে টিকে থাকার জন্য পুনরুজ্জীবিত করা, বিক্রিবাট্টার পরিমাণ বর্তমানের থেকে বাড়িয়ে অন্তত দ্বিগুণ করা তথা কারিগরেরা যাতে উচ্চহারে তাদের কাজের পারিশ্রমিক পান তার বন্দোবস্ত করার জন্য এক ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলা। KVIC-তে আমাদের আরও একটা ইচ্ছা পরিকল্পনা স্তরে রয়েছে। এটি হল কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরতা কমাতে সৌরশক্তি চালিত বয়ন ইউনিট চালু করা। এছাড়াও কারিগরদের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও তাদর জন্য কিছু কল্যাণ কর্মসূচি চালু করার লক্ষ্যে KVIC বর্তমানে উঠে পড়ে লেগেছে। যেমন—তন্তুবায়দের বিমার আওতায় আনা, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্কের আওতায় তাদের নিয়ে আসা, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মানোন্নয়ন; সর্বোপরি এই সব কারিগর ও তাদের কর্মোদ্যোগকে সারা বিশ্বের জীবনযাত্রার মূলস্রোতের কাছে তুলে ধরে প্রাপ্য স্বীকৃতি আদায় করে দেওয়া।

সংক্ষেপে বলা যায়, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমকালীন আধুনিক ভারতে তথা গোটা বিশ্বেই উত্তরোত্তর আরও বেশি বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। মানব ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক বিকাশের যেসব মডেল এযাবৎকালীন তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান সুস্থায়ী মডেল হিসাবেই খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আজ এই প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক 'খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগের বর্তমান চেয়ারম্যান। ইমেল : chairmankvic2015@gmail.com)

ভারতে কারিগরি কাপড় শিল্প : উদীয়মান ক্ষেত্র

আয় বাড়ছে বলে খদ্দেরদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নত জীবনচর্চা, বিলাস, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বাবদ মানুষ বেশি খরচ করছেন। স্যানিটারি ন্যাপকিন, বেবি ডায়াপারের চল বেড়েছে। বছর কয়েক আগেও এসবের বিক্রিবাটা ছিল নেহাত নগন্য। এ ধরনের পণ্য হচ্ছে কারিগরি কাপড়জাত। ইনটারনেট, টিভি ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ায় এই সব পণ্য বিষয়ে গ্রাহক আজকাল ঢের বেশি ওয়াকিবহাল। ভারতে কারিগরি কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধির কারণ, তার সামনে উপস্থিত চ্যালেঞ্জ এবং কারিগরি কাপড় শিল্পের প্রসারে সরকারের উদ্যোগ নিয়ে কলম ধরেছেন—**ড. প্রকাশ বাসুদেবন**

কাপড় মানুষের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র পোশাক পরিচ্ছদে কাপড়ের ব্যবহার সীমিত নয়। তা কাজে লাগে দোলনা, অর্থাৎ মানুষের শৈশব থেকে শবাধার বা মৃত্যু ইস্তক। অন্য কোনও পণ্যে ব্যবহার করার জন্য তৈরি কাপড়কে বলা হয় কারিগরি কাপড় (টেকনিক্যাল টেকসটাইল)। নান্দনিক বা আলংকারিক গুণের বদলে কারিগরি কাপড় উৎপাদিত হয় তার কারিগরি এবং কার্য ক্ষমতার জন্য।

বিভিন্ন ধরনের কারিগরি কাপড় তৈরির জন্য কাপড়ের কাঁচামাল, বুনট, ফিনিশিং ট্রিটমেন্ট এবং গারমেন্টিং বা কনভারসান কলাকৌশল কাজে লাগানো যেতে পারে। এই কারিগরি কাপড়ের মধ্যে পড়ে ওয়াইপের মতো মামুলি পণ্য থেকে টিস্যু এনজিনিয়ার্ড ইমপ্লান্টের মতো জটিল সামগ্রী। কারিগরি উদ্দেশ্যের জন্য কাপড়ের ব্যবহার মানব-সমাজের কাছে আনকোরা নয়। ইদানীংকার কারিগরি কাপড়ের তুলনায় আগে এ ধরনের কাপড়ের বুনট ছিল সহজ সরল। নতুন নতুন কাঁচামাল, নক্‌শা, রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের দরুন আজকের দিনে কারিগরি কাপড় ঢের উন্নতমানের।

প্লাস্টিক, ধাতু, কাগজ ও ফিল্মের জন্য কারিগরি কাপড় পছন্দ করা হয়। কারণ এই কাপড়ের হাল্কা ওজন, রন্ধ্রময় গঠন, সাজানো ও মুড়ে দেওয়ার সুবিধা এবং আরও অনেক গুণ। আধুনিক কারিগরি কাপড় অনেক ক্ষমতা ধরে, অর্থাৎ বেশি কাজে ব্যবহার উপযোগী। এর গঠন অবশ্য বেশ জটিল।

বহু কারিগরি কাপড়জাত পণ্য উৎপাদিত হয় তন্তুময় বুনট হিসেবে। যেমন, কটন উল রোল, কটন বাড, হিমোস্ট্যাটিক প্যাড এর মতো সার্জিকাল সরঞ্জাম, ফাইবার ফিলস শব্দরোধক, তাপ প্রতিরোধী, হোসপাইপ, ফিল্টার ইত্যাদি। শল্য চিকিৎসায় সেলাই করার সুতো, দড়িদড়া ইত্যাদি জিনিস তৈরি হয় তন্তু ফিলামেন্ট থেকে। আরও সব কারিগরি পণ্যের মধ্যে আছে বিছানার চাদর, সার্জিকাল গাউন, গালিচা, গাড়ির আসনমোড়া, ব্যান্ডেজ, হার্নিয়া মেশ, স্পোর্টসউইয়ার, কম্প্রেসান গার্মেন্ট স্পেসার ফেব্রিক, ভ্যাসকিউলার গ্রাফ্‌ট, টিউবুলার ব্যান্ডেজ, মাছ ধরার জাল, স্যাটেলাইট অ্যানটেনা, ফিল্টার মেমব্রেন, ওয়াইপ, শস্য আচ্ছাদনী, আগাছা নিয়ন্ত্রক ফেব্রিক, ইনসুলেশন টেপ, স্টেন্ট, লিগামেন্ট, টেন্ডন, রোটেটর কাফ, এমব্রয়ডারড সার্কিট, ডায়াপার, স্যানিটারি ন্যাপকিন ইত্যাদি।

অনেক কারিগরি কাপড় তৈরি হয় বিশেষ ফিনিশ, কোটিং ও ল্যামিনেশন দিয়ে। যেমন, অগ্নি নির্বাপক, অ্যান্টিমাইক্রোবাইয়াল ইত্যাদি।

ভারতে কারিগরি কাপড় শিল্পের সম্ভাবনা

● আয় বাড়ছে বলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছে। আরও স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নত জীবনচর্চা, বিলাস, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, সুরক্ষা ইত্যাদিতে গ্রাহক বেশি খরচ করছে। ওয়াইপ, স্যানিটারি ন্যাপকিন, বেবি ডায়াপারের চল বেড়েছে। কয়েক বছর আগে এসবের বিক্রিবাটা ছিল নেহাত নগণ্য।

● কারিগরি কাপড়ের চাহিদা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বিকাশের উপর নির্ভরশীল। যেমন, গাড়ি শিল্পে দ্রুত বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে অটোমোবিল কাপড়ের চাহিদা। শহরে নিত্যনতুন আধুনিক হাসপাতাল গজিয়ে ওঠায় মেডিক্যাল কাপড়ের বাজার বাড়ছে।

● ইন্টারনেট, টিভি ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ায় কারিগরি কাপড় ব্যবহারের উপকারিতা ও সে বাবদ খরচের সার্থকতার বিষয়ে অধিকাংশ গ্রাহক আজকাল ঢের বেশি ওয়াকিবহাল। নজির হিসেবে কৃষি-কাপড় পণ্যগুলির কথা তুলে ধরা যায়। এসবের উপযোগিতা বুঝে অনেক চাষি ইতোমধ্যে কৃষি-কাপড় ব্যবহারে রপ্ত হতে শুরু করেছে।

● কারিগরি কাপড় হচ্ছে উচ্চ-প্রযুক্তি নির্ভর এবং ভারতে কাপড় শিল্পে অপেক্ষাকৃত নতুন; শিল্পোদ্যোগীকে তাই দিশি সংস্থার কাছ থেকে তেমন একটা প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয় না।

● জনসংখ্যা ও মানুষের আয়ু বৃদ্ধি ঘটেছে। জনসংখ্যায় ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। সৌজন্যে উচ্চ জন্ম হার ও পরমায়ু বৃদ্ধি, এর ফলে কারগরি কাপড়ের চাহিদা তৈরি হবে ও তা বজায় থাকবে।

● সংগঠিত খুচরো ও অনলাইন ব্যবসা বাড়ায় গ্রাহকের কাছে সহজে পৌঁছে যাওয়া; কারিগরি কাপড়ের ব্যবসা বাড়াতে সাহায্য করবে।

● গতানুগতিক কাপড়ের তুলনায় বেশি লাভ উদ্যোগীদের আকৃষ্ট করে।

● কারিগরি কাপড়ের খুব কম ব্যবহার : ভারতে এর ভোগ বিশ্ব গড়ের ঢের নিচে। তাই বিকাশের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

● কিছু কারিগরি কাপড়ের জন্য শিল্পের চাহিদা বেড়ে চলা।

● কাপড় শিল্পে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম। তাই এদেশে আছে এক মজবুত জোগান ব্যবস্থা, আমদানি-রপ্তানির সুবন্দোবস্ত, পরিকাঠামো। এতো সুবিধা হবে কারিগরি কাপড় শিল্পের।

● আন্তর্জাতিক বাজার বেড়ে চলেছে, হচ্ছে তার বিশ্বায়ন।

● প্রচলিত কাপড় শিল্পের কৃৎকৌশলে সড়গড় কম মজুরির শ্রমিক কারিগরি কাপড় অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

কারিগরি কাপড়ের চাহিদা

পরিমাণে ভারতের কারিগরি কাপড়ের বাজার বেড়ে ২০২০-তে দাঁড়াবে ৪ কোটি ২২ লক্ষ টন। অর্থাৎ, ২০১৫ থেকে ২০২০-তে চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক বিকাশ হার ৪.৬৮ শতাংশ। আর এক হিসেবে অনুমান, ২০১৪-২০১৯ এই হার হবে ৩.৭১ শতাংশ। দামের দিক থেকে অবশ্য ভারতে কারিগরি কাপড়ের বিভিন্ন অংশ বাড়ছে ৮ থেকে ১৯ শতাংশের মধ্যে। এই শিল্পের সার্বিক চক্রবৃদ্ধি হারে বার্ষিক বিকাশ হার হবে ১১ শতাংশ। ভারতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ০.৭৫ শতাংশ আসে কারিগরি কাপড় থেকে। এখন ভারতে কাপড় উৎপাদন শিল্পে কারিগরি কাপড়ের ভাগ ১২ শতাংশ। চিনে তা ২০ শতাংশ। ২০১৭-১৮-য় ভারতে কারিগরি কাপড়ের উৎপাদন বেড়ে হবে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২১৭ কোটি টাকা। বিশ্বে কারিগরি কাপড় উৎপাদনে ভারতের অংশ মাত্র ৩ শতাংশ। ৭৫ শতাংশ উৎপাদন চিন ও ইউরোপে। কারিগরি কাপড়ের ১৯টি শ্রেণি হল :

➔ অ্যাপ্রোটেক (কৃষি, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি)
➔ বিল্ডটেক (ভবন ও নির্মাণ)
➔ ক্লথটেক (জুতো ও পোশাকের কারিগরি অংশ)
➔ জিওটেক (জিওটেস্কটাইল, সিভিল ইনজিনিয়ারিং)
➔ হোমটেক (আসবাবপত্র, ঘরের কাপড় ও মেঝে-আচ্ছাদন)
➔ ইনডাটেক (শোধন, সাফসাফাই ও শিল্পে অন্যান্য ব্যবহার)
➔ মেডিটেক (হাইজিন ও মেডিক্যাল)
➔ মোবিলটেক (গাড়ি, জাহাজ, রেল, বিমান)
➔ ওইকোটেক (পরিবেশ সুরক্ষা)
➔ প্যাকটেক (মোড়ক)
➔ প্রোটেক (ব্যক্তিগত ও সম্পদ সুরক্ষা)
➔ স্পোর্টেক (খেলা ও অবসর)

চ্যালেঞ্জ

● **বিশেষ গুণসম্পন্ন কাঁচামালের অভাব :** প্রচলিত কাপড়ের জন্য কাঁচামাল ভারতে ঢের মেলে। কিন্তু, কারিগরি কাপড়ের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। বিশেষ গুণসম্পন্ন কাঁচামালের ঘাটতি আছে। এসব জিনিস অধিকাংশ আনতে হয় বাইরের থেকে। এতে সময় লাগে, বাড়ে খরচও। ফলে প্রতিযোগিতায় সমস্যার মুখে পড়তে হয়।

● **প্রযুক্তির অভাব :** চিরাচরিত কাপড় উৎপাদনের প্রযুক্তিতে ভারত বেশ নিপুণ। কিন্তু অত্যাধুনিক কারিগরি কাপড় তৈরির প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তার করায়ত্ত নয়। আমরা এক্ষেত্রে কাঁচামালের মতো, অধিকাংশ কারিগরি কাপড় বানানোর যন্ত্রপাতি আমদানির মুখাপেক্ষী এখনও। এর ফলে প্রকল্পের খরচ যায় বেড়ে।

● **নতুন পণ্য তৈরির চ্যালেঞ্জ :** কারিগরি কাপড় শিল্পে নতুন পণ্য তৈরি করতে দরকার এক বহু-বিষয়মুখী কর্মপ্রণালী। একটা পণ্য তৈরি করার পর দেখতে হবে কী পরিমাণ উৎপাদন করলে তা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবে। তারপর সেই পণ্য বিপণনও এক চ্যালেঞ্জ।

● **দক্ষ কর্মীর ঘাটতি :** কারিগরি কাপড় উৎপাদন এক বেশ জটিল প্রক্রিয়া। এজন্য দরকার বহু বিষয়ে উঁচুমানের জ্ঞান। ম্যানেজার থেকে শ্রমিক, সব স্তরে চাই সুদক্ষ লোকজন। উদাহরণ হিসেবে, মেডিক্যাল টেক্সটাইল-এর উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কুশলতা জরুরি। জিও-টেক্সটাইলের জন্য প্রয়োজন সিভিল ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নৈপুণ্য।

● **নির্দিষ্ট মান/স্ট্যান্ডার্ড-এর অভাব :** কারিগরি কাপড় শিল্প এদেশে এখনও হাঁটি হাঁটি পা পা বা শৈশবাবস্থায়। তাই এই শিল্পের পণ্যগুলির নির্দিষ্ট মান/স্ট্যান্ডার্ড-এর অভাব আছে। আর কিছু ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড থাকলেও তা এখন অচল। নতুন মান/স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা একান্ত জরুরি। গ্রাহকদের জন্য উপযুক্ত পণ্য বানাতে তা শিল্পকে সাহায্য করবে।

● **জানাশুনা না থাকা :** শহরায়ন ও শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও, ভারতে মানুষের এক বড়ো অংশের বাস গ্রামাঞ্চলে। তাদের অনেকের দিন চলে কায়ক্লেশে। এদের অধিকাংশের কারিগরি কাপড় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা নেই। কারও বা তা কেনাকাটা করার সঙ্গতির অভাব।

● **বিশ্বমানের :** উৎপাদনমুখী গবেষণা ও বিকাশের দিকে নজর দিয়ে বিশ্বমানের গবেষণা-বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং গবেষণা ও বিকাশ কেন্দ্রগুলিকে আরও লগ্নি করতে হবে।

● **ইউনিফর্ম কোডিং সিস্টেমের অভাব :** রপ্তানির জন্য কারিগরি-কাপড় চিহ্নিত করতে, এই পণ্যের এক ইউনিফর্ম কোডিং সিস্টেম—হারমনাইজড সিস্টেম অব নমেনক্লেচার দরকার।

● **কারিগরি কাপড় ক্ষেত্র সুসংগঠিত নয় :** ভারতে কারিগরি কাপড় কারখানা মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি। প্রচলিত কাপড় শিল্পের তুলনায় কারিগরি কাপড় কারখানার বেশির ভাগ আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

● **উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকা :** কারিগরি কাপড় শিল্প প্রসারের জন্য জল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ল্যাবরেটরি, দূরসঞ্চার, হাইস্পিড ইন্টারনেট এর মতো পরিকাঠামো জোরদার করা জরুরি।

● **চিনের মতো দেশ থেকে কড়া প্রতিযোগিতার মুখে পড়া :**

● **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও বিধিনিয়মের অভাব :** কিছু কারিগরি কাপড় পণ্যের জন্য উপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা খুব জরুরি। বিশেষ করে, বিপুল পরিমাণ স্যানিটারি ন্যাপকিন, বেবি ডায়ানার, হাসপাতালের দূষিত বর্জ্য ইত্যাদি। পরিবেশের ক্ষতি না হয় এমনভাবে এসব বর্জ্য অপসারণ করতে হবে।

কারিগরি কাপড় শিল্প প্রসারে সরকারের উদ্যোগ

কারিগরি কাপড় ক্ষেত্রকে মদত জোগাতে সরকারের নেওয়া কিছু প্রকল্প :

● কারিগরি কাপড়ের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের লক্ষ্য উৎকর্ষ কেন্দ্রের বিকাশ, কারিগরি কাপড়ের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, কারিগরি কাপড় সংক্রান্ত সঠিক তথ্য জোগাড়ে সমীক্ষা চালানো।

● কারিগরি কাপড় সংক্রান্ত প্রযুক্তি মিশন। বস্ত্র মন্ত্রক কারিগরি কাপড় সংক্রান্ত মিশন চালু করেছে। এর দু'টি মিনি মিশন আছে। মিনি মিশন-১ এবং মিনি মিশন-২ প্রকল্পের লক্ষ্য টেস্টিং-এর সুযোগ, দক্ষ কর্মী, গবেষণা ও বিকাশ, স্ট্যান্ডার্ড তৈরি, উদ্যোগ বিকাশ, বাজার উন্নয়নে সহায়তা, ফোকাস ইনকিউবেশন সেন্টার-এর জন্য মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নতি।

ক) ফোকাস ইনকিউবেশন সেন্টারগুলিকে "প্লাগ অ্যান্ড প্লে" মডেলে গড়ে তোলা হবে। সংশ্লিষ্ট উৎকর্ষ কেন্দ্র বাণিজ্যিক পরিমাণে উৎপাদনের সহায়তা জোগাবে।

খ) নতুন উদ্যোগীরা ফোকাস ইনকিউবেশন সেন্টার থেকে সাহায্য পাবে।

এই সেন্টার নিজেরা না গড়া পর্যন্ত এই সাহায্য মিলবে।

● ভারতে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাদ) অ্যাগ্রো-টেক্সটাইলের ব্যবহার বাড়ানোর প্রকল্প।

● উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অ্যাগ্রো-টেকসটাইল ব্যবহার প্রসারের প্রকল্প।

● উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জিওটেকনিক্যাল টেক্সটাইল ব্যবহার বাড়াতে প্রকল্প।

● এছাড়া, নতুন যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতির মানোন্নয়নের জন্য সাহায্য দেয়।

● সংহত টেক্সটাইল পার্ক প্রকল্প।

● কারিগরি কাপড় উৎপাদনের জন্য বড়সড় যন্ত্রপাতির আমদানি শুল্কে কিছুটা ছাড়।

● কারিগরি কাপড়ের জন্য ফোকাস প্রডাক্ট স্কিম : কারিগরি কাপড় রপ্তানিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারত থেক পণ্য রপ্তানি প্রকল্পে (মার্চেনডাইজ এক্সপোর্টস ফ্রম ইন্ডিয়া স্কিম-এম ই আই এস) শুল্ক বাবদ ক্রেডিট মেলে।

● কারিগরি কাপড় পণ্যের নিয়ামক রীতিনীতি স্থির করার জন্য বস্ত্র মন্ত্রক কাজ চালাচ্ছে। এর ফলে ভারতে কারিগরি কাপড়জাত জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়বে।

● কারিগরি কাপড়ের জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র : টেস্টিং, প্রশিক্ষণ, পণ্য বিকাশ, তথ্য সম্পদ ইত্যাদি ব্যাপারে শিল্পকে সহায়তা করতে এসব কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলিতে নিচের সুযোগসুবিধাগুলি মেনে :

➔ জাতীয় আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড মাফিক পণ্যের পরীক্ষানিরীক্ষা ও মূল্যায়ন।

➔ বইপত্তর, স্ট্যান্ডার্ড, নমুনা ইত্যাদি-সহ সম্পদ কেন্দ্র।

➔ বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও ল্যাবরেটরির সহযোগিতায় বিশ্বমানের গবেষণা ও বিকাশ এবং প্রোটোটাইপ বা অনুকৃতি উন্নয়ন।

➔ কারিগরি কাপড় শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ।

➔ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে পরামর্শদান এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া।

➔ নতুন উদ্যোগীদের জন্য প্লাগ অ্যান্ড প্লে টাইপের ইনকিউবেশন সেন্টার। এই কেন্দ্রে মনোযোগ দেওয়া হবে কারিগরি কাপড়ের এক বিশেষ অংশে।

➔ ব্যবসায়ী ও উদ্যোগীদের জন্য পরামর্শদান পরিষেবা।

সরকারও কাজ করছে :

➔ উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে গবেষণা ও বিকাশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

➔ দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন।

➔ রপ্তানি প্রসার।

সারণি-১
ভারতে কারিগরি কাপড়ের জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্রের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিষ্ঠানের নাম	কারিগরি কাপড়ের বিভাগ
১।	দ্য সিনথেটিক অ্যান্ড সিল্ক মিলস' রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (সাসমিরা), মুম্বাই	অ্যাগ্রোটেক
২।	আমদাবাদ টেক্সটাইল ইন্ডাসট্রিস রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, আটিরা, আমদাবাদ	কম্পোজিট
৩।	বম্বে টেক্সাটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (বিট্রা), মুম্বাই	জিওটেক
৪।	পিএমজি কলেজ অব টেকনলজি, কয়েম্বাটোর	ইন্ডাটেক
৫।	দ্য সাউথ ইন্ডিয়া টেক্সটাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (সিট্রা) কয়েম্বাটোর	মেডিটেক
৬।	ডি কে টি ই সোসাইটি'স টেক্সটাইল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ইছলকরণজি	ননউভেন
৭।	নর্দান ইন্ডিয়া টেক্সস্টাইল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন (নিটরা), গাজিয়াবাদ	প্রোটেক
৮।	উল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, মুম্বাই	স্পোর্টটেক

রেখাচিত্র-১
কারিগরি কাপড় উৎকর্ষ কেন্দ্রের পরিষেবা

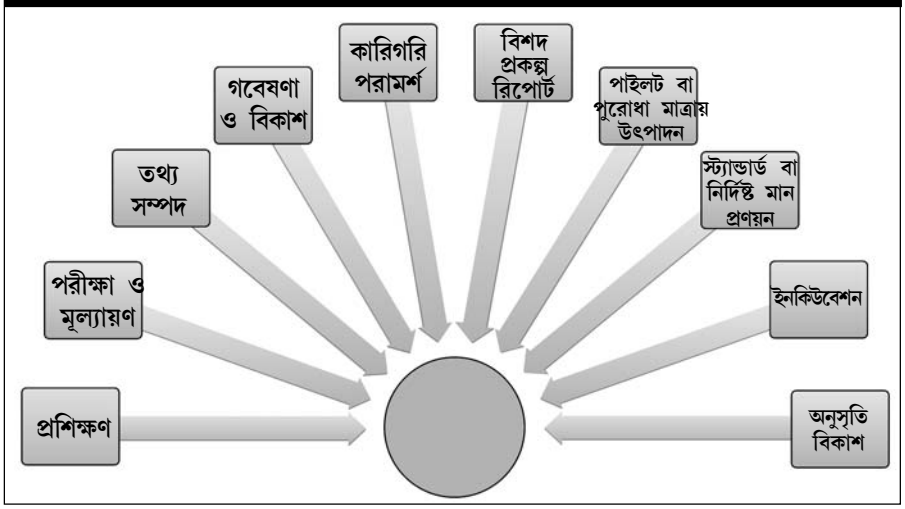

➔ কারিগরি কাপড়ের হারমনাইজড সিস্টেম অব নমেনক্লেচার (এইচ এস এন) কোড চিহ্নিতকরণ।

➔ কারিগরি কাপড় শিল্পে লগ্নি বাড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহ।

➔ কারিগরি কাপড়ের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য নিয়ামক ব্যবস্থা।

➔ কারিগরি কাপড়ের স্ট্যান্ডার্ড বা নির্দিষ্ট সফল প্রণয়ন।

➔ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারকারীদের মধ্যে কারিগরি কাপড় ভোগের প্রসার।

➔ কারিগরি কাপড় উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈরি বাড়ানো।

➔ সদ্য শুরু হওয়া এই শিল্পের দিকে নিরন্তর নজর।

পরিশেষ

কারিগরি কাপড় হচ্ছে কাপড় শিল্পে এক উদীয়মান ক্ষেত্র। চিকিৎসা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, গাড়ি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিশোধন, সুরক্ষা, তাপনিরোধ, স্বাচ্ছন্দ্য, হাইজিন-এর মতো বিশেষ কাজে কারিগরি কাপড় ব্যবহৃত হয়। ভারতে এর মাথাপিছু ভোগ বিশ্ব গড়ের তুলনায় ঢের কম। কম মজুরি, পর্যাপ্ত কাঁচামাল, দেশের বিশাল বাজার ইত্যাদির সুবাদে অনেক কারিগরি কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে ভারতের এখন বেশ সুবিধে আছে। সাবেকি কাপড় শিল্পের সে রমরমা আর নেই। কারিগরি কাপড় ক্ষেত্রে সরকারের নীতি উদ্যোগীদের পক্ষে বেশ অনুকূল। উঠতি এই শিল্পের সুযোগ সদ্ব্যবহার করে কারিগরি কাপড় ক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত করার এক সুবর্ণ সম্ভাবনা হাজির হয়েছে ধুঁকতে থাকা প্রচলিত কাপড় শিল্পের সামনে। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক কয়েম্বাটোর-এর South India Textile Research Association-এর অধিকর্তা। ইমেল : director@sitra.org.in)

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ

গান্ধীজীর পরিবেশ চিন্তা

একটি প্রাথমিক সমীক্ষা

*গান্ধীর পরিবেশ চিন্তা নিয়ে আগ্রহ ইদানীংকার। পরিবেশ বিষয়ে তার অবদান সংক্রান্ত সামান্য যা কিছু লেখাপত্তর তা অসংবদ্ধ বা অস্পষ্ট। পরিবেশ নিয়ে গান্ধীর ভাবনাকে টেনে আনা কেন, গোড়াতেই এ প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। তাঁর মতামত পরিবেশ বিতর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে। পরিবেশ বিষয়ে তাঁর বেশি ভাবনাচিন্তা ছিল নৈতিক ইস্যু নিয়ে। আধুনিক সভ্যতার প্রতি তাঁর তীব্র অনাগ্রহ গান্ধীর ভাবনার একটি মূল ইস্যু। পরিবেশ নিয়ে তাঁর চিন্তার চারটি ক্ষেত্র আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংরক্ষণ, প্রাণী সুরক্ষা, গ্রাম পুনর্গঠন ও বৃহৎ শিল্পপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা। গান্ধীর কাছে গোহত্যা ও মানুষ খুন একই মুদ্রার দু'পিঠ। আবার তিনি স্বীকার করেছেন যে, বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেককে কিছু হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। পরিবেশ নিয়ে তার পাঁচমিশেলি মতামতের পিছনে যেসব মূল ধারণা সক্রিয় সেগুলি শনাক্ত করা দরকার। লিখেছেন—***ড. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

পরিবেশ নিয়ে গান্ধীজীর মতামত সম্পর্কে আগ্রহ এই সেদিনের। এ বিষয়ে লেখা বইপত্তর কিন্তু আদৌ সুসংবদ্ধ বা স্পষ্ট নয়। এই সাম্প্রতিকতার ব্যাপারটি যুক্তিগ্রাহ্য, কেননা ভারতে 'পরিবেশগত বিতর্কের' ঢেউ এসেছে দেরিতে। রাজনীতিক, সক্রিয় কর্মী এবং বিজ্ঞানীরা (সমাজবিজ্ঞানীরাও অন্তর্ভুক্ত) এই বিতর্কে বেশি সংখ্যায় অংশ নিচ্ছেন মাত্র গত বছর বিশেক। আজ অবধি, এ বিষয়ে গান্ধীজীর অবদান সম্পর্কে মূল্যায়নের প্রচেষ্টা হয়েছে যৎকিঞ্চিৎ। এর অন্যতম নজির, ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'দ্য পেঙ্গুইন গান্ধী রিডার'। পরিবেশ বিষয়ে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি বইটিতে পুরোপুরি উপেক্ষিত হলেও তার গুচ্ছের আনুষঙ্গিক লেখাজোখা দিব্যি ঢোকানো হয়েছে অবশ্য।

অন্যদিকে, পরিবেশ বিষয়ে গান্ধীর অবদান সংক্রান্ত সামান্য যা কিছু লেখাপত্তর তা অসংবদ্ধ রয়েগেছে আজও। এসব লেখালেখিতে সমন্বিত গবেষণা, দিশা ও উদ্দেশ্যের একান্ত অভাব। অস্পষ্টতায় ভরা লেখাপত্রগুলি। এ নিয়ে বিশদ পর্যালোচনায় যাচ্ছি না। নমুনা হিসেবে এখানে তিনটি লেখার উল্লেখ করব। এই তিনটি লেখাই বেরিয়েছে গত শতকের ৯০-এর দশকে। প্রথম দু'টি গান্ধীর ভাবনা ও দর্শন সংক্রান্ত অনুসন্ধিৎসার অংশ। তৃতীয়টি শুধুমাত্র পরিবেশ নিয়ে আলোচনায় ভরা। গান্ধী ভাবনায় বাস্তুসংস্থান ভারসাম্য ও সমন্বয় নিয়ে এস. কীর্তি সিং ভাসা ভাসা কথা বলেছেন। বাস্তুসংস্থান বিষয়ে ইদানীংকার আগ্রহ-দুশ্চিন্তা, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং গান্ধী ভাবনায় শিল্প ও প্রযুক্তি নিয়ে তার আলোচনা ওপর ওপর। সিং-এর মন্তব্য, "প্রকৃতির সহজ-সরল জীবনে ফিরে যাবার জন্য তাঁর ঐকান্তিক কামনা তাঁকে এক বিশিষ্ট বাস্তুসংস্থানবিদ এবং এক্ষেত্রে এক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষককে রূপান্তর করেছে। তার মতে, 'বর্তমান সময়ে গান্ধীর ধ্যানধারণা পুনরাবৃত্তি করা যায় না, তবে এসব নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।' দশরথ সিং, অবশ্য, 'গান্ধী ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ' নিয়ে আলোচনার জন্য এক কাঠামো উদ্ভাবন করেছেন। তার মতে, 'মানবজাতির সামনে কোনও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ না থাকার সময়' গান্ধী ছিলেন এক পরিবেশবাদী। অন্য কথায়, পরিবেশ সমস্যা গান্ধীর কাছে ছিল নিছক নৈতিক সঙ্কট। টি. এন. খোসবুর *মহাত্মা গান্ধী—অ্যান অ্যাপসল অব অ্যাপ্লায়েড হিউম্যান ইকোলজি* পুস্তিকাটি এ বিষয়ে বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা। এ বইয়ের অবশ্য দু'টি বড়সড় খামতি আছে। প্রথম, একশো খণ্ডবিশিষ্ট গান্ধীর কালেক্টেড ওয়ার্কস-এর উপর ভিত্তি করে লেখা হয়নি এ বইটি। দ্বিতীয়ত, পরিবেশ ইতিহাসে গান্ধী ভাবনার প্রাসঙ্গিক অপরীক্ষিতই রয়ে গেছে।

এই লেখাটির নাম দিয়েছি 'গান্ধীজীর পরিবেশ চিন্তা : একটি প্রাথমিক সমীক্ষা'। গবেষণা এখনও চলছে বলেই এহেন নামকরণ। বস্তুত, আমার পক্ষে, এ বিষয়টা পরিবেশগত ইতিহাস নিয়ে আমার গবেষণামূলক আগ্রহেরই এক সংযোজন। এই পর্যায়ে, রচনাটি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে পরিবেশ বিতর্কে গান্ধীর অবদান সম্পর্কে মূল্যায়ন। সেই সঙ্গে এর সমস্যা ও সম্ভাবনা। পরিবেশ সম্পর্কিত গান্ধীর লেখাজোখা নিয়ে ব্যাখ্যা দ্বিতীয় ভাগের কাজ। সংরক্ষণ, জীবজন্তু সুরক্ষা, গ্রাম পুনর্গঠন ও বৃহৎ শিল্পপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্র বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে। ইদানীংকার 'পরিবেশ বিতর্কের' কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধানের লক্ষ্যে গান্ধী ও পরিবেশকে সংযুক্ত করে গবেষণার এক অ্যাজেন্ডা উদ্ভাবনের চেষ্টা আছে তৃতীয় ভাগটিতে। সেই সঙ্গে চর্চা করা হয়েছে ভারতের পরিবেশ ইতিহাসে গান্ধী ভাবনার সূক্ষ্মতা, অভিনবত্ব এবং মর্মকথাও।

★★★★★

পরিবেশ নিয়ে গান্ধীর ভাবনাকে টেনে আনা কেন, গোড়াতেই এ প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে আমাদের। বিভিন্নভাবে এর জবাব খোঁজা হয়েছে। তত্ত্ব তালাশ করা যেতে পারে আরও নানাভাবে। ভারতে পরিবেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। পরিবেশ আন্দোলন গড়ে উঠেছে গত সত্তরের দশক থেকে, এ অজুহাতে পরিবেশের জন্য গান্ধী অপ্রাসঙ্গিক, সওয়াল করাটা এক ধরনের ছেলেমানুষি। আধুনিক বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন শুরু হওয়া ইস্তক পরিবেশবাদের সূত্রপাত না হবার বিষয়টি ব্যাপক মান্যতা পেয়েছে। আমেরিকায় পরিবেশ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার শুরু নিশ্চিতভাবে উনিশ শতকে। ১৬০০ থেকে ১৮৬০ সাল সময়কালে ইউরোপের মানসিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তারের সঙ্গে আধুনিক পরিবেশ ভাবনাকে জুড়লে পরিবেশবাদ ২০০ বছর পুরোনো। গান্ধী, তাই, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ শুরু হবার আগের কোনও ব্যক্তি নন।

আরও যুক্তি দেখানো হয় যে, গান্ধীর বেশি ভাবনাচিন্তা ছিল নৈতিক ইস্যু নিয়ে। যা কিনা মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নামে আখ্যাত। এর মধ্যে পড়ে চেতনা, মূল্যবোধ, বিশ্ব বীক্ষা, নৈতিকতা ও মানসিক অবস্থা। এগুলি আজকালকার বিতর্কের প্রধান বিষয়বস্তু বাহ্য পরিবেশের বিপ্রতীপ। সন্দেহ আছে, এই যুক্তিও নিখাদ কিনা। পরিবেশ এক জটিল ব্যবস্থা। এতে জীব ও উদ্ভিদ এবং জড় জগতের উপাদানগুলি পরস্পরের উপর কাজ করে। এই ব্যবস্থায় জমি, জল, গাছপালা, প্রাণী ও মানুষ আন্তঃসংযোগের এক প্যাঁচালো জালে যুক্ত। অন্যভাবে বললে, পরিবেশকে বাস্তুসংস্থানগত, জীবকেন্দ্রিক, অর্থনৈতিক ও নীতিশাস্ত্রভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। এরা পরস্পর-সম্পর্কিত এবং তাই এগুলি পৃথক করা যায় না। নৈতিক পরিবেশের উপর গান্ধীর গুরুত্বদানকে বস্তুগত পরিবেশকে অস্বীকার করার সামিল, এমত ভাবটা সমীচীন নয়। এছাড়াও, ঔপনিবেশিক শাসকের আনা পরিবর্তনগুলির ব্যাপারে গান্ধী ছিলেন অতি উদ্বিগ্ন। এসব রদবদল বস্তুগত পরিবেশকে প্রভাবিত করেছিল নিঃসন্দেহে। প্রকৃতির দীর্ঘ ইতিহাসে ঔপনিবেশবাদের পুনর্মূল্যায়ন যাই হোক, পরিবেশের ইতিবৃত্তে ঔপনিবেশিকতার ঘটনা উপেক্ষা করা যাবে না। গান্ধীর তোলা অনেক ইস্যু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঠাঁই পেতে পারে এতে।

পরিবেশ নীতি পরিবেশ আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জোগায় বলে ধরা হয়। পরিবেশ ইতিহাসের মধ্যেও নীতির ইস্যুগুলি কম স্পষ্ট হতে পারে, কিন্তু বিলকুল গরহাজির নয়। এখানে এক দোটানা লক্ষ্য করে ডোনাল্ড ওরস্টার লিখেছেন : 'পরিবেশ ইতিহাস জন্ম নিয়েছিল এক নৈতিক উদ্দেশ্যের গর্ভ থেকে, এর পিছনে ছিল জোরালো রাজনৈতিক অঙ্গীকার। কিন্তু পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এটা এমন এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ উদ্যোগে পরিণত হয়, যার না ছিল কোনও সহজ বা একক, নৈতিক বা রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা। যদিও, মানুষের জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা ও স্থান এর বিষয়বস্তু থেকেই গেছে। এটা কাজ করে তিন স্তরে। প্রথম স্তরটি হচ্ছে প্রকৃতিকে বোঝা। সামাজিক-অর্থনৈতিক জগৎ নিয়ে কারবার দ্বিতীয় স্তরের। তৃতীয় স্তরটি সামলায় মানসিক বা বৌদ্ধিক ইস্যুগুলি। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভাব বিনিময়ের অঙ্গ হয়ে ওঠে বোধশক্তি, নীতিশাস্ত্র, আইন, কল্পকথা ইত্যাদি। ওরস্টার লিখেছেন, 'মানুষ তার চারপাশের জগতের মানচিত্র রচনা, সম্পদের সংজ্ঞা নির্ধারণ, পরিবেশ অবক্ষয়ে দায়ি আচার-আচরণ নির্ণয় বা কোন ধরনের আচরণ নিষিদ্ধ করা উচিত তা ঠিক করা এবং সাধারণভাবে তাদের জীবনের লক্ষ্য নিরূপণে সদা ব্যস্ত। বুঝিয়ে বলার জন্য, পরিবেশ চর্চার এই তিনটি স্তরের মধ্যে আমরা পার্থক্যের চেষ্টা করলেও, বস্তুতপক্ষে তারা এক অবিভক্ত গতিশীল অনুসন্ধান, যার মধ্যে প্রকৃতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা এক অখণ্ড রূপে বিবেচিত হয়।

পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি বা আচরণবিধি নিয়ে প্রশ্নের সমাধানে এই গতিশীল অনুসন্ধানের এক অপরিহার্য অঙ্গ গান্ধী ভাবনা। সঠিক ব্যাখ্যা করলে, গান্ধীর মতামত পরিবেশ বিতর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে। এসব অভিমত কখনো-সখনো খুঁজে পাওয়া যায় পথ প্রবর্তন ও ভবিষ্যদ্বাণীর সময়কালে, যাকে বলা হয় ভারতে পরিবেশবাদের প্রথম ঢেউ। পরিবেশবাদের দ্বিতীয় প্রবাহে এসব অবশ্য প্রতিবাদ বা জুতসই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক মতাদর্শ বিকাশেও অবদান রাখে। পরিবেশ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব দানা বাঁধে আরও ঘনঘন।

গান্ধী ভাবনার বৃহত্তর মূলকাঠামোকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অনুচিত। এটা অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তরের অন্য অংশ। পরিবেশ প্রসঙ্গে কেন গান্ধীকে টেনে আনা। জুডিথ ব্রাউন লিখেছেন, "তিনি কোনও তালিমপ্রাপ্ত দার্শনিক বা চিন্তার সংহত অবয়ব গড়ে তোলায় আগ্রহী নন। তিনি বরং জোরদার এক ধর্মীয় দূরদর্শিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধির মাধ্যমে বাস্তবমুখী হয়ে ওঠেন এবং বাস্তবতার আলোকে তার চিন্তাধারাকে পরিশীলিত করে নেন"। ব্রাউন কিন্তু স্বীকার করেন যে, এই কার্য-পরম্পরায় গান্ধীকে 'সময় ও স্থানের' প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অধ্যাপিকা ব্রাউনের মতে, সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষিতে মৌলবাদী বা গোঁড়া ধর্মীয়, দার্শনিক এবং নৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে তার সংঘাত এর কারণ। গান্ধীর নিজের কাছে সমগ্রের জন্য ভাবনাচিন্তাই ছিল সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। তিনি বারংবার তার ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি গোটা মানবজাতির সঙ্গে তার একাত্মতার কথা বলেছেন।

আধুনিক সভ্যতার প্রতি তার তীব্র বিরোধিতা গান্ধী ভাবনার একটি মূল ইস্যু। বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবে এর নির্বিচার যান্ত্রিক প্রয়োগ। হিন্দ স্বরাজ ও অন্যত্র তার এই দৃষ্টিভঙ্গি সুপরিচিত। আশিস নন্দী ও মকরন্দ পরাঞ্জপের মতে, আধুনিকতার উত্তর-আধুনিক পয়লা দিককার বিরোধীদের মধ্যে গান্ধীকে ধরা উচিত। তাঁদের কথায়, গান্ধী ভারতের অতি সাদাসিধে আদর্শ বনাম ইংরেজকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি স্বরাজের জন্য লড়াইকে দুই জীবনধারা—পাশ্চাত্যের আধুনিক, বস্তুগত, মহানগর, যান্ত্রিক বা সভ্যতা এবং ভারতের সনাতন, আধ্যাত্মিক, গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক সভ্যতার মধ্যে বৃহত্তর সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে

তুলে ধরেন। তারা গান্ধীর বিরোধিতাকে উত্তর-আধুনিক প্রয়াস আখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয় পরম্পরার মজ্জাগত নৈতিক বুনিয়াদের কারণে আধুনিকতার সমালোচকের আসনে গান্ধীকে বসানোও অবশ্য একইভাবে সম্ভব। এ. এল. ব্যাসম তাঁর জীবন জুড়ে হিন্দু ঐতিহ্যগত প্রভাব বয়ে চলার কিছু দিক চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে, দশরথ সিং গান্ধী চিন্তায় অনেকনন্তবাদের জৈন তত্ত্বের প্রভাব নির্দিষ্ট করেছেন।

বিপুল বহরের গান্ধী রচনাবলী থেকে পরিবেশগত অংশগুলি বাছাই করাটা যথেষ্ট ঝঞ্ঝাটের। অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে ফেলা দরকার।

★★★★★

পরিবেশ নিয়ে গান্ধী ভাবনার এক প্রতিনিধিত্ব ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণ তৈরির আগে সুবিশাল গান্ধী রচনাবলী আগাপাশতলা দেখে নেওয়া জরুরি। একশো খণ্ডের এই রচনাবলীতে অসংখ্য ইস্যুর পুনরাবৃত্তি আছে। তার থেকে বেছে নিতে হবে মূল অংশগুলি। অহিংসা, জীবের অধিকার, বৈষ্ণববাদ, খাদ্যাভ্যাস, চিকিৎসা পরিচর্যা, গ্রামীণ সমাজ ইত্যাদি ইত্যাদি বহু ইস্যুর বেশে পরিবেশ নিয়ে গান্ধীর ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ পায়। এখানে প্রত্যেকটি মতামত বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। চারটি ক্ষেত্র আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংরক্ষণ, প্রাণী সুরক্ষা, গ্রাম পুর্গঠন এবং বৃহৎ শিল্পপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা।

১৯২৫ সালে কচ্ছ এবং কাথিয়াওয়াড়ে তার সফরের পর সংরক্ষণ ও গাছ লাগানোর বিষয়ে গান্ধীর মত স্পষ্টভাবে জানা যায়। রচনাবলীর আঠাশতম খণ্ডের দু'টি অংশে এটা আছে। এখানে এমনকি সংরক্ষণও 'ধর্মের' এক অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। গান্ধী লিখেছেন, সব ধর্মই খুব সম্ভবত মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা দরকারে সাড়া দেয়। জলের টানাটানির জায়গায় কুয়ো খোঁড়া এক ধর্ম। অফুরান জলের স্থানে কুয়ো তৈরি কিছুটা উদ্ভট ব্যাপার। ঠিক তেমনই, ত্রিবাঙ্কুরের মতো জায়গায় গাছের চারা পোঁতা নিরর্থক হলেও ভারতের কিছু এলাকায় এটা এক ধর্মীয় বা প্রয়োজনের তাগিদ। এহেন এক জায়গা নিঃসন্দেহে কচ্ছ। এখানকার জলবায়ু মনোরম। কিন্তু বৃষ্টি না হলে, এর কিছু এলাকা পোড়ো জমিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। বৃষ্টিপাত বেশিরভাগ নির্ভর করে গাছাপালার উপর। বনায়ন হলে তাই বৃষ্টি বাড়বে। অন্যদিকে বনজঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলার পরিণতি হবে অনাবৃষ্টি বা খরা। কচ্ছে প্রতিটি গাছ, গুল্মলতা বাঁচিয়ে রাখা চাই।

পরে এক স্মৃতিচারণে, গান্ধী সঙ্কটের মূল খুঁজেছেন। সিন্দে আছে নদী। কচ্ছে নদী নেই। 'আনজার ও মুন্দ্রার মতো গুটিকয়েক জায়গা বাদ দিলে, কচ্ছে গাছের দেখা মেলা তাই ভার। যেখানে গাছপালা নেই, বৃষ্টি সেখানে নগণ্য। কচ্ছের হাল এমনই। বৃষ্টি ছিটেফোঁটা, তায় অবরে-সবরে। এর মোদ্দা ফল, প্রায় ফি বছর দুর্ভিক্ষ। জলের আকাল চিরকাল।'

মানুষজন ও সরকারকে দিয়ে এর সুরাহার কথা গান্ধী ভেবেছেন। তিনি সেখানে যান গাছ পোঁতা ও তার বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। জয়কৃষ্ণ ইন্দ্রজিৎ-এর উদ্যোগে গঠিত এক বৃক্ষরোপণ ও সুরক্ষা সমিতির তিনি উদ্বোধন করেন। রাজন্যশাসিত রাজ্য পোরবন্দরে বরদা পাহাড়ের উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল নিয়ে লেখা এক নামকরা বইয়ের রচয়িতা এই ইন্দ্রজিৎ। গান্ধীকে তিনি বোঝান, ঝোড়ো হাওয়ায় ভূমিক্ষয়ের দরুন গজিয়ে ওঠা বালিয়াড়িগুলিতে গাছ লাগিয়ে বাগান বানানো যেতে পারে। জ্বালানি বা অন্য কোনও কাজে গান্ধী একটি গাছও না কাটার পক্ষে যুক্তি দেখান। 'এই অঞ্চলের প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাঠ বা কয়লা সরকারের উচিত বাইরে থেকে আনা।' 'এতে খরচেরও সাশ্রয় হবে।' তিনি আশা করেন যে বৃক্ষরোপণ ও সুরক্ষা সমিতি আরও বেশি শাখা খুলবে। বিভিন্ন উপায়ে ভূমি ও মানুষের সুরক্ষার জন্য লোকজন ও সরকারের সহযোগিতা করা উচিত।

গান্ধী আরও বলেন : 'কচ্ছের মতো কাথিয়াবাড়ের ক্ষেত্রেও একথা সমান সত্যি। প্রভূত সম্ভাবনাময় এই ভূখণ্ড ছোট ছোট রাজ্যে খণ্ডবিখণ্ড। এসব রাজ্যের রাজারা কম বা বেশি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এদের মধ্যে সমন্বয় নেই বা থাকলেও তা নেহাত মামুলি...এক সাধারণ নীতি ব্যতিরেকে বন সংরক্ষণ, সর্বত্র বৃক্ষরোপণ, সেচ এবং আরও বহু কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে না। কিছু দিন আগে আমি শ্রী এলমসহার্স্ট-এর মতামত আবার শুনিয়েছিলাম যে কাথিয়াবাড়ের শাসকগণ ও লোকজন গাছ পোঁতার ব্যাপারে এক সাধারণ নীতি তৈরি না করলে ও তা মেনে না চললে, কাথিয়াবাড়ে জলের এমন ঘোর আকাল দেখা দেবে যে জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা...কচ্ছ, কাথিয়াবাড়, রাজপুতনা, সিন্দ ও এহেন অন্যান্য স্থানের সব স্কুলে ফলিত উদ্ভিদবিদ্যা পাঠ আবশ্যিক করা উচিত।' এখানে এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে সংরক্ষণ নিয়ে গান্ধীর মতামত, সেই পথপ্রবর্তনের সময় যতই অভিনব হোক না কেন, অন্যান্যদের তাতে সায় ছিল।

প্রাণী সুরক্ষার বিষয়ে গান্ধী খুব সোচ্চার। এক্ষেত্রে তার যুক্তিতর্ক অনেক বেশি বর্ণময় এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। গোরক্ষা, বলদের উপর অত্যাচার, প্রাণীহত্যা, প্রাণী অধিকার, ফসল ছারখারকারী বাঁদর হত্যা এমনকি নিষ্কৃতি মৃত্যুর সমধর্মী বিষয়ে তার মতামত সম্পর্কিত ১৫-টির বেশি লেখার আমরা খোঁজ করতে পেরেছি। এক মার্কিন পত্রলেখকের প্রশ্নের জবাবে 'বেঁচে থাকার অধিকার' নামে এক লেখায় গান্ধী বলেছেন : '...আমার বিশ্বাস ঈশ্বর সৃষ্ট প্রতিটি জীবের আমাদের মতোই বেঁচে থাকবার অধিকার আলবৎ আছে...। ভৌত বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ, এই সাফল্য আমাদের বিনয়ী করে এবং আমাদের জানতে শেখায় যে প্রকৃতির রহস্য আমরা প্রায় কিছুই জানিনা। আধ্যাত্মিক জগতে আমাদের অগ্রগতি নেহাতই তুচ্ছ। ভৌত বিষয় চাপা দিয়েছে আমাদের মধ্যেকার আধ্যাত্মিকতাকে। আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হবার ইচ্ছে আমাদের নেই। আমার বুদ্ধি এবং অন্তর বিশ্বাস করতে নাচার যে তথাকথিত ক্ষতিকর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে মানুষের ধ্বংসের জন্য। আমাদের নিজেদের অজ্ঞানতাকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো এবং মেনে নেওয়াটা বেশি ভালো হবে যে প্রতিটি

জীবনের এক প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য আছে।'

গোরক্ষা, যা কিনা তার কাছে গো সেবা, সে ব্যাপারে গান্ধীর বক্তব্যগুলি বেশি জটিল। সমসাময়িক এক রাজনৈতিক ইস্যুর সঙ্গে তাদের সংযোগ থাকাটা এর আংশিক কারণ। তার এক সাক্ষাৎকারগ্রহীতা গোরক্ষায় গান্ধীর ভাবনাচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথার্থভাবেই সত্যবাদিতা ও অহিংসা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষহীনতা, চূড়ান্ত সহনশীলতা ও প্রীতি এবং অর্থনৈতিক দিকে মনোযোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বেলগামে গোরক্ষা সমিতির সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় কয়েকটি কথা বলেন। তিনি শুরু করেন একথা দিয়ে যে গোরক্ষার সঠিক অর্থ এবং তাৎপর্য সম্পর্কে সকলে সহমত না হতে পারেন এবং এটা শুধুমাত্র গোহত্যা থেকে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের নিবৃত্ত করা নয়, তার কাছে কিন্তু গোহত্যা ও মানুষ খুন একই মুদ্রার দুই পিঠ। তিনি প্রকৃতই বিশ্বাস করতেন, 'গোরক্ষা কথাটি তার সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় বোঝায় প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণীর সুরক্ষা।' তিনি অন্যত্র অর্থনৈতিক দিকের উল্লেখ করে বলেছেন, আমরা খাসি করার জন্য নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় নেব, গবাদি পশুর খোরাকির জন্য ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি অবশ্যই খুঁজতে হবে, গবাদি পশুর কল্যাণের পাশপাাশি তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ পরিষেবাও নেব, গোরু ও মোষের দুধ উৎপাদন বাড়াতেই হবে এবং মরা গবাদি পশুর চামড়া অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হিসেবে কাজে লাগাব। গোরু বিক্রি বাড়ার মধ্যে তিনি খুঁজে পান গোহত্যার মূল কারণ। সমাজের গোচারণ ভূমি সরকার ঘিরে নেওয়ায় গোপালন আর লোকের সাধ্যের মধ্যে থাকছে না।

দু'টি চরম অবস্থায় প্রাণী হত্যার পক্ষে গান্ধীর যুক্তির কথা উল্লেখ করাটা এখানে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। প্রথমটি হচ্ছে, ১৯২৮ সালে একটি গান্ধী আশ্রমে এক রুগ্ন বাছুরের মৃত্যুর জেরে আমেদাবাদ ও অন্যত্র কিছু জায়গায় ঘোর তোলপাড় সৃষ্টি। পীড়িত গোশাবকটির জীবনযাতনার অবসানের জন্য ডাক্তারকে বিষ ইনজেকশন দেবার পরামর্শ দিতে গান্ধীর এতটুকু বুক কাঁপেনি। গান্ধী এই কাজের স্বপক্ষে যুক্তি সাজান যে এটা তো নিজের স্বার্থে করা হয়নি। মানুষের বেলায় এমনকি স্বেচ্ছা বা নিষ্কৃতির মৃত্যুর মতো ব্যাপারে গান্ধী এই নীতি নিয়ে এগিয়ে ছিলেন। যদিও, তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল হিংসা ও অহিংসার আসল প্রকৃতি। তিনি লিখেছেন, '...রাগের বশবর্তী হয়ে বা স্বীয় মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে কাউকে কষ্ট দেওয়া বা কারও খারাপ করার ইচ্ছা বা জীবিত কারও প্রাণ নেওয়া হচ্ছে হিংসা। পক্ষান্তরে...শুদ্ধ চিত্ত, আত্মস্বার্থহীন অভিপ্রায় নিয়ে আধ্যাত্মিক বা ভৌত মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কোনও জীবিত প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া বা হত্যা করা অহিংসার পবিত্রতম রূপ হতে পারে...হিংসা বা অহিংসার চূড়ান্ত পরীক্ষা হচ্ছে কোনও কাজের পিছনে তার উদ্দেশ্যের উপর। আর একটি ঘটনা, তার আশ্রমে বানরদের উৎপাত গান্ধীকে চরম দৃষ্টিভঙ্গি নিতে প্রবৃত্ত করেছিল। তিনি বলেন : 'ভয় পাইয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে বানরদের জখম করার মতলব আমার পক্ষে অসহ্য মনে হবে, যদিও বানরের উপদ্রব অসহনীয় হয়ে উঠলে আমি তাদের মেরে ফেলার ব্যাপারটি নিয়ে সত্যি সত্যি ভাবছি।' তিনি স্বীকার করেছেন যে বেঁচে থাকতে গেলে প্রত্যেককে কিছু হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। এই কিছু হিংসা জীবনের জন্য স্বাভাবিকভাবে আবশ্যক। বানরের নষ্টামি চাষিদের কাছে অন্যতম মূর্তিমান সমস্যা বলে ক্ষেতের ফসল বাঁচানোর স্বার্থে গান্ধী ন্যূনতম হিংসা প্রয়োগের মাধ্যমে কোনও উপায় খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন।

"প্রথম, গান্ধী চিন্তার হরেক ধরন এবং সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও, পরিবেশের ব্যাপারে এর তাৎপর্য নৈতিকই রয়ে যাবে। পরিবেশগত নৈতিকতা চর্চার শাখা বা বিভাগ ক্রমবর্ধমান এবং গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা গভীর ও অবিলম্বিত। তাই তো, দাবি করা হয়েছে যে, 'তার জীবদ্দশার সময়ের চেয়ে আজ তিনি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক'। তার দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতা এখানে তার শক্তি। দুই, পরিবেশগত বিতর্কে এখন দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয় এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা। এর কোন আশু আসান দেখা যাচ্ছে না। গান্ধীর অবদানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল দু' ক্ষেত্রেই তার স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। তার প্রধান ভাবাদর্শগত উদ্বেগ বিশ্বজনীন হলেও তিনি সব সময় স্থানীয় ক্ষেত্রেও জড়িত ছিলেন।"

জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতায় তার উদ্বেগ গান্ধী রচনার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেন এবং এ ব্যাপারে অনেকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। এক ইংরেজ মহিলা একবার ভারতের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বলদের উপর নিয়ত উৎপীড়নের অভিযোগ করলে, গান্ধী বলেন দু'একটি ঘটনা দেখে চটজলদি এই সাধারণ ধারণা বা সামানীকরণে আসা হয়েছে। কিন্তু তিনি বস্তুত সেই মহিলার অধিকাংশ যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল অব উইমেন-এর পক্ষ থেকে এক পত্রলেখক কলকাতায় প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা; যেমন, ভারি মালপত্র পরিবহণে মোষ ও বলদের উপর দুর্বিষহ উৎপীড়নের কথা জানিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গান্ধীর ভাবলেশহীন স্বীকারোক্তি ছিল : 'মুশকিলের কথা, ভারবাহী পশু গোরু, মোষ, ঘোড়ার প্রতি নিষ্ঠুরতা সত্যিই রূঢ়।'

'থটফুল লিভিং' নামে একটি রচনায় এহেন নিষ্ঠুরতায় গান্ধীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। ভারি মালপত্র বওয়ার দু'চাকার গাড়িতে জুতে দেওয়া বলদ জোড়ার ক্লেশ দেখে তার মর্মপীড়ার এক কাহিনী

আছে সেখানে। ১৯২১ সালে তিনি অস্থি থেকে যাচ্ছিলেন ওর্য়াধা। পথে বিগড়োয় তার গাড়ি। নেই কোনও উপায়। উঠে পড়লেন গোশকটে। রাতভর বেশ জোরে ছুটছিল গোরুর গাড়িটা। সকালে গান্ধীর ঘুম ভাঙ্গলো। তিনি লিখেছেন : 'শিউরে উঠলাম, দেখি গাড়োয়ানের পাঁচনবাড়ির ডগায় ধারালো পেরেক বসানো। বলদ দু'টির পিঠে ঘনঘন সেই পাঁচনবাড়ি কষিয়ে গাড়োয়ান গাড়ি ছোটাচ্ছেন। জ্বালাযন্ত্রণা সইতে না পেরে দুই বলদ সারা পথ চোনা (গোমূত্র) ফেলতে ফেলতে গেছে। তিলেক সবুর না করে গান্ধী চেয়েছিলেন গাড়ি থেকে নেমে পড়তে। নিজেকে বুঝিয়ে, তিনি গাড়ির মালিককে পাঁচনবাড়ি তাকে দিতে বলেন। গাড়োয়ান সেটি তুলে দেন তার হাতে। এরপর গান্ধী লেখেন : 'আমি কাঠের পাঁচনবাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, এর ভোঁতা দিকটি তো ব্যবহার করা যেতে পারে। আমার জন্য বলদদের ছোটানোর দরকার নেই। গাড়োয়ানকে বলে দিলাম, আমার পৌঁছতে এক ঘণ্টা দেরি হলেও তাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। পেরেক খুলে ফেলতে আমি অনুরোধ করেছিলাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন তা করার।'

গান্ধীর মধ্যে দু' ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য এই ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হল দুর্বল, অসহায় ও অবোলাদের জন্য 'সহৃদয়তা এবং সহানুভূতি-করুণা'। আমরা যে মানুষ হয়ে অন্য মানুষের জন্য সহানুভূতি বোধ করি তাকে বিশেষ করে তারিফের কিছু নেই। আমাদের তো এই অনুভূতি থাকাটাই উচিত।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের তুলনায় গবাদি পশু কী আরও বেশি অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত ও বোবা নয়। দুরবস্থা চরমে উঠলে দুর্ভিক্ষগ্রস্তরা মরিয়া হয়ে আমাদের সঙ্গে এমনকি মারামারিতে নেমে পড়তে পারে। বলদের পক্ষে কি তা সম্ভব। সে না পারে কথা বলতে, না পারে দ্বৈরথে নামতে। গান্ধীর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া আরও ঢের বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, কেন না এটা তাকে স্বরাজ অর্জনের আরও বহু অবস্থা-পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করে। এটা উল্লেখযোগ্য যে স্বশুদ্ধির মাধ্যমে স্বরাজ লাভের জন্য, তিনি সীমা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন, 'আমাদের আপন ভাইদের' থেকে 'আমাদের ভাঙ্গি ভাইরা' সেখান থেকে আমাদের জন্য ভাই ও বোনেরা—প্রাণীরা'। প্রাণীদের জন্য দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা তাই স্বরাজের গান্ধী ভাবনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

গ্রাম পুনর্গঠনের গান্ধী ভাবনাকে তার পরিবেশ সচেতনতার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত করা যেতে পারে। অমলেন্দু দে লিখেছেন যে গান্ধী 'নিদেনপক্ষে এক হাজার মানুষের বসতি এহেন প্রতিটি গ্রামে খুদে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এহেন সাধারণতন্ত্রে বন্দোবস্ত থাকবে খাদ্য, বসবাসের ঘরবাড়ি, জীবনযাত্রার আবশ্যিক জিনিসপত্র, সার, বাস্তুসংস্থান ভারসাম্য বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পোড়ো জমি ও বনজঙ্গল, বুনিয়াদি শিক্ষা ইত্যাদির। ঠিক কথা যে গ্রাম নিয়ে তার ধারণা মূলত তার কল্পনাতেই ছিল। তবে বিকেন্দ্রীত ও স্থানীয় শাসন-সহ গ্রামকে একক বা ইউনিট হিসেবে ধরে তার গ্রামোন্নয়নের চিন্তা বাস্তবমুখী। তার মতে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের এক বড় হাতিয়ার হতে পারে গ্রামের পঞ্চায়েতি রাজ। তিনি চেয়েছিলেন গ্রামে একটি সাধারণ গোচারণক্ষেত্র, সমবায় ডেয়ারি, খাদি, হস্ত ও গ্রামীণ শিল্প। মানুষের যাতায়াতের কষ্ট ও সেই সঙ্গে ভারবাহী পশুর ক্লেশ ঘোচাতে তিনি গ্রামের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির কথা বলেছেন। আমেদাবাদ অঞ্চলে গ্রামের মানুষদের সাহায্য করার জন্য তিনি পল্লিশ্রী নামে ১৮ দফা এক কর্মসূচি উদ্ভাবন করেন। সর্বোপরি, স্যানিটেশন বা পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা তার কাছে ছিল এক ভৌত ও নৈতিক ইস্যু। তিনি লিখেছেন : 'যে যত্রতত্র থুতু ফেলে বায়ুদূষণ করে, আবর্জনা ও বাজে জিনিসপত্র ছুঁড়ে, ভূতল নোংরা করে, সে মানুষ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাপ করছে...যে কুয়ো, পুকুর বা নদীর জলে স্নান করি, হাতমুখ ধুই, তা নোংরা করতে আমাদের বাধে না। আমি মনে করি এসব দোষ-ত্রুটি অতি গর্হিত। এসব আমাদের গ্রাম, পবিত্র নদীগুলির পূত তীরের হতশ্রী দশা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশজনিত রোগবালাইয়ের জন্য দায়ি।

বৃহৎ শিল্পপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার প্রতি গান্ধীর বিরোধিতা আকছার উল্লেখ করা হয়, চলে ঢালাও ভুলভাল ব্যাখ্যা। গান্ধীকে শুধুমাত্র এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিপক্ষ বা গোড়ার দিককার উত্তর-আধুনিকতাবাদী চিন্তার সমর্থক হিসেবে বিবেচনা করাটা অনুচিত। গান্ধীর এই বিরোধীতাকে সুমিত সরকার নিঃসন্দেহে অবাস্তব এবং বস্তুত দুর্বোধ্য আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে, এটা বিশেষ করে ঔপনিবেশিক পরিবেশে আধুনিকতার বেখাপ্পা প্রভাবকে তুলে ধরেছিল বইকি। ১৯২৮ সালের গোড়ায় নেহরু চেষ্টা করেছিলেন গান্ধীকে বোঝাতে যে, দোষত্রুটিগুলি ঠিক বৃহৎ শিল্পপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গলদ। গান্ধীর কিন্তু তাতে বিশ্বাস জন্মায়নি।

সংরক্ষণ, প্রাণীসুরক্ষা, গ্রাম পুনর্গঠন ও শিল্পায়ন নিয়ে গান্ধী চিন্তার পরিবেশগত তাৎপর্য বহুবিধ। অহিংসা, সত্যতা ও স্বরাজ-এর মতো বিষয় প্রায়শই জড়িত থাকায় এসব চিন্তা অনন্যসাধারণ। পরিবেশ নিয়ে তার পাঁচমেশিলি মতামতের পিছনে যেসব মূল ধ্যানধারণা সক্রিয় সেগুলি সনাক্ত করা দরকার। সাধারণভাবে যা ভাবা হয় তার চেয়ে এগুলি বেশি সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল এবং পরিবেশগত বহু ইস্যুর সঙ্গে তা যোগ করা যেতে পারে। তার কিছু মতামত আপাতদৃষ্টিতে অবশ্যই অচল এবং একই চিন্তার চর্বিতচর্বণ।

তবে সারবস্তুটি খুঁজেপেতে নিয়ে বিচারপূর্বক ব্যাখ্যা করতে হবে। একথা কি ঠিক যে এই মর্মবস্তুতে এক জোরালো ধর্মীয় ঝোঁক বিদ্যমান এবং সেই হেতু, আজকের পরিবেশ বিতর্কে এর প্রাসঙ্গিকতা সীমিত? আমি মনে করি যে গান্ধী ভাবনার অন্তিম নিহিতার্থ হচ্ছে নৈতিক কিন্তু এর সঙ্গে আছে এক পার্থিব সম্পর্ক। পরিবেশ সংক্রান্ত গান্ধী চিন্তার ব্যাখ্যায় একে উপেক্ষা করা অনুচিত।

★★★★★

পরিবেশ বিষয়ে গান্ধীর অবদান নিয়ে হয়নি পুরোদস্তুর কোনও গবেষণা। এই গবেষণার কাজ হবে দু'টি প্রধান ক্ষেত্র

সামলানো। এই দু'টি ক্ষেত্রই যথেষ্ট জটিল। পরিবেশ সংক্রান্ত গান্ধী ভাবনার সূক্ষ্মতা ও রকমফের হরেকভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এটা নির্ভর করবে একজন গবেষকের বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো বা অন্তর্দৃষ্টির উপর। পরিবেশের বহু দিক আছে। গবেষককে তাই এক বিশেষ অবস্থান ধরে নিতে হবে। গবেষণার বিষয় সেই অনুসারে একেকরকম হবে।

এই ব্যাখ্যামূলক কাজের তিনটি দিকে আমি নিজেকে গণ্ডিবদ্ধ করব। এর প্রতিটি দিক নিয়ে আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। প্রথম, গান্ধী চিন্তার হরেক ধরন এবং সূক্ষ্মতা সত্ত্বেও, পরিবেশের ব্যাপারে এর তাৎপর্য নৈতিকই রয়ে যাবে। পরিবেশগত নৈতিকতা চর্চার শাখা বা বিভাগ ক্রমবর্ধমান এবং গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা গভীর ও অবিলম্বিত। তাই তো, দাবি করা হয়েছে যে, 'তার জীবদ্দশার সময়ের চেয়ে আজ তিনি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক'। তার দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতা এখানে তার শক্তি। দুই, পরিবেশগত বিতর্কে এখন দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয় এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা। এর কোন আশু আসান দেখা যাচ্ছে না। গান্ধীর অবদানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল দু' ক্ষেত্রেই তার স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। তার প্রধান ভাবাদর্শগত উদ্বেগ বিশ্বজনীন হলেও তিনি সব সময় স্থানীয় ক্ষেত্রেও জড়িত ছিলেন। বাস্তবিকই, গান্ধী ভাবাদর্শ সমকালীন ভারতে স্থানীয় স্তরের অনেক পরিবেশ আন্দোলন চালিয়ে যেতে ক্ষমতা জুগিয়েছে। সবশেষে, ভারতের পরিবেশ ইতিহাসে গান্ধীর গুরুত্ব শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিমানুষ বা তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তার উপর নির্ভর করে না। বহু বহু মানুষ ও তাঁর মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব বা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল। সর্বোপরি, ছিলেন 'ক্ষুদে গান্ধীরা' যারা তার জীবদ্দশা বা পরে তাকে অনুসরণ করেছেন। আরও বেশি বিশ্লেষণাত্মকভাবে ভারতীয় পরিবেশবাদের সংক্ষিপ্ত অথচ বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল ইতিহাসে স্থাপিত হবার আগে পরিবেশের গান্ধী বিশ্ব বীক্ষায় উচিত এদের সবাইকে তুলে ধরা। ❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক সিনিয়র ফেলো, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশাল সায়েন্স রিসার্চ এবং হিসটরিক্যাল অ্যান্ড আর্কিয়লজিক্যাল সায়েন্স, এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা। অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের নুরুল হাসান অধ্যাপক ও কলা বিভাগের ডিন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের বর্তমান বহিরাগত (ভিজিটিং) অধ্যাপক। সম্পাদক, দ্য ক্যালকাটা হিসটরিক্যাল জার্নাল, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।)

উল্লেখপঞ্জি :

A. L. Basham, 'Traditional Influences on the thought of Mahatma Gandhi', in Ravinder Kumar (ed.) *Essays on Gandhian Politics : The Rowlatt Satyagraha of 1919* (London, 1971) pp. 17-42.

Amalendu De, 'Mahatma Gandhi's conception of religion and Politics' in *The Comming of Modern Age in India : Essays in Honour of Dr. Phulrenu Guha* (Calcutta, 1997), p. 94.

Amlan Datta, 'Gandhi and the Contemporary Crisis' Ramjee Singh and S. Sundaram (ed.) *Gandhi and the World Order* (Varanasi, 1996), p. 300.

Arun Bandopadhyay, *Bengal Past and Present*, Vol. 115, Nos. 220-221, Parts I & II (1996).

Arun Bandopadhyay, 'Towards an understanding of the environmental history of India' *The Calcutta Historical Journal*, vol. XVI, No. 2 (July-December, 1994) pp. 153-165.

Ashish Nandi, *The Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self under colonialism* (New Delhi, 1983) and Makarand Paranjape, *Decolonization and Development : Hind Swaraj Revisioned* (New Delhi, 1993).

Donald Worster (ed.) *The Ends of the Earth : Perspective on Modern Environmental History* (Cambridge, 1988), p. 290.

Gyanendra Pande, *The Construction of Colonialismin Colonial North India* (New Delhi, 1990).

Jacques Pouchepedem, Colonialism and Environment in India—Comparative Perspective in *Economic and Political Weekly*. August 19, 1995, pp. 2059-2067.

Judith Brown, *Gandhi : Prisoner of Hope* (Delhi, 1990), p. 392.

M. Kirti Singh, *Philosophical Import of Gandhism* (South Asia Publication, 1994); Dasrath Singh, *Perspectives in Gandhian Thopught* (Commonwealth Publishers 1995);

P. R. Trivedi and Uttam Sinha (ed.) *Global Environmental Education : Vision of 2001* (New Delhi, 1993), p. 8.

Publications Division, 'The Collected Works of Mahatma Gandhi', Vols. 19, 25, 27, 28, 30, 36, 37, 42, 64.

Ramachandra Guha, "Social-Ecological Research in India A 'Status' Report" in *Economic and Political Weekly*, February 15, 1997, pp. 345-352.

Ramachandra Guha, 'Prehisotry of Indian Environmentalism, in *Economic and Policial Weekly*, January 2, 1992.

Ramachandra Guha, 'Ideological Trends in Indian Environmentalism' in *Economic and Political Weekly*, December 3, 1988.

Richard Grove, *Green Imperialism Colonial Expansion, tropical island Edens and the origins of environmentalism 1600-1800* (Delhi 1995).

Rudrangshu Mukherjee (ed.) *The Penguin Gandhi Reader* (New Delhi, 1993). The short introduction does not refer to 'environment', though there is a section on 'Critique of Modern Civilization'

Samit Sarkar, *Modern India* (Delhi, 1983) p. 181.

T. N. Khoshoo, *Mahatma Gandhi : An Apostle of Applied Human Ecology* (Tara Energy Research Institute, New Delhi, 1995; Reprint 1996)

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ

গান্ধী ও স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ধারণা

গত ২০১৪ সালে গান্ধী জয়ন্তীর দিনে যে দেশে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা হয়, তা জানতে আজ বোধহয় কারও আর বাকি নেই। পরিচ্ছন্ন ভারত গড়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে পাঁচ বছর। আগামী ২০১৯ সালে ২ অক্টোবর, গান্ধীর সার্ধশততম জন্ম দিবসে এক নির্মল পরিচ্ছন্ন ভারত উপহার দিয়ে জানানো হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী। কিন্তু হঠাৎ এরকম এক নির্ভেজাল সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে গান্ধীর নাম জড়ানো হল কেন? এর উত্তর খুঁজতে আমাদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে, তা ব্যক্তিগতই হোক বা পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা বিষয়েই হোক, গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে হবে। উল্লেখিত দু'ধরনের পরিচ্ছন্নতাকেই নিজের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন তিনি। "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও"—আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর জীবনের টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা ও তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে গান্ধীর মতাদর্শকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরেছেন—**দেবজ্যোতি চন্দ**

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৪৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২ অক্টোবর, ২০১৪ সালে সারা দেশজুড়ে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' নামে এক কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সূচনা হয়। এর আগে, জুন মাসে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি সংসদে ভাষণ দেওয়ার সময় এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ২০১৯ সালে দেশ মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্ম দিন পালন করবে। তার আগে, এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচির মাধ্যমে এক নির্মল তথা আবর্জনামুক্ত দেশ গড়ে তোলাটা জাতির পিতার প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশবাসীকে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান প্রচারিত হবার পর তা গোটা দেশজুড়ে সাড়া ফেলে দেয়। যুবা থেকে বৃদ্ধ, মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই উদ্দেশ্য পূরণে এগিয়ে এসেছেন। শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, কর্পোরেট জগৎ সবাই সাধ্যমত এই কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। স্কুল মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সাফাই অভিযান। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় পঞ্চায়েত ও নগরপালিকাগুলিতে চলছে নির্মল ভারত গড়ার কর্মকাণ্ড।

শুধু পরিচ্ছন্নতা অভিযানই নয়, এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল এমন পরিকাঠামো নির্মাণ যার দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে সারা দেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা যায় এবং তা জনগণের মধ্যে এক অভ্যাসে পরিণত করা যায়। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেক পরিবারের জন্য শৌচালয় নির্মাণ, গ্রাম ও শহরের পয়ঃপ্রণালীর সংস্কারসাধন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে সুচারু করা, গ্রাম ও শহরের পরিবেশের সংস্কার সাধন, বিদ্যালয় শৌচাগার নির্মাণ ও সবার জন্য পরিশ্রুত পানীয় জলের জোগান সুনিশ্চিত করার কাজ চলছে জোর কদমে।

> ***"স্বচ্ছতা ও নির্মল পরিবেশের জন্য মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সূচনা দক্ষিণ আফ্রিকায়। দক্ষিণ অফ্রিকায় গান্ধীকে ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত প্রথম শ্রেণির কামরা থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন থেকেই তার বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু। কিন্তু দুঃখের সাথে তিনি এও লক্ষ্য করেন যে, তৃতীয় শ্রেণির কামরাগুলি, যাতে ভারতীয়রা যাতায়াত করে, তা পানের পিক, থুতু ও অন্যান্য আবর্জনায় পুতিগন্ধময়। পরিবেশ অত্যন্ত দূষিত। ভারতীয়দের এইসব কুঅভ্যাস ত্যাগ করার ডাক দেন গান্ধী। কারণ, তা না হলে ইউরোপীয়ানদের সাথে সমানাধিকারের দাবি শাসকদের দিয়ে কোনও দিনও মানানো যাবে না।"***

মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন যে, "রাজনৈতিক স্বাধীনতার থেকেও পরিচ্ছন্নতা বেশি জরুরি।" নিজে আগে পালন করে, পরে সেই সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতেন তিনি। তাই শত ব্যস্ততার মধ্যেও সময় পেলেই নিজে হাতে তাঁর আশ্রম পরিষ্কার করতেন এবং অন্যান্য আশ্রমিকদের নিজের কাজ নিজে করার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন।

সারা দেশে তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে। গান্ধীজী তাঁর লেখনী ও ভাষণের মাধ্যমে দেশের জনগণকে দেশমাতৃকার সেবার নিয়োজিত হবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। নবজীবন ও হরিজন পত্রিকার মাধ্যমে চলছে নিরন্তর প্রচার। কিন্তু তাঁর এই সব প্রচারমূলক লেখা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে দেশ ও জাতি গঠনে

ব্যক্তিগত স্তরে ও পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন গান্ধীজী। সমাজের একটি অংশ, যারা মানুষের মল পরিষ্কারের কাজে নিয়োজিত, তাদের উচ্চশ্রেণির ভারতীয়রা অস্পৃশ্য করে রেখেছিলেন। এই অবস্থা গান্ধীজীকে ভীষণ পীড়া দিত। মা পুতলীবাঈ একবার গান্ধীজীকে এক 'ভাঙ্গি'-কে ছোঁয়ার অপরাধে স্নান করার আদেশ দেন, তিনি মাকে ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শুধুমাত্র তার পেশার জন্য কোনও মানুষকে এক ঘরে করে রাখা যে অপরাধ, তা বুঝিয়ে বলেন। পরে এই 'ভাঙ্গি'-দের নাম দেন হরিজন এবং বুকে টেনে নেন তাদের। কিন্তু এটা খেয়াল করেন যে, এই হরিজনদের মধ্যে নানা কুঅভ্যাস রয়েছে যার জন্য অন্যরা তাদের থেকে দূরে সরে থাকে। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তিনি প্রয়াসী হন। কারণ, তাঁর উপলব্ধি ঘটে যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও জাতপাতহীন সুস্থ ভারতীয় সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে পরিচ্ছন্নতার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গান্ধীজীর জীবনের নানা ঘটনা ফিরে দেখলে, স্বচ্ছতা ও নির্মল পরিবেশকে তিনি কতটা গুরুত্ব দিতেন তা বোঝা যায়।

গুজরাটের রাজকোটে মহাত্মা গান্ধীর পরিবারের যথেষ্ট সুনাম ছিল। পিতা ও পিতামহ উভয়েই রাজকোট ও আশেপাশের নানা রাজ্যে দেওয়ান (প্রধানমন্ত্রী) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র এবং একজন ব্যারিস্টার হওয়ার সত্ত্বেও বাড়ি বাড়ি ঘুরে ড্রেন ও পয়ঃপ্রণালী সাফসুতরো আছে কি না তার নজরদারি করতেন। ২৪ মে, ১৯২৫ সালের নবজীবন পত্রিকায় লেখেন, "পশ্চিমে থেকে আমি এটা শিখেছি যে, শৌচাগার বাড়ির বসার ঘরের মতোই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। অপরিচ্ছন্ন শৌচাগার এবং যত্রতত্র মলমূত্র ফেলার নোংরা অভ্যেসের ফলে আমাদের দেশে অনেক ধরনের রোগ ছড়ায়।"

স্বচ্ছতা ও নির্মল পরিবেশের জন্য মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সূচনা দক্ষিণ আফ্রিকায়। দক্ষিণ অফ্রিকায় গান্ধীকে ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত প্রথম শ্রেণির কামরা থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন থেকেই তার বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু। কিন্তু দুঃখের সাথে তিনি এও লক্ষ্য করেন যে, তৃতীয় শ্রেণির কামরাগুলি, যাতে ভারতীয়রা যাতায়াত করে, তা পানের পিক, থুতু ও অন্যান্য আবর্জনায় পুতিগন্ধময়। পরিবেশ অত্যন্ত দূষিত। ভারতীয়দের এইসব কুঅভ্যাস ত্যাগ করার ডাক দেন গান্ধী। কারণ, তা না

হলে ইউরোপীয়ানদের সাথে সমানাধিকারের দাবি শাসকদের দিয়ে কোনও দিনও মানানো যাবে না। আরও লক্ষ্য করেন যে, ভারতীয়রা ইউরোপীয়ানদের থেকে বঞ্চনা ও বর্ণবৈষম্যের শিকার। আবার সেই ভারতীয়দের মধ্যে যারা উচ্চশ্রেণির, তারাই অশিক্ষিত শ্রমজীবী ভারতীয়দের সংশ্রব এড়িয়ে চলেন। এই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই মহাত্মা গান্ধী নিজে হাতে মল পরিষ্কার করা ও মাটি চাপা দেওয়ার কাজ শুরু করেন। যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আসার পরও চালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসার পর গান্ধী একবার কংগ্রেসের সাধারণ সভায় যোগ দিতে কলকাতায় আসেন। সেখানে, শৌচাগারের অপরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখে অত্যন্ত কূপিত হন। স্বেচ্ছাসেবীদের পরিষ্কার করার অনুরোধ করলে তারা তা করতে অসম্মত হয়। গান্ধী তখন বালতি, ঝাড়ু নিয়ে নিজেই এই কাজে লেগে পড়েন। পরবর্তীকালে গান্ধীজী যখন জাতীয় কংগ্রেসের সর্বেসর্বা, তখন কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালীন ব্রাহ্মণদেরও ভাঙ্গির কাজ করতে দেখা গেছে। মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় এইভাবেই এ দেশে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

১৯১৫ সালে গান্ধীজী হরিদ্বারে যান কুম্ভমেলা দর্শনে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীকে গঙ্গায় অবগাহন করতে দেখে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। কারণ, এত পুণ্যার্থীর আগমনের ফলে হরিদ্বারে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তা দেখে তিনি আশান্বিত হন। ধর্মের নামে পবিত্র নদী গঙ্গাকে যেভাবে দূষিত করা হচ্ছে এবং গঙ্গার দুই পাড়ে যেভাবে নোংরা হচ্ছে তা তাকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি বলেন, এই সব কাজকর্ম ধর্ম, বিজ্ঞান এবং সমস্ত স্বাভাবিক নিয়মকানুনকে লঙ্ঘন করে।

গান্ধীজী তৎকালীন বাংলার বীরভূম জেলা থেকে এক গ্রামবাসীর লিখিত পত্রের উত্তরে ১৯৩৭ সালে হরিজন পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। একটি আদর্শ গ্রাম কেমন হওয়া উচিত তার বিবরণ দেন সেখানে তিনি। এখানেও গ্রামবাসীদের যৌথভাবে তাদের গ্রামকে পরিষ্কার রাখার কাজে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

গান্ধীজীকে হামেশাই ইংরেজ রাজপুরুষদের বাংলোগুলিতে যাতায়াত করতে হতো। সেখানে গেলেই তিনি ভৃত্যদের কোয়ার্টার্স পরিদর্শন করতেন, যা এই বড়ো বড়ো বাংলোগুলোর পিছনে বানানো হতো। এমনকি ভাইসরয়ের বাংলোতেও ভৃত্যদের বাসস্থানগুলিকে অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় আবিষ্কার করেন এবং মালিক ও ভৃত্যের গৃহের একইরকম স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।

বর্তমানে সারা দেশে যখন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো বিভিন্ন ভেক্টরবাহিত সংক্রামক রোগের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে; স্বাস্থ্য সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নভেম্বর, ১৯১৯ সালে নবজীবন পত্রিকায় গান্ধী লিখছেন, যত্রতত্র থুতু, মল, মূত্র ছড়িয়ে থাকার ফলে টিবি ইত্যাদি রোগের বীজাণু পরিবেশে ছড়িয়ে মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। যেখানে সেখানে জমা জল থাকলে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। যদি এই গর্তগুলো বুঁজিয়ে জল জমা রোধ করা যায়, তাহলে ম্যালেরিয়া হওয়ার আশঙ্কায়ও অনেকটা কমে। সুস্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে যে একটা গভীর সম্পর্ক আছে, তা তিনি বারংবার মনে করিয়ে দেন।

গান্ধীজী তাঁর লেখায় বারংবার এই কথায় জোর দিতেন যে, এই কাজ কারও একার বা কোনও গোষ্ঠীবিশেষের নয়। নির্মল ভারত গড়তে গেলে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কোনও কাজ ছোটো নয় বা কোনও কাজ কোনও বিশেষ জাতির জন্য নির্দিষ্ট নয়। প্রত্যেকে যদি নিজের ময়লা নিজেরাই সাফ করে, তাহলে সমাজের কিছু মানুষকে এই ভার সারা জীবন বইতে হয় না। তিনি সাফসাফাইকে একটি অভিযানের রূপ দেন এবং সবাইকে নিয়ে এই কাজ সম্পাদনে ব্রতী হন। মাঝে মাঝেই এই উদ্দেশ্যে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে হরিজন বস্তিগুলিকে সাফসুতরো করার অভিযানে নামতেন গান্ধী।

দেশভাগের প্রাক্কালে জাতিদাঙ্গা পীড়িত নোয়াখালি পরিদর্শনের সময়েও তিনি তাঁর এই কর্মকাণ্ডে অবিচলিত ছিলেন এবং নোয়াখালি ভ্রমণকালে যেখানেই আবর্জনা দেখতেন তা নিজ হাতে পরিষ্কার করতেন।

২০১২ সাল থেকে যে নির্মল ভারত অভিযান শুরু করা হয়েছিল, তারই এক নতুন রূপ স্বচ্ছ ভারত অভিযান। এই প্রকল্প সম্পাদনে ইতোমধ্যে ১,৩৪,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ১১.১১ কোটি শৌচালয় নির্মাণে ব্যবহৃত হবে। তার সাথে স্কুলগুলিতেও স্বচ্ছ ভারত অভিযান বিশেষভাবে পালিত হচ্ছে।

একই সাথে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে স্বচ্ছ বিদ্যালয় অভিযানও শুরু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এক বছরের মধ্যে সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়ে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও স্কুলের পয়ঃপ্রণালী উন্নয়ন ও পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। সরকার এই অভিযানটিকে দেশের সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর জন্য গঠন করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা কোষ। এই কোষে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থদান করতে পারবে, যা স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পটিকে তরান্বিত করতে সাহায্য করবে। এই কোষে অর্থদান করলে আয়কর ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

কাজেই, স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর চিন্তায় এবং চেতনায় অনুপ্রাণিত অভিনব প্রয়াস বলে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হবে না। ২ অক্টোবর, ২০১৯ গান্ধীজির সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে এই কর্মসূচির ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী যদি সত্যি সত্যি একে আমরা সফল করতে পারি, তবে, সারা বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব, এই আশা অবশ্যই করা যায়।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক রবীন্দ্রভীরতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাস কমিউনিকেশন ও ভিডিওগ্রাফি' বিভাগের অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর ইনচার্জ।)

যোজনা ? কুইজ

এবারের বিষয় : মহাত্মা গান্ধী

১. গান্ধীজীকে কে 'মহাত্মা' উপাধি দেন?

২. ৯ জানুয়ারি তারিখটিকে 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস', উপলক্ষ্যে পালন করা হয় কোন ঘটনার স্মরণে?

৩. গান্ধীজী কোন কোন জায়গায় সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেছিলেন?

৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারকে সহায়তা করার জন্য গান্ধীজীকে কী খেতাব দেওয়া হয়?

৫. 'ক্রিপস মিশন'-এর প্রস্তাবকে কে 'Post-dated cheque on a failing bank' বলে অভিহিত করেন?

৬. জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে কে বলেছিলেন, "Cooperation in any shape or form with this satanic government is sinful"?

৭. কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় গান্ধীজী মর্মাহত হয়ে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন?

৮. গান্ধীজীর বিখ্যাত 'ডান্ডি অভিযান'-এর সময়সীমা ছিল ————।

৯. গান্ধীজী কোন দু'টি সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন?

১০. দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে কে যোগ দিতে যান?

১১. কোন আন্দোলনে প্রথমবার সাধারণ ধর্মঘটের অনুমতি দিয়ে গান্ধীজী 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (do or die) বলে ডাক দেন?

১২. দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় পুনরায় আইন অমান্য চালু হলে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে কোন জেলে রাখা হয়?

১৩. গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার 'টলস্টয় ফার্ম' ও 'ফিনিস্ক ফার্ম' গড়ে তুলেছিলেন কেন?

১৪. দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন স্টেশনে গান্ধীকে ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি ঘটে?

১৫. কত সালে গান্ধী প্রথম 'সত্যাগ্রহ' শব্দটি চালু করেন?

১৬. চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ পার্টিকে কে কংগ্রেসের রাজনৈতিক শাখা (Political Wing) হিসাবে গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন?

১৭. ভারতে গান্ধীজী প্রথম কোথায় আন্দোলন শুরু করেন?

১৮. কোন বড়োলাট গান্ধীজীর ১১ দফা দাবি অগ্রাহ্য করার পর বিখ্যাত 'লবণ সত্যাগ্রহ' শুরু হয়?

১৯. ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রধান নীতি-নির্ধারক হিসাবে থেকে গেলেও, গান্ধী তার বহু আগেই আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিলেন, কত সালে?

২০. ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে আসার পরবর্তী তিন বছরে গান্ধী তিনটি স্থানীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন, কোথায় কোথায়?

২১. কোন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী সর্ব-ভারতীয় নেতায় পরিণত হন?

২২. 'হিন্দ স্বরাজ' বইটির লেখক কে?

২৩. দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর প্রধান মুখপত্র ছিল ——————।

২৪. কোন বইতে গান্ধী তাঁর আর্থ-সামাজিক (গ্রামীণ) আদর্শের ধ্যানধারণার কথা তুলে ধরেন?

২৫. ১৯৪২ সালে স্ত্রী কস্তুরবা গান্ধী যখন মারা যান, তখন গান্ধী কোথায় অন্তরীণ ছিলেন?

২৬. ম্যাকডোনাল্ড-এর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী দলিত নেতাদের সঙ্গে কোন চুক্তি স্বাক্ষর করেন?

২৭. কোন শহরে মহাত্মা গান্ধী জন্মেছিলেন?

২৮. গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয় কত সালে?

২৯. দিল্লির এক প্রার্থনা সভায় কার গুলিতে গান্ধীজী নিহত হন?

৩০. মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকান্ডের পর দেশের কোন সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়?

৩১. 'দ্য সোসালিস্ট, গান্ধী ভার্সেস লেনিন' বইটির লেখক কে?

৩২. 'মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ' বইটি কে লেখেন?

৩৩. কত সালে গান্ধীজী 'অল ইন্ডিয়া খিলাফত' কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন?

৩৪. আন্দোলনকালীন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটার প্রেক্ষিতে কোন আন্দোলনকে 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' বলে বর্ণনা করে গান্ধীজী তা প্রত্যাহার করে নেন?

৩৫. বিধি অনুযায়ী ভারতীয় মুদ্রায় একমাত্র কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ছবি ছাপা হতে পারে?

৩৬. গান্ধীজী তাঁর বিখ্যাত 'ডান্ডি অভিযান' শুরু করেন কোথা থেকে?

৩৭. বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ODF ভারত-এর লক্ষ্য পূরণের দিনটি ধার্য করেছে আগামী ২০১৯ সালের ২ অক্টোবর। দিনটির তাৎপর্য কী?

৩৮. মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনটিকে (২ অক্টোবর) সারা বিশ্বজুড়ে কী হিসাবে পালন করা হয়?

৩৯. রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভা কোন তারিখে ২ অক্টোবর দিনটিকে 'আন্তর্জতিক অহিংসা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেয়?

৪০. গান্ধীজী যে 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' তৈরি করেন তা কী বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত?

উত্তর :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২. ১৯১৫ সালের ওই দিনটিতে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন। ৩. সাবরমতী ও সেবাগ্রাম (ওয়ার্ধা)। ৪. কাইজার-ই-হিন্দ। ৫. মহাত্মা গান্ধী। ৬. মহাত্মা গান্ধী। ৭. চৌরিচৌরার ঘটনা। ৮. ১২ মার্চ—৬ এপ্রিল, ১৯৩০। ৯. ইয়ং ইন্ডিয়া এবং হরিজন। ১০. মহাত্মা গান্ধী। ১১. 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন (আগস্ট, ১৯৪২)। ১২. পুনের ইয়েরওয়াড়া জেল। ১৩. স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। ১৪. পিটার ম্যারিটসবার্গ। ১৫. ১৯০৭ সালে। ১৬. গান্ধীজী। ১৭. চম্পারণ, বিহার। ১৮. লর্ড আরউইন। ১৯. ১৯৩৪ সালে। ২০. চম্পারণ ও খেড়ায় কৃষক আন্দোলন এবং আমেদাবাদে শ্রমিক আন্দোলন। ২১. রাউলাট সত্যাগ্রহ (১৯১৯ সালে)। ২২. মহাত্মা গান্ধী। ২৩. 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন'। ২৪. 'হিন্দ স্বরাজ'। ২৫. পুনের আগা খান প্রাসাদে। ২৬. পুনা চুক্তি। ২৭. পোর বন্দর, গুজরাট (১৮৬৯ সালে)। ২৮. ১৯৩১ সাল (মার্চ)। ২৯. নাথুরাম গডসে (৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮)। ৩০. রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS)। ৩১. শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে। ৩২. মহাত্মা গান্ধী। ৩৩. ১৯১৯ সাল (নভেম্বর)। ৩৪. রাওলাট সত্যাগ্রহ। ৩৫. মহাত্মা গান্ধী। ৩৬. সবরমতী আশ্রম। ৩৭. মহাত্মা গান্ধীর দেড়শোতম জন্মদিন। ৩৮. আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস (International Day of Non-violence)। ৩৯. ১৫ জুন, ২০০৭। ৪০. বুনিয়াদি শিক্ষা। ❑

যোজনা ||| নোটবুক

‘কলকাতার সন্ত’ মাদার টেরিজা

ভ্যাটিকান সিটির সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে গত ৪ সেপ্টেম্বর মাদার টেরিজাকে সন্ত হিসাবে ঘোষণা করেন পোপ ফ্রান্সিস। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্যাটিকানে আসা হাজার হাজার মানুষ সেন্ট পিটার্সের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হন। ৫ সেপ্টেম্বর মাদারের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী। তার ঠিক আগের দিন রোমে ‘ক্যানোনাইজেশান’ অনুষ্ঠানে মাদারকে ‘সন্ত’ উপাধিতে ভূষিত করেন পোপ ফ্রান্সিস।

গত ডিসেম্বরে ভ্যাটিকানের তরফে জানানো হয়, সন্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করেছেন মাদার টেরিজা। দু’টি ঘটনাকে অলৌকিক বলে স্বীকৃতি দেয় ভ্যাটিকান এবং সর্বশেষে পোপ। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৮ সালে। পশ্চিমবঙ্গের এক আদিবাসী মহিলা মণিকা বেসরার পেটের টিউমার সারে মাদার টেরিজার নামে প্রার্থনা করে। এই ঘটনাকে ‘চমৎকার’ বা miracle হিসেবে স্বীকৃতির জেরে ২০০৩ সালের ১৯ অক্টোবর মাদার টেরিজাকে ‘বিয়েটিফিকেশন’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ‘Blessed’ ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় চমৎকারটি ঘটে ২০০৮ সালে ব্রাজিলে। মার্সিলিও হান্দাদ অ্যান্ডিনোর মস্তিষ্কের ‘abscess’ সেরে যায় মাদারের নামে প্রার্থনা করার ফলে।

‘ক্যাননাইজেশন’ অনুষ্ঠান : গত ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠান শুরু হয় স্থানীয় সময় সকাল ১০টায়। চলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। শোভাযাত্রা-সহ আসেন পোপ ফ্রান্সিস। যাজকদের সমবেত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। নিয়মমাফিক পোপের কাছে মাদার টেরিজাকে ‘সেন্ট টেরিজা অফ ক্যালকাটা’ হিসেবে গণ্য করার আর্জি পেশ করলেন ‘প্রিফেক্ট’ কার্ডিনাল অ্যাঞ্জেলো আমাতো। মাদারের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন তিনি। জীবনী পাঠের পর আবার প্রার্থনা। তার পরেই ‘দ্য ফরমুলা অফ ক্যাননাইজেশন’ পাঠ করেন পোপ। সেদিন থেকে ‘সন্ত’ হলেন কলকাতার মাদার টেরিজা। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হল ‘আমেন’। এক মুহূর্ত সব চুপ। তার পরেই সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে হাজার পায়রা ওড়ার শব্দ, হাততালি। মঞ্চে এবার আনা হয় আধ্যাত্মিক relic (স্মরণচিহ্ন)। মাদারের পবিত্র স্মারক—নীল-সাদা ঘোমটার আদলেই একটি ফলক স্মারকের সামনে বাতি জ্বালিয়ে দিলেন দুই সন্ন্যাসিনী। কলকাতা থেকে আর্চবিশপের ব্যবস্থাপনায় আনা হয়েছিল মাদারের এক টুকরো চুল আর দাঁত। ভ্যাটিকান সিটিতে এসে এ বার থেকে ‘সন্ত’ টেরিজার নশ্বর শরীরের এই সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাবেন তীর্থযাত্রী-পর্যটকেরা। উল্লেখ্য, মাদারের সন্ত হওয়ার অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের নেতৃত্বে ভারত সরকারের এক প্রতিনিধিদল হাজির হন। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি দল-সহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পৌঁছে যান। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : জন্ম ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট। তৎকালীন যুগোস্লাভিয়ার স্কোপেতে (বর্তমানে স্কোপে রিপাব্লিক অফ ম্যাসিডোনিয়া-র রাজধানী)। জন্মসূত্রে অ্যালবেনীয়, বাবা নিকোলা এবং মা দ্রানা বোজজিউর পাঁচ সন্তানের সর্বকণিষ্ঠ গন্‌জা অ্যাগ্নেস। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে রাথফার্নহাম মঠের উদ্দেশ্যে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে যাত্রা করেন। সেখানে নতুন নাম হয় সিস্টার টেরিজা। ওই বছর ডিসেম্বরে জাহাজে চেপে রওনা হন ভারতের লোরেটো আশ্রমের দিকে। ১৯২৯ সালের ৬ জানুয়ারি কলকাতায় পৌঁছন। সেখান থেকে দার্জিলিং। ১৯৩১ সালের ২৫ মে বিশেষ উপাসনার অনুষ্ঠানে সিস্টার টেরিজা প্রথম সন্ন্যাসব্রত নেন। এর পর কলকাতার এন্টালি অঞ্চলের লোরেটো কনভেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। সেখানে সেন্ট মেরিজ স্কুলে ভূগোল এবং ধর্ম বিষয়ে পড়াতে থাকেন। সিস্টার টেরিজা শিক্ষক হিসেবে ছাত্রীদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৯৪৪ সালে সেন্ট মেরিজের অধ্যক্ষা হন।

১৯৪৬ সাল। ট্রেনে দার্জিলিং যাওয়ার পথে অন্য আহ্বান শুনতে পেলেন। সব কিছু ছেড়ে দরিদ্র, আর্ত, নিপীড়িত, অনাথদের পাশে থেকে যিশুর সেবা করার ডাক। তাতে সাড়া দিয়ে ১৯৪৮ সালে লোরেটো সঙ্ঘের কালো গাউন ছেড়ে নীল পাড় সাদা শাড়ি পরলেন। ১৯৫০ সালের ৭ অক্টোবর তৈরি হল মিশনারিজ অফ চ্যারিটি। তার পর এক লম্বা যাত্রাপথ। মাদারের উদ্যোগে একে একে তৈরি হল ‘নির্মল হৃদয়’, ‘শিশু ভবন’, ‘প্রেমদান’, ‘দয়াদান’, কুষ্ঠরোগীর আশ্রম। সাহায্যের জন্য ছুটে যান এক দেশ থেকে অন্য দেশ। তারই স্বীকৃতিতে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান ১৯৭৯ সালে। ভারত সরকারও ১৯৮০ সালে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান, ভারতরত্ন-এ ভূষিত করে মাদার টেরিজাকে।

সন্ত হওয়ার তাৎপর্য : সন্ত বা ‘Saint’ শব্দটি এসেছে লাতিন ‘Sanctus’ থেকে, যার অর্থ পবিত্র। গোড়ায় সেন্ট বলতে বোঝাত, যারা যিশুর প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে উঠেছেন। এখন ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্মে সন্ত মানে, যিনি অসামান্য ধর্মপরায়ণ ও পবিত্র জীবন যাপন করে ‘হেভেন’ বা স্বর্গে স্থান পেয়েছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে তার intercession (মধ্যস্থতা) হয়েছে। মানুষের প্রার্থনা তিনি ঈশ্বরকে সরাসরি জানাতে পারেন। প্রথম দিকে মূলত ছিল স্থানীয় বিশ্বাসের ব্যাপার। কারও সম্পর্কে মানুষ শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাকে সন্ত মনে করলে ও আঞ্চলিক চার্চ তা সমর্থন করলে সন্তের স্বীকৃতি মিলতো। ক্রমে নিয়ম-রীতি অনেক সংহত ও নির্দিষ্ট হয়েছে, এসেছে ‘ক্যাননাইজেশন’ বা সন্তায়ন-এর পদ্ধতি। এই ক্ষেত্রে miracle বা ‘চমৎকার’-এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। সন্ত যেহেতু ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সাধনের অধিকার পেয়েছেন, তাই তার প্রয়াণের পরে দু’টি ‘অলৌকিক’ ঘটনা প্রমাণ করতে হয়। সেগুলি জানিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর তার কথা শুনে ‘চমৎকার’ ঘটিয়েছেন।

সন্তায়ন বা ‘ক্যাননাইজেশন’ বহু প্রাচীন এক খ্রিষ্টধর্মীয় পরম্পরা। এখনও পর্যন্ত সন্ত হয়েছেন ৮১০ জন। অতীতে সন্ত ঘোষণার ঘটনাও ছিল বিরল। এক-এক জনের সন্ত হতে অনেক সময় এক শতাব্দী কেটে যেত। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত হওয়ার প্রক্রিয়াতেও এসেছে নানা সংস্কার। মাদার সন্ত হলেন প্রয়াণের মাত্র ২০ বছরের মাথায়। ❑

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২২ আগস্ট—২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬)

আন্তর্জাতিক

● **উত্তর কোরিয়ার পঞ্চম পরমাণু পরীক্ষা :**

গত ৯ সেপ্টেম্বর পঞ্চমবার পরমাণু পরীক্ষা করে উত্তর কোরিয়া। তাদের দাবি, হিরোশিমার থেকেও শক্তিশালী এই পরমাণু বিস্ফোরণ। ক্যালিফোর্নিয়ার মিডলবেরি ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ সূত্রে খবর, এটি ২০-৩০ কিলোটনের পরমাণু বিস্ফোরণ। হিরোশিমাতে ১৫ কিলোটনের বোমা ফেলা হয়েছিল। উত্তর কোরিয়ার পরমাণু পরীক্ষায় রিখটার স্কেলে ৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয় পাংগাই-রিতে। ভূমিকম্পের ধরন এবং মাত্রা দেখে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হন যে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে উত্তর কোরিয়ায়।

এর পরে সে দেশের উপরে আর্থিক নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব আনেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার সিদ্ধান্তের নিন্দা করে রাষ্ট্রপুঞ্জও। সে দেশের উপরে নয়া নিষেধাজ্ঞার পক্ষে সওয়াল করে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স।

● **প্রধানমন্ত্রীর ভিয়েতনাম সফর :**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩ সেপ্টেম্বর দু'দিনের ভিয়েতনাম সফরে হ্যানয় পৌঁছান। রাষ্ট্রপতি শিন চাও-এর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজের পর ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী নগুয়েন শুয়ান ফুকের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয় তার। সফরের প্রথম দিনের বৈঠকেই দু'দেশের মধ্যে ১২-টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিরক্ষায় উন্নয়নের জন্য ভিয়েতনামকে ৫০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য দিচ্ছে ভারত। ২০২০ সালের মধ্যে দু'দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে ১৫০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ারও লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়।

● **ব্রিকস ও জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন :**

পূর্ব চিনের হানঝউয়ে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে একই সঙ্গে বসে ব্রিকস ও জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলন। (ব্রিকস—ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা; আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মেক্সিকো, সৌদি আরব, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই ১৯-টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলিয়ে 'গ্রুপ অফ টোয়েন্টি' বা জি-২০)। বিশ্বের তাবড় নেতারা পৌঁছান চিনে। এর একদিন আগে, অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনাম থেকে হানঝউ পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

৫ সেপ্টেম্বর চিনা প্রেসিডেন্ট চিনফিংয়ের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় বসে চিন-পাকিস্তান ইকনমিক করিডোর (সিপেক) নিয়ে নয়াদিল্লির উৎকণ্ঠার কথা চিনফিংয়ের কানে তোলেন মোদী। হানঝউয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গেও দেখা হয় মোদীর।

● **ক্ষমতাচ্যুত জিউমা হুসেফ :**

গত ৩১ আগস্ট ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ব্রাজিলের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট জিউমা হুসেফকে। ৬১ জন সেনেটর সায় দেন তাকে সরানোর পক্ষে। ২০ জন বিপক্ষে। অবসান হয় তার বামপন্থী ওয়ার্কার্স পার্টির ১৩ বছরের শাসনকালের। জিউমাকে সরাতে গত মে মাস থেকেই শুরু হয় ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া। ব্রাজিলে ভয়াবহ আর্থিক মন্দার পর ঘুষ কেলেঙ্কারির জেরে গত কয়েক মাস ধরে জিউমা সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল দেশ। দেশের সংবিধান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্টের ইমপিচমেন্টে সেনেট সায় দিলে তাকে সাসপেন্ড করা হয়। সেই মতো অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেন জিউমা সরকারের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্রাজিলিয়ান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট পার্টির নেতা মিশেল তেমের।

● **৫২ বছর পর গৃহযুদ্ধে বিরতি কলম্বিয়ায় :**

গত ২৯ আগস্ট কলম্বিয়ায় স্থানীয় সময় মাঝরাতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার কথা ঘোষণা করে দেশের বামপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'দ্য রেভোলিউশনারি আর্মড ফোর্সেস অফ কলম্বিয়া' (FARC বা ফার্ক)। দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে ২ অক্টোবর গণভোট হওয়ার কথা। প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়্যাল স্যান্টোসের তরফে যুদ্ধ বিরতি নির্দেশ আসার দিন চারেক পরেই এবার তাতে সায় দেন ফার্ক নেতা টিমোলিওন হিমেনেজ। টানা ৫২ বছরের গৃহযুদ্ধে ছেদ পড়ে।

১৯৬৪ সালে কলম্বিয়া সরকারে দ্বিচারিতা এবং বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্র তুলে নেয় সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র সংগঠন। প্রাথমিক পর্বে মূলত ছোট কৃষক এবং শ্রমজীবীরাই তিল-তিল করে গড়ে তোলে দেশের সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহী গোষ্ঠী—ফার্ক। ২০০২ সালে তাদের যোদ্ধার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় বিশ হাজারে। যার মধ্যে একটা বড়ো অংশ আসে শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেও। শান্তি ফেরানোর এই পর্ব শুরু হয় ২০১২ সালে। কিউবার রাজধানী হাভানায় চার বছর ধরে চলে ধারাবাহিক শান্তি-বৈঠক। সেই হাভানা থেকেই অস্ত্র তুলে নেওয়ার কথা অবশেষে ঘোষণা করল ফার্ক।

● **জিয়াউর রহমানের পদক ফেরৎ :**

বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে দেওয়া 'স্বাধীনতা পুরস্কার' ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতায় আসাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আর এটাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করছে মন্ত্রীসভা কমিটি। এর পরেই পুরস্কার

ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি প্রস্তাব হিসেবে পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সে দেশের জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ওই মেডেলটিকে সরিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানো হয়।

এক নজরে আন্তর্জাতিক মহলের আরও খবরাখবর

➢ **আসিয়ান গোষ্ঠীর বৈঠক :**

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের দু'দিনের মধ্যেই বসে আসিয়ান (ASEAN বা Association of Southeast Asian Nations) গোষ্ঠীর বৈঠক। ৬-৮ সেপ্টেম্বর, লাওসের রাজধানী ভিয়ান্তিয়ানে। ভারতের তরফে বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিয়ান্তিয়ানে আসিয়ান বৈঠকের ফাঁকে ৯ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গেও বৈঠক করেন মোদী। মাত্র দু'বছরের মধ্যে এই নিয়ে আট বার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন মোদী-ওবামা।

➢ **ভারত-মার্কিন সেনা ঘাঁটি ব্যবহার :**

পরস্পরের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করার চুক্তিতে ২৯ আগস্ট সিলমোহর দেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মনোহর পরীকর এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব অ্যাশটন কার্টার। বড়সড় সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় দুই বৃহৎ গণতন্ত্র, ভারত ও আমেরিকা। এই চুক্তির ফলে প্রয়োজন মতো আমেরিকা এবং ভারত পরস্পরের সামরিক ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করতে পারবে। অনেক সহজে যৌথ অভিযান চালাতে পারবে।

➢ **বিদেশমন্ত্রীর মায়ানমার সফর :**

গত ২৩ আগস্ট নেপিদউয়ে সু চি-সহ মায়ানমারের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। মায়ানমারে আউং সান সু চি-র প্রভাবাধীন নয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই প্রথম সে দেশে গেলেন ভারতের কোনও শীর্ষ নেতা। নয়া সরকারের স্টেট কাউন্সেলর ও বিদেশমন্ত্রী পদে রয়েছেন সু চি। তার সঙ্গে বৈঠক করেন সুষমা। কথা বলেন প্রেসিডেন্ট উ তিন কাউয়ের সঙ্গেও।

➢ **পার্লামেন্ট থেকেও ইস্তফা ক্যামেরনের :**

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য পদ থেকেও ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। জুন মাসে ব্রেক্সিট ভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন ব্রিটেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তার পরেই প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন ক্যামেরন। গত ১২ সেপ্টেম্বর উইটনি কেন্দ্রে লেবার পার্টির এমপি-র পদ থেকেও ইস্তফা দেওয়ার কথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর তরফে বলা হয়।

জাতীয়

● **সমালোচনা দেশদ্রোহিতা নয়, রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট :**

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগের বিষয়ে একটি অ-সরকারি সংস্থার তরফে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় শীর্ষ আদালত জানায়, সরকারের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করলেই তা রাষ্ট্রদ্রোহ নয়; কোনও বিষয় আদৌ রাষ্ট্রদ্রোহ কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের ১৯৬২ সালের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুযায়ী, কথায়, ইঙ্গিতে বা অন্যভাবে বৈধ সরকারের অবমাননা করতে চাইলে, ঘৃণা বা অসন্তোষ ছড়াতে চাইলে জরিমানা-সহ তিন বছর পর্যন্ত জেল বা যাবজ্জীবন হতে পারে। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনটি তৈরি হয় পরাধীন ভারতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, ১৯৬২ সালে কেদারনাথ সিংহ বনাম বিহার সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলে, হিংসা ছড়িয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হলে কিংবা সংবিধানের বাক্ স্বাধীনতার এক্তিয়ারের পরিধি লঙ্ঘন হলেই রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা যেতে পারে। সেই রায়কেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপক মিশ্র ও উদয় ইউ ললিতের বেঞ্চ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কথা স্মরণ করায়।

● **সর্বজনীন শিক্ষায় অর্ধশতক পিছিয়ে ভারত, ইউনেস্কোর রিপোর্ট :**

সম্প্রতি প্রকাশিত রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা, ইউনেস্কো (ইউনাইটেড নেশানস্ এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানিজেশান)-র 'গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং' (জিএএম)-এর নতুন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের যে সময়সীমা রাখা হয়েছে, তা পূরণ করতে অর্ধশতক পিছিয়ে রয়েছে ভারত। ভারতের মতোই শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ। সকলের জন্য প্রাথমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার লাগবে যথাক্রমে ২০৫১, ২০৬২ এবং ২০৮৭ সাল। ভারতের লাগবে যথাক্রমে ২০৫০, ২০৬০ ও ২০৮৫ সাল।

● **ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিচারে বিশ্বের সেরা দশে ভারত :**

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিচারে বিশ্বের সেরা ১০ সম্পদশালী দেশের তালিকায় সপ্তম স্থানে ভারত। নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ব্যক্তিগত মোট সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি ডলার (চলতি বছরের জুন মাসের পরিসংখ্যান)। তালিকার শীর্ষে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সে দেশে মোট ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ৪৮ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি ডলার। দ্বিতীয় স্থানে চিন (১৭ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি ডলার)। তার পরে জাপান (১৫ লক্ষ ১০ হাজার কোটি ডলার), ব্রিটেন (৯ লক্ষ ২০ হাজার কোটি ডলার), জার্মানি (৯ লক্ষ ১০ হাজার কোটি ডলার), ফ্রান্স (৬ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি ডলার)। ভারতের পরে রয়েছে কানাডা (৪ লক্ষ ৭০ হাজার), অস্ট্রেলিয়া (৪ লক্ষ ৫০ হাজার) এবং ইতালি (৪ লক্ষ ৪০ হাজার)-র নাম। উল্লেখ্য, এই রিপোর্টে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে স্থাবর সম্পত্তি, নগদ অর্থ, ইক্যুইটি এবং বিনিয়োগকে ধরা হয়েছে। ঋণকে জোড়া হয়নি।

● **জল ধরতে মাইথনে গভীরতা বাড়ছে :**

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি), চারপাশের পাড় উঁচু করে মাইথন জলাধারের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এখন মাইথন জলাধারের গভীরতা ৪৯৫ ফুট। তা আরও পাঁচ ফুট বাড়ালেই অতিরিক্ত এক লক্ষ ২০ হাজার একর ফুট জল ধরে রাখা যাবে। সম্ভাব্যতা-সমীক্ষা করতে কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সেন্ট্রাল

ওয়াটার কমিশন বা সিডব্লিউসি) ইতোমধ্যে কাজে নেমে পড়েছে। একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ডের বলপাহাড়িতে নতুন একটি জলাধার নির্মাণের পরিকল্পনাও করেছে ডিভিসি। প্রস্তাবিত জলাধারের ডিপিআর বা সবিস্তার প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। দুই সরকারই রিপোর্ট খতিয়ে দেখছে।

● **'পকসো ই-বাটন' পরিষেবা :**

অনলাইনে যৌন হয়রানির অভিযোগ দ্রুত নথিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে সম্প্রতি চালু করা হয় 'পকসো ই-বাটন' পরিষেবা। এই পদ্ধতিতে 'ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস'-এর ওয়েবসাইটে গিয়ে 'পকসো ই-বাটন' ক্লিক করতে হয়। এরপর ফর্ম পূরণ করে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে 'সাবমিট' বা জমা করতে হয়। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর ২০১২ সালে ১৮ বছরের কম বয়সীদের উপরে যৌন হয়রানি আটকাতে 'প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস' (পকসো) আইন আনে। অভিযোগের দ্রুত তদন্ত করে বিশেষ আদালতের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করে এই আইন।

● **২৪ ঘণ্টার মধ্যে এফআইআর ওয়েবসাইটে :**

গত ৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এফআইআর করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা ওয়েবসাইটে আপলোড করার নির্দেশ দেয়। ১৫ নভেম্বরের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর করতে হবে সব রাজ্যকে। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বিচারপতি দীপক মিশ্র ও সি নাগাপ্পনের বেঞ্চ একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে এই রায় দেয়। তবে যে সব রাজ্যে ইন্টারনেট সংযোগের মান ততটা উন্নত নয়, তাদের ক্ষেত্রে সময়সীমা বাড়িয়ে ৭২ ঘণ্টা করা হয়েছে। জঙ্গি উপদ্রব এবং মহিলা ও শিশুদের উপর যৌন অত্যাচারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলির অভিযোগ ওয়েবসাইটে আপলোড করার নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছে।

● **একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে মতামত চাইল কেন্দ্র :**

একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন করানোর বিষয়ে সাংসদ, বিধায়ক, আমলা, বিশেষজ্ঞ এবং আম নাগরিকদের কাছে মতামত চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি পোর্টাল mygov.in-এ এই নিয়ে সকলেই নিজের মতামত জানানোর সুযোগ পাবেন। একবার ঐকমত্য হলে সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করতে হবে।

২০১৮ সালে ১৩-টি রাজ্যে ভোট। পরের লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ সালে। সে বছরই ৯-টি রাজ্যে বিধানসভা ভোট আছে। আবার সামনের বছরই আরও পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তাই একসঙ্গে ভোট করতে হলে কোনও বিধানসভার মেয়াদ কমাতে হবে, কোনওটার বাড়াতে হবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন একই সঙ্গে হয়েছে। কিন্তু তারপরে আর তাল রাখা যায়নি। ১৯৯৯ সালে আইন কমিশনও একসঙ্গে ভোটের পক্ষে সওয়াল করে। সম্প্রতি সংসদের স্থায়ী কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখে। ফি-বছর কোনও না কোনও ভোটের ধাক্কা এড়ানো গেলে খরচ অনেক কমে যাবে। আর আদর্শ আচরণ বিধির ধাক্কায় আটকে থাকবে না জনমুখী প্রকল্পের রূপায়ণ।

● **ত্রিপুরায় বিরোধী দল নয় তৃণমূল কংগ্রেস :**

গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভার 'নিজস্ব' নিয়ম মেনে ত্রিপুরা বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে বিরোধী দলের মর্যাদা দিলেন না স্পিকার রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। সাধারণভাবে লোকসভা, রাজ্যসভা বা বিধানসভাগুলিতে মোট সদস্য সংখ্যার এক-দশমাংশ সদস্য কোনও দলের থাকলেই সেই দলকে বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট দলের সংসদীয় বা পরিষদীয় নেতা পান বিরোধী দলনেতার মর্যাদা। ত্রিপুরা ছোটো রাজ্য। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা মাত্র ৬০। সেই কারণেই কোরামের ক্ষেত্রে এখানে আলাদা নিয়ম প্রযোজ্য। অন্তত ১০ জন সদস্য না থাকলে ত্রিপুরা বিধানসভায় কোরাম হয় না। তৃণমূলের রয়েছে মোট ছ'জন সদস্য। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের পরিষদীয় নেতাও পাচ্ছেন না বিরোধী দলনেতার মর্যাদা।

● **অসত্য বিজ্ঞাপনের দায় তারকাদেরও :**

গত বছরই সংসদে উপভোক্তা নিরাপত্তা বিল এনেছে সরকার। তার সূত্রে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সুপারিশ করে, যে সেলিব্রিটিরা যে বিজ্ঞাপন করছেন, সেই পণ্য বা পরিষেবায় কোনও গলদ দেখা গেলে, তার দায় বর্তাবে ওই তারকাদের উপরেও। প্রথমবার অপরাধ করলে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা কিংবা দু'বছরের কারাবাস কিংবা দু'টোই হতে পারে। দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে এই পরিমাণ বেড়ে হবে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা ও পাঁচ বছরের জেল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার আগে এর সব দিক খতিয়ে দেখার জন্য অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। মন্ত্রীগোষ্ঠীতে রয়েছেন আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, উপভোক্তামন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নড্ডা, বিদ্যুৎমন্ত্রী পীযূষ গয়াল, পরিবহণমন্ত্রী নিতিন গডকড়ী, বাণিজ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই মন্ত্রীগোষ্ঠী নতুন আইনের সব দিক খতিয়ে দেখার পর বিলটি মন্ত্রীসভায় পাঠানো হবে অনুমোদনের জন্য। তারপর সংসদের আসন্ন অধিবেশনে পাস করানো হবে।

● **ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিয়ে তথ্য মিলবে না সার্চ ইঞ্জিন-এ :**

গত ১৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিকা জারি করে যে আগত সন্তান ছেলে না মেয়ে তা জানতে কোনও রকম তথ্য/বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না অনলাইনে। এবার থেকে এ বিষয়ে কোনও তথ্য বা বিজ্ঞাপন দেখাবে না কোনও সার্চ ইঞ্জিন। কন্যাভ্রূণ হত্যা রুখতে ১৯৯৪ সাল থেকে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা আইনত নিষিদ্ধ হয় এবং ২০০৩ সালেই সেই আইন সংশোধন করে আরও কড়া হয় কেন্দ্র। কিন্তু, অনলাইনের এ নিয়ে সহজেই তথ্য পাওয়া যায়। এমনকী, বিষয়টি নিয়ে ইন্টারনেটে রমরমিয়ে চলছে বিজ্ঞাপনী প্রচারও। এক চিকিৎসকের একটি আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশিকা জারি করে। এরপরই শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ওই সার্চ ইঞ্জিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন সরকারি আধিকারিকেরা। এ নিয়ে তথ্য ব্লক করতে রাজি হন তারা।

এক নজরে জাতীয় স্তরের আরও খবরাখবর

➢ **ভারত সফরে প্রচণ্ড :**

সম্প্রতি চার দিনের ভারত সফরে এসে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল (প্রচণ্ড)। গত ১৭ সেপ্টেম্বর বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ ভারতীয় শীর্ষ নেতৃত্বর সঙ্গে। সে দেশের রাস্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামো প্রকল্প গঠনে তিনটি চুক্তি সইয়ের পাশাপাশি নেপালকে ৭৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, প্রতিবেশী কূটনীতিতে প্রথম থেকেই নেপালকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন মোদী। তার প্রথম বিদেশ সফরের গন্তব্য ছিল কাঠমাণ্ডু।

➢ **আরএসএস-এর স্বয়ংসেবকদের নতুন পোশাক :**

বিজয়া দশমীতেই নতুন পোশাকে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সদস্যদের। এবার নাগপুরে সংঘের সদর দপ্তরে সংগঠনের স্বয়ংসেবকদের জন্য পৌঁছে যায় দশ হাজার ফুল প্যান্ট-সহ নতুন ইউনিফর্ম। আর হাফ প্যান্ট নয়, বরং খাকি ফুল প্যান্টের সঙ্গে থাকবে সাদা শার্ট, কালো টুপি, কালো জুতো ও চামড়ার কালো বেল্ট। স্বয়ংসেবকরা হাতে রাখবেন বাঁশের লাঠি।

➢ **২৭ বছর ধরে কোটায় ১৪৪ ধারা জারি :**

গত ২৭ বছর ধরে কোনও সভা বা জমায়েত নিষিদ্ধ রাজস্থানের কোটার বাজাজ খানা, ঘণ্টা ঘর, তিপ্তার মতো এলাকাগুলিতে। কারণ, দু'দশকের বেশি সময় ধরে সেখানে জারি ১৪৪ ধারা। একসঙ্গে চার জনের বেশি লোক জমা হওয়া নিষিদ্ধ। আর এর ফল ভুগছেন শহরের প্রায় দু'কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বাসরত এক লক্ষের বেশি বাসিন্দা। যাদের বেশিরভাগই সংখ্যালঘু। ১৯৮৯ সালের গোষ্ঠীসংঘর্ষের জেরে সেখানে জারি হয়েছিল কার্ফু। কার্ফু ওঠার পর সেই যে ১৪৪ ধারা জারি হয়, তা ওঠেনি এত বছরেও।

➢ **অরুণাচলপ্রদেশের রাজ্যপাল বরখাস্ত :**

বরখাস্ত করা হল অরুণাচলপ্রদেশের রাজ্যপাল জে পি রাজখোয়াকে। অরুণাচলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েন তিনি। পরে সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। কোর্টের সমালোচনার পরেও স্বেচ্ছায় ইস্তফা দেবেন না বলে জানিয়ে দেন রাজখোয়া। সেপ্টেম্বরে রাজখোয়াকে পদ থেকে সরিয়ে দেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। অস্থায়ীভাবে রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মেঘালয়ের রাজ্যপালকে। এর আগে মিজোরামের দু'জন রাজ্যপাল, আজিজ কুরেশি ও কমলা বেনিওয়ালকেও বরখাস্ত করা হয়।

➢ **রিপোর্ট পেশ ধিংরা কমিশনের :**

গত বছর মে মাসে হরিয়ানা সরকার জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনের প্রধান, বিচারপতি এসএন ধিংরা ৩১ আগস্ট ১৮২ পাতার রিপোর্ট পেশ করেন। শিখোপুর, সিকান্দরপুর, বদাহ ও খেরকি ধৌলা—গুরগাঁওয়ের এই চারটি গ্রামে Change of Land Use (CLU) লাইসেন্স অনুমোদন করার ক্ষেত্রে কোনওরকম দুর্নীতি হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখে এই কমিশান।

➢ **ট্রেনযাত্রায় সমস্যা সমাধানে নয়া নম্বর :**

ট্রেন সফরে নিরাপত্তা থেকে শুরু করে যে-কোনও অভিযোগ জানাতে নিজের মোবাইল থেকে ১৩৮ নম্বরে একটি ফোন করলেই রেলকর্মীরা হাজির হয়ে যাবেন ভুক্তভোগী যাত্রীর কাছে। আপাতত রাজধানী, দুরন্ত ও শতাব্দী এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনে এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করছে রেল। যাত্রীরা মোবাইল থেকে ১৩৮ নম্বরে এসএমএস বা ফোন করলেই সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রোলের মাধ্যমে যাত্রীর নম্বরটি বা এসএমএস-এর বক্তব্য পৌঁছে যাবে ট্রেনে উপস্থিত রেলকর্মীর কাছে থাকা ট্যাবলেট-এ।

পশ্চিমবঙ্গ

● **সিঙ্গুর অধিগ্রহণ অবৈধ, রায় সুপ্রিম কোর্টের :**

দীর্ঘ ১০ বছর পর সিঙ্গুর মামলার নিষ্পত্তি হল। গত ৩১ আগস্ট সিঙ্গুর মামলার রায় ঘোষণা করে দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দেয়, ২০০৬ সালের জমি অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ অবৈধ। বিচারপতি গোপাল গৌড়া এবং বিচারপতি অরুণ মিশ্রের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ১২ সপ্তাহের মধ্যে কৃষকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে অধিগৃহীত জমি। ২০০৬ সালে টাটা গোষ্ঠীর ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানা গড়তে সিঙ্গুরে প্রায় এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করে তদানীন্তন রাজ্য সরকার। কৃষকের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে রাজ্যে পালা বদলের পর সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আইন পাস হয় রাজ্য বিধানসভায়। কিন্তু সে আইনকে কলকাতা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানায় টাটাগোষ্ঠী। মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্ট মত প্রকাশ করে যে সে সময় দেশে যে জমি আইন কার্যকর ছিল, রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণের সময় সেই আইন মানেনি। এই রায়ে আরও বলা হয় যে যারা ক্ষতিপূরণ নিয়েছিলেন তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ ফেরত নেওয়া হবে না। আর, যারা ক্ষতিপূরণ নেননি, তারা যেহেতু ১০ বছর নিজেদের জমি ব্যবহার করতে পারেননি—অর্থাৎ, তারা জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং ক্ষতিপূরণও পাননি—তাই তাদের বর্তমান বাজার দরে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

● **'উজালা' প্রকল্প রূপায়ণে সায় রাজ্যের :**

অবশেষে গোটা দেশে সস্তায় 'এলইডি' আলো লাগানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের 'উজালা' প্রকল্পে সায় দিল পশ্চিমবঙ্গ। ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে বিষাক্ত গ্যাসের নিঃসরণ (এমিশন) ৩৩-৩৫ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবিলম্বে দেশে ৭৭ কোটি বাল্বকে এলইডি-তে বদলে ফেলার নির্দেশ দেন। সব কিছু ঠিকঠাক চললে, এই বাল্ব বদলের সুবাদে ২০১৯ সালের মার্চের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে। গ্রামীণ এলাকায় গরিবদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে এই প্রকল্প সহায়ক হবে।

এর জন্য রাজ্যকে নিজের ভাঁড়ার থেকে একটিও পয়সা দিতে হবে না। এই বাল্ব লাগিয়ে যে সাশ্রয় হবে, সেটাই নেওয়া হবে থোকে বা কিস্তিতে। হিসেব কষে দেখা গিয়েছে, প্রতি এলইডি বাল্ব থেকে গ্রাহকের প্রতি বছরে বিদ্যুতের বিল ১৬০-৪০০ টাকা কম হবে। বাল্বের দাম বাজার দরের থেকে ঢের সস্তা। বাজারে যে বাল্বের দাম ৩৫০-৪৫০ টাকা, সেটি ৭৫-৯৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার টিউবলাইটও দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে। সেটির বাজার দর ৬০০ টাকার মতো হলেও পাওয়া যাবে ২৩০ টাকার মধ্যে। এই প্রকল্পের আওতায় দেওয়া বাল্ব তিন বছরের মধ্যে খারাপ হলে বিনামূল্যে বদলেও দেওয়া হবে।

● **'জাতীয় দল' হল তৃণমূল কংগ্রেস :**

গত ২ সেপ্টেম্বর তৃণমূল কংগ্রেসকে জাতীয় দলের স্বীকৃতি দিল নির্বাচন কমিশন। জাতীয় দল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের যে শর্তগুলি থাকে, তার একটি পূরণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কোনও দলকে জাতীয় দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে ১৯৬৮ সালের নির্বাচনী চিহ্ন নির্দেশে উল্লিখিত শর্ত পূরণ করতে হয়। এটি হল, অন্তত চার রাজ্যে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের মর্যাদা পেতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও মণিপুর, ত্রিপুরা এবং অরুণাচলপ্রদেশেও তৃণমূল স্বীকৃত দলের মর্যাদা পেয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে বর্তমানে দেশে জাতীয় দলের সংখ্যা ৭। এই তালিকায় বাকি দলগুলি হল কংগ্রেস, বিজেপি, বিএসপি, সিপিআই, সিপিএম এবং এনসিপি। জাতীয় দলের মর্যাদাপ্রাপ্ত দলের কয়েকটি সুবিধা—প্রথমত, কোনও জাতীয় দলের চিহ্ন দেশের অন্য কোনও প্রান্তে অন্য দল ব্যবহার করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, দলীয় দপ্তর তৈরির জন্য সরকারের থেকে জমি বা বাড়ি পেয়ে থাকে জাতীয় দলগুলি। তৃতীয়ত, নির্বাচনের সময় জাতীয় দল সর্বাধিক ৪০ জন তারকাকে প্রচারের কাজে লাগাতে পারবে, যেখানে অন্য দলের ক্ষেত্রে সেই সীমা ২০।

● **পোলট্রি নিগম-এর ৩.৮৫ কোটি টাকা লাভ :**

২০১৫-'১৬ আর্থিক বছরে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনস্থ সংস্থা 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি অ্যান্ড ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' বা পোলট্রি নিগম লাভ করেছে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। ১৯৬৯ সালে যাত্রা শুরু। গোড়ায় লাভ হলেও দীর্ঘকাল ধরেই লোকসানে চলায় নিগম বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। কিন্তু পরে ফের একবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টার ফলস্বরূপ ২০১১-'১২-তেই লাভের মুখ দেখতে শুরু করে নিগম।

প্রসঙ্গত, বেসরকারি সংস্থা প্রাইসওয়াটার হাউস কুপার্সকে পুনরুজ্জীবনের নক্শা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো প্রশাসনিক খরচ কমানোর উদ্যোগ শুরু হয়। পাশাপাশি চলতে থাকে মাছ ও পশুখাদ্য নতুন বাজার ধরা। নিগমের আটটি কারখানা রয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এসবের পরিণতিতে ২০১৩-'১৪ সালে নিজের খরচ মিটিয়ে সংস্থার নিট লাভ হয় ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। পরের বছর ৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। আর ২০১৫-'১৬ আর্থিক বছরে ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা।

● **বানতলায় জুতো পার্ক গড়তে কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি :**

বানতলা চর্মনগরীর জুতো পার্ক গড়তে রাজ্যকে ৪৫০ কোটি টাকার লগ্নি জোগানোর প্রতিশ্রুতি দিল বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন শিল্প নীতি ও উন্নয়ন দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রোমোশন)। এর মধ্যে ২৫০ কোটি দেবে দেশি সংস্থাগুলি। আর বাকি ২০০ কোটি টাকা (১ ডলার ৬৭ টাকা ধরে ৩ কোটি ডলার) আসবে বিদেশি বিনিয়োগের হাত ধরে। তবে তার জন্য রাজ্যের কাছে প্রস্তাবিত প্রকল্পের রূপরেখা (কনসেপ্ট নোট) চেয়েছে কেন্দ্র। ইতোমধ্যেই সেই রূপরেখাও তৈরি। প্রথম দফায় ১১০ একরে যে জুতো পার্ক তৈরি হবে, সেখানে এই লগ্নি শেষমেশ হলে, কাজের সুযোগ পাবেন ৫ হাজার মানুষ। ৪,০০০ কোটি পর্যন্ত হতে পারে দেশে ব্যবসার অঙ্ক। রপ্তানি পৌঁছবে প্রায় হাজার কোটি টাকায়। এরপর দ্বিতীয় দফায় ১৩০ একরে জুতোর পাশাপাশি অন্যান্য চর্মপণ্যেরও পার্ক গড়া হলে, এই সমস্ত সংখ্যা আরও অনেকটা বাড়ার কথা। সব মিলিয়ে সম্ভাব্য লগ্নি হাজার কোটি টাকা। ২০০৮ সালে দানা বাঁধে জুতো পার্ক তৈরির পরিকল্পনা। ২৭ লক্ষ টাকা 'কশন মানি' জমা দেয় ৩৪-টি সংস্থা।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির অন্তর্গত চর্মশিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের (ইন্ডিয়ান লেদার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা আইএলডিপি) দায়িত্বে রয়েছে ডিআইপিপি। পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত জুতো পার্ক প্রকল্পকেও ওই কর্মসূচির আওতায় আনতে চায় কেন্দ্র। ২০১৬-'১৭ সালের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে আইএলডিপি বাবদ ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা আছে। এই তহবিল থেকেই রাজ্যের জুতো পার্কের জন্য টাকা বরাদ্দ হওয়ার কথা।

● **পর্যটন শিল্পে অগ্রগতি :**

সম্প্রতি প্রকাশিত কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, গত বছর দেশীয় পর্যটকের সংখ্যার বিচারে তামিলনাড়ু প্রথম, আর এ রাজ্য ছিল অষ্টম স্থানে। তালিকায় এই জায়গাটি দখল করতে রাজস্থান ও গুজরাতকেও পিছনে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৫ সালে বাংলায় আসা ভিন্ রাজ্যের পর্যটকের সংখ্যা ৭০ লক্ষের বেশি। আর ওই দুই রাজ্যে গিয়েছেন এর প্রায় অর্ধেক পর্যটক। আর কেন্দ্রের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৫ সালে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ পাঁচ নম্বরে। ছয়ে রাজস্থান, সাতে কেরল। কর্ণাটক ও গোয়ার স্থান যথাক্রমে নয় ও দশে। এ ক্ষেত্রেও প্রথম স্থান ধরে রেখেছে তামিলনাড়ুই। তারপরে ক্রম অনুযায়ী মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লি। গত বছর পশ্চিমবঙ্গে বেড়াতে এসেছেন প্রায় ১৫ লক্ষ বিদেশি। 'এক্সপিরিয়েন্স বেঙ্গল—দ্য সুইটেস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া'—পর্যটক টানতে এটাই রাজ্যের ট্যাগ লাইন।

● **পূর্ব ভারতের প্রথম পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র :**

গত ৫ সেপ্টেম্বর কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন 'ইন্ডিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন'-এর চেয়ারম্যান শেখর বসু। 'ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার' (বার্ক)-এর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিসিকেভি) তাদের ক্যাম্পাসে তৈরি করছে আঞ্চলিক পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র। যা কি না পূর্ব ভারতে এই প্রথম।

ফসলকে সারা বছর সতেজ রাখতে শুধুমাত্র হিমঘরে রাখলেই চলে না। সেখান থেকে বের করে বাজারে নিয়ে যাওয়ার পথেই দিন

তিনেকের মধ্যে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণে পচে যেতে পারে ফসল। এর থেকে বাঁচাতে দরকার 'গামা রশ্মি'। হিমঘরে রাখার আগে ফসলকে 'গামা সেন্টার'-এ রেখে জীবাণু মুক্ত করে নিলে হিমঘর থেকে বের করলেও পচন ধরার কোনও আশঙ্কা থাকে না। আর এভাবেই নাসিকের পেঁয়াজের দেশ জয়। এমনকী, গামা রশ্মির প্রয়োগে ফল-সব্জি দ্রুত পাকে না। অঙ্কুর গজিয়ে নষ্টও হয় না তাড়াতাড়ি।

● **মানব পাচারে রাজ্য দু' নম্বরে :**

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো বা এনসিআরবি-র ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা দেশের মধ্যে মানব পাচারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাচার করে ভিন্ রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ১,২৫৫ জনকে। এক নম্বরে অসম। গত বছরে সেই রাজ্য থেকে পাচার হয়েছে ১,৪৯৪ জন। এনসিআরবি-র দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৫ সালে সারা দেশে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে মোট ৬৮৭৭-টি মানব পাচারের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়। এই সংখ্যার প্রায় ১৮.২ শতাংশ অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ থেকেই। পড়শি রাজ্য অসমের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ২১.৭ শতাংশ। মানব পাচারের মধ্যে সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে নারী ও শিশু পাচার। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাচার হওয়া ১২৫৫ জনের মধ্যে অধিকাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরী। মূলত আন্তঃরাজ্য চক্রের পাচারকারীরা এদের অন্য রাজ্যে পাচার করে দেয় দালালের মাধ্যমে। রাজ্য থেকে পাচার হওয়া কিশোরীরা সব থেকে বেশি ঠাঁই পায় উত্তর ভারতে, জানা গিয়েছে এনসিআরবি সূত্রে।

● **সাক্ষরতায় পিছিয়ে বাংলা, বলছে রাজ্যের রিপোর্ট :**

২০১১ সালের হিসেবে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কেমন, তা নিয়ে গত ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তীতে একটি বই প্রকাশ করে রাজ্য সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর। সেই বইয়েরই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ২৭ শতাংশ মানুষ এখনও নিরক্ষর। কেরালা, দিল্লি, ত্রিপুরা, মিজোরাম, সিকিম, হিমাচলপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র, চণ্ডীগড়ের মতো রাজ্যগুলিতে যেখানে সাক্ষরতার হার ৮০-৯০ শতাংশেরও বেশি, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে মাত্রই ৭৩.২৭ শতাংশ। তামিলনাড়ু, গুজরাট, এমনকি নাগাল্যান্ডের সাক্ষরতার হারও পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বেশি। পিছনে যদিও হরিয়ানা, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, রাজস্থান, অসম, বিহার-সহ বেশ কিছু রাজ্য।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে 'রাজ্য সাক্ষরতা মিশন' প্রকল্প চালু হয় ২০১০ সালে। ২০০১ সালের জনগণনায় রাজ্যের যে, ন'টি জেলায় নারী শিক্ষার হার ছিল ৫০ শতাংশ বা তারও কম। সেগুলি হল, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া। সাক্ষরতা মিশন প্রকল্পে এই জেলাগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যের মানুষদের অক্ষর পরিচিতি ঘটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের তথ্য বলছে, ২০১৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ওই প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষ সাক্ষর হয়েছেন। রাজ্যের জেলাগুলির মধ্যে সাত বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে সাক্ষরতার হারে সবার উপরে আছে পূর্ব মেদিনীপুর (৮৭.০২ শতাংশ), কলকাতা (৮৬.৩১ শতাংশ), উত্তর ২৪ পরগণা (৮৪.০৬ শতাংশ), হাওড়া (৮৩.৩১ শতাংশ), হুগলি (৮১.৮০ শতাংশ)। আর তালিকার নিচের দিকের নামগুলি হল উত্তর দিনাজপুর (৫৯.০৭ শতাংশ), মালদহ (৬১.৭৩ শতাংশ), পুরুলিয়া (৬৪.৪৮ শতাংশ), মুর্শিদাবাদ (৬৬.৫৯ শতাংশ)। যদিও এই হিসেবও ২০১১ সালের নিরিখে।

● **কলকাতা মেট্রোয় সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু :**

কলকাতা মেট্রোর কবি সুভাষ ও মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন দু'টি গ্রিন স্টেশন হিসেবে চিহ্নিত হল। গত ৯ সেপ্টেম্বর রেল প্রতিমন্ত্রী রাজেন্দ্র গোহাইঁ ওই দুই স্টেশনের সৌর বিদ্যুতের প্যানেলগুলি উদ্বোধন করেন। সেই দিন থেকেই মেট্রো কর্তৃপক্ষ ওই দুই স্টেশনে তৃতীয় লাইনের বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া বাকি সব কাজ করছেন নিজেদের তৈরি সৌর বিদ্যুৎ দিয়েই। দিনে .০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করে ব্যবহার করার জন্য বছরে বিদ্যুৎ বিল বাবদ মেট্রোর খরচ বাঁচবে ৫০ লক্ষ টাকা। আর উৎপাদিত সৌর বিদ্যুতের পরিমাণ খুব একটা বেশি না হলেও শুধুমাত্র তা তৈরির কারণেই রোজ বাতাসে ৬৮৬ মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড কম ঢুকবে।

শুধু ওই দুই স্টেশনই নয়, সৌর বিদ্যুতের প্যানেল বসানো হয়েছে নোয়াপাড়া স্টেশনেও। সেখানে তৈরি হচ্ছে .০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। আর কবি সুভাষ ও মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনে তৈরি হচ্ছে যথাক্রমে .০৫ এবং .০৪ মেগাওয়াট। তিনটি স্টেশন মিলিয়ে তৈরি হওয়া মোট বিদ্যুৎ মেট্রো কর্তৃপক্ষ এখন নিয়মিত পাঠায় মূল গ্রিডে।

● **শ্রীরামপুরের গির্জার জন্য ইউনেস্কোর সম্মান :**

ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক স্থাপত্য সংরক্ষণের জন্য এই বছর 'ইউনেস্কো এশিয়া-প্যাসিফিক পুরস্কার' পাচ্ছে বিভিন্ন দেশের মোট ১৩-টি স্থাপত্য। ভারতের ৪-টি স্থাপত্য এই সম্মান পাচ্ছে। তার মধ্যেই রয়েছে একদা 'বিপজ্জনক' ঘোষিত হওয়া শ্রীরামপুরের সেন্ট ওলাভ গির্জা। ইউনেস্কোর লক্ষ্য, এই পুরস্কারের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় অনাদরে পড়ে থাকা জীর্ণ স্থাপত্যকে সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিকে উৎসাহিত করা।

আঠারো শতকের বেশিরভাগ সময়ে শ্রীরামপুরে ছিল ডেনমার্কের উপনিবেশ। গভর্নর ওলি বি'-র সময়ে প্রোটেস্ট্যান্ট নাগরিকদের জন্য ১৮০০ সাল নাগাদ এই গির্জার কাজ শুরু হয়। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষ গির্জাটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পান। ২০১০ সাল পর্যন্ত শ্রীরামপুর কলেজের ধর্মসভা, সাপ্তাহিক উপাসনার স্থান ছিল এই গির্জা। ২০১১ সালে গির্জাটিকে 'বিপজ্জনক' ঘোষণা করে কলেজ। সেটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০১৩ সালে ডেনমার্কের জাতীয় মিউজিয়ামের আর্থিক সাহায্যে এই গির্জা সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

এক নজরে রাজ্যের আরও খবরাখবর

➢ **পশ্চিমবঙ্গ-এর নতুন নাম 'বাংলা' :**

রাজ্যের নাম বদলের বিল বিধানসভায় পাস হয় ২৯ আগস্ট। পশ্চিমবঙ্গ নয়, এবার নতুন নাম 'বাংলা' বা Bengal। নতুন নামের প্রস্তাব দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য।

➢ **বিদ্যুতের মিটার রিডিংয়ে অ্যান্ড্রয়েড ফোন :**

মিটার রিডিংয়ের জন্য এবার নতুন প্রযুক্তির দ্বারস্থ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের সাহায্যে মিটার দেখে নিখুঁত হিসেব কষা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মিটার রিডিংয়ের দায়িত্বে থাকা এজেন্সির লোকজনের হাতে থাকবে বিশেষভাবে তৈরি অ্যান্ড্রয়েড ফোন—তাতে শুধু ছবিই তোলা যাবে। গ্রাহকের বাড়িতে গিয়ে সেই অ্যান্ড্রয়েত ফোনে তার মিটারের ছবি তুলে মেন সার্ভারে পাঠিয়ে দেবেন এজেন্সির লোকেরা। অর্থাৎ এটাও এক রকম 'স্পট রিডিং'-ই। ওই সব অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস প্রযুক্তিও থাকবে। জিপিএস থাকলে কোন কর্মী কবে, কোথায়, কখন, কার, মিটারের ছবি নিচ্ছেন, সব তথ্যই থাকবে বিদ্যুৎকর্তাদের হাতের মুঠোয়। মিটার নম্বর, কনজিউমার নম্বর এবং গ্রাহক কত বিদ্যুৎ খরচ করেছেন—সব তথ্য ধরা থাকবে ওই ছবিতেই। তার ভিত্তিতেই তৈরি হবে গ্রাহকের বিল।

➢ **স্বচ্ছ দশে বাংলার তিন জেলা :**

দেশে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে গ্রামীণ এলাকার পরিচ্ছন্নতায় প্রথম দশটি জেলার মধ্যে স্থান পেল পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা। প্রথম মহারাষ্ট্রের সিন্ধুদুর্গ। আর তারপরই নদিয়ার স্থান। পূর্ব মেদিনীপুর ও হুগলি যথাক্রমে চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্থানে। চতুর্দশ স্থানে উত্তর ২৪ পরগণা। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে গান্ধী জয়ন্তীর দিনে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা হয়। গত দু'বছরে কোথায় কেমন কাজ হচ্ছে, তা বুঝতে বিভিন্ন অঞ্চলে সমীক্ষা চালায় কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও নিকাশি মন্ত্রক। প্রাথমিকভাবে সমতলের ৫৩-টি জেলা ও পাহাড়ের ২২-টি জেলাকে বেছে নেওয়া হয় সমীক্ষার জন্য। সমতলের জেলার সেরার তালিকাতেই স্থান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এই সব জেলা।

➢ **বড়োজোড়ায় প্লাস্টিক পার্ক প্রকল্পে কেন্দ্রের নীতিগত সায় :**

বাঁকুড়ার বড়োজোড়ায় রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম প্রস্তাবিত প্লাস্টিক পার্ক প্রকল্পে নীতিগত সায় দিল কেন্দ্র। চূড়ান্ত ছাড়পত্র পেতে নিগমকে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) পাঠাতে হবে কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের কাছে। পার্কটির পরিকাঠামো উন্নয়নে ২৫ কোটি টাকা খরচ হবে, যার অর্ধেক দেবে কেন্দ্র। মূলত প্লাস্টিকের অনুসারী শিল্পই গড়ে উঠবে সেখানে। মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অসম ও তামিলনাড়ুতেও ৪-টি প্লাস্টিক পার্কের কাজ চলছে। তৈরি হওয়ার কথা আরও ছ'টি। এ রাজ্যের প্রস্তাবিত প্রকল্প সেই তালিকাতেই আছে।

অর্থনীতি

● **কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ গড়তে সায় :**

গত ৮ সেপ্টেম্বর পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল অনুমোদন করেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তার চার দিন বাদেই ১৩ সেপ্টেম্বর পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদ (জিএসটি কাউন্সিল) গড়ায় সিলমোহর দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। সংশোধনী অনুযায়ী, পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ এ বছর ১১ নভেম্বরের মধ্যে জিএসটি কাউন্সিল গঠন করার কথা। তবে ইতোমধ্যেই সেপ্টেম্বর মাসের ২২ ও ২৩ তারিখে পরিষদের প্রথম বৈঠক ডাকা হয়। লক্ষ্য, সামনের বছর পয়লা এপ্রিল থেকে দেশ জুড়ে জিএসটি চালু করা। প্রসঙ্গত, এই পরিষদ শুধু করের হার নয়, কোথায় কত ছাড় দেওয়া হবে, সর্বোচ্চ সীমা কী হবে, সেগুলিও নির্ধারণ করবে। পরিষদের পাশাপাশি জিএসটি সচিবালয় গঠন করা হয়েছে, যারা এটি রূপায়ণ করবে। পরিষদের সচিব হবেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব সচিব।

সংসদের গত অধিবেশনে জিএসটি-র সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করানোর পরে কেন্দ্রের কাছে এখন সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ এই করের হার নির্ধারণ। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত এই পরিষদই কাজটি করবে। যেখানে কেন্দ্রের থাকবে এক-তৃতীয়াংশ ভোট। আর সব রাজ্য মিলিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিকার। কোনও প্রস্তাব পাস করাতে চার ভাগের তিন ভাগ ভোট লাগবে।

উল্লেখ্য, পয়লা সেপ্টেম্বর দেশের ১৬তম রাজ্য হিসেবে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করে ওড়িশা বিধানসভা। এর আগে আরও ১৫-টি রাজ্য এই বিলে অনুমোদন দেয়। ভারতের মোট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫০ শতাংশ এই বিলে সায় দেওয়ার পর বিলটি অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়। সময়ের আগেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজ্যের সায় মিলেছে বিলটিতে। সংসদে গত ৮ আগস্ট বিলটি পাস হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ৫০ শতাংশ রাজ্যের সায় পাওয়ার সময়সীমা স্থির করে রেখেছিল কেন্দ্র। সেটা ২৩ দিনে সম্ভব হল। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এখনও এই বিল পাস করেনি। ফলে এ রাজ্যকে ছাড়াই সংবিধান সংশোধন হতে চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমানে পরোক্ষ কর ব্যবস্থার নজরদারির দায়িত্বে আছে 'কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও আমদানি শুল্ক পর্ষদ' বা 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমস' (সিবিইসি)। পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি চালু হলে নাম বদলে তা পরিচিত হবে 'কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর পর্ষদ বা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স' (সিবিআইটি) হিসেবে। জিএসটি কাউন্সিলের স্থির করা নিয়ম-কানুন রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবে সিবিআইটি। নেতৃত্বে থাকবেন সচিব স্তরের একজন অফিসার। মোট ছ'জন সদস্য থাকবেন সিবিআইটি-তে। জিএসটি সঠিক হারে নেওয়া হচ্ছে কি না, আইনি জটিলতা ও মামলার সমাধান বাতলানো, কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া—সব কিছুরই দায়িত্বে থাকবেন তারা।

● **কেন্দ্রীয় বাজেট এগোল :**

আগামী বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হবে নির্ধারিত তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারির মাসখানেক আগেই। ২১ সেপ্টেম্বর বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। বাজেটের নতুন তারিখ স্থির হবে বিধানসভা নির্বাচনের সময়সূচির ভিত্তিতে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে গোয়া, মণিপুর, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও হিমাচলপ্রদেশে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। বাজেট তৈরির পুরো ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। যার অঙ্গ হিসেবে সাধারণ বাজেট পেশের নির্ধারিত সময়সীমা এক মাস এগিয়ে আনতে চায় তারা। সাধারণ বাজেটের সঙ্গে রেল বাজেটকে মেশানো এবং যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত ব্যয়ের হিসেব তুলে দিয়ে নতুন ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাবও অনুমোদিত হয় উল্লিখিত বৈঠকে।

● **কর্মচারী রাজ্য বিমা প্রকল্পে আয়ের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি :**

গত ৬ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বন্দারু দত্তাত্রেয়র নেতৃত্বাধীন ইএসআই পর্ষদের বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কর্মচারী রাজ্য বিমা (ইএসআই) প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার জন্য আয়ের ঊর্ধ্বসীমা মাসে ১৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২১,০০০ টাকা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, বেতন ২১,০০০ টাকা ছাড়ালেও, চাইলে এর আওতায় থাকার সুযোগ মিলবে। পয়লা অক্টোবর থেকেই নতুন ব্যবস্থা চালু হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে কর্মীদের বেতন ১৫,০০০ টাকা পেরোলেই তারা আর ইএসআই-এর আওতায় থাকতে পারেন না এবং চিকিৎসা বিমার সুবিধাও পান না। নতুন ব্যবস্থায় উপকৃত হবেন প্রায় ৫০ লক্ষ কর্মী। এখন ইএসআই-এর আওতায় রয়েছেন প্রায় ২.৬ কোটি চাকরিজীবী। প্রতি পরিবারে চার জন হিসাবে সব মিলিয়ে প্রকল্পের সুবিধা পান প্রায় ১০ কোটি মানুষ।

● **অক্টোবরেই স্টেট ব্যাংকের সংযুক্তি প্রক্রিয়া শুরুর ইঙ্গিত :**

অক্টোবরের মধ্যেই পাঁচ সহযোগী ব্যাংক এবং মহিলা ব্যাংক-কে 'স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে মেশানোর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। সব কিছু ঠিকঠাক চললে, চলতি ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষ শেষের আগে, আগামী মার্চের মধ্যেই সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সহযোগী ব্যাংকগুলি হল—স্টেট ব্যাংক অফ বিকানের অ্যান্ড জয়পুর, স্টেট ব্যাংক অফ ত্রিবাঙ্কুর, স্টেট ব্যাংক অফ পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাংক অফ মহীশূর ও স্টেট ব্যাংক অফ হায়দরাবাদ।

সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ার কথা। তার পরেই প্রথমে রিজার্ভ ব্যাংক ও পরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তা পাঠানো হবে। কেন্দ্র সায় দিলেই এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। উল্লেখ্য, আগস্টের শুরুতেই ওই ব্যাংকগুলিকে মেশানোর বিষয়টি অনুমোদন করেছে স্টেট ব্যাংকের পরিচালন পর্ষদ। সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে শেয়ার বিনিময়ের অনুপাতও। পর্ষদের অনুমোদনের পরেই সংযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে মতামত এবং অভিযোগ জানানোর জন্য ওই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডাররা অভিযোগ জানানোর জন্য ২১ দিন সময় পাচ্ছেন। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পরেই তা নিয়ে আলোচনা হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রিজার্ভ ব্যাংক ও কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে। সংযুক্তি সম্পূর্ণ হলে, স্টেট ব্যাংকে কেন্দ্রের অংশীদারিত্ব ৫৯.৭০ শতাংশের সামান্য বেশি দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত জুনে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে যা ছিল প্রায় ৬১.৩০ শতাংশ।

● **বিমানযাত্রার কোড ভাগাভাগি আইন শিথিল :**

কোড ভাগাভাগি হল বিমান পরিবহণের ভাষায় 'কোড-শেয়ারিং'। দেশি ও বিদেশি, প্রতিটি বিমান সংস্থার নিজস্ব একটি কোড থাকে। যেমন, ভারতে এয়ার ইন্ডিয়ার কোড 'এআই'। জোট বেঁধে নিজেদের এই কোডই শেয়ার করে বিমান সংস্থাগুলি। আর দুই সংস্থার মধ্যে কোড-শেয়ারিং হলে সুবিধা হয় যাত্রীদের। বিদেশি বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে কোড ভাগাভাগির জন্য জোট বাঁধতে এবার থেকে কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে না। শুধু গাঁটছড়া বাঁধার ৩০ দিন আগে তা জানাতে হবে কেন্দ্র ও বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ)-কে।

বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে যাত্রীদের কিছুটা সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে শর্তসাপেক্ষে এই আইন শিথিল করল ডিজিসিএ। ডিজিসিএ-র শর্ত, এই কোড শেয়ার শুধু সেই সব দেশের বিমান সংস্থার সঙ্গেই করা যাবে, যাদের সঙ্গে ভারতের বিমান পরিবহণ সংক্রান্ত চুক্তি রয়েছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের বিমান সংস্থা যেমন ভারতে উড়ান চালায়, তেমন ভারতের কোনও সংস্থাও সেই দেশে উড়ান চালাতে পারে। প্রতি সপ্তাহে দু' দেশের মধ্যে কতগুলি উড়ান চলবে তা-ও নির্দিষ্ট করা থাকে চুক্তিতে।

● **নির্মাণ ও আবাসন শিল্পের জন্য প্রস্তাবে মন্ত্রীসভার সায় :**

গত ৩১ আগস্ট নির্মাণ ও আবাসন শিল্পের জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাবে সায় দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। এর মধ্যে রয়েছে, দ্রুত বিবাদ মিটিয়ে প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, নগদ জোগানের বন্দোবস্ত ও আটকে থাকা প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম শিথিল। নির্মাণ ও আবাসন শিল্পের যেসব বিষয় মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে, সেগুলি হল—প্রকল্প সংক্রান্ত বিবাদ মেটাতে কনট্র্যাক্টরদের পুরনো সালিশি আইনে শুরু করা মামলা নতুন আইনের আওতায় নিয়ে আসার পথ খুলে দেওয়া এবং দ্রুত রফায় পৌঁছনো; বিবাদমান প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি মারফত মোট তহবিলের ৭৫ শতাংশ বরাদ্দের ব্যবস্থা; প্রকল্প সংক্রান্ত নতুন চুক্তিতে বিবাদ মিটমাটের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন।

● **ইউপিআই অ্যাপের মাধ্যমে লেনদেন শুরু :**

গত ২৫ আগস্ট 'ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস' (ইউপিআই) ব্যবস্থা চালু হয়। স্মার্ট ফোনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা লেনদেনের নতুন ব্যবস্থা। এর ফলে অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর না-জেনেই টাকা হস্তান্তরের পরিষেবা পাওয়া যায় এই ব্যবস্থায়। রিজার্ভ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে গোটা ব্যবস্থার নক্শা তৈরি করেছে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)। সেই পরিকাঠামোয় আপাতত নিজস্ব ইউপিআই অ্যাপ তৈরি করেছে ২১-

টি রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংক। সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরও ৫-টি ব্যাংকের অ্যাপ চালু হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আর বি আই গভর্ণর রঘুরাম রাজন এবং পরীক্ষামূলকভাবে তা চালু হয় ব্যাংকের কর্মীদের মধ্যে।

এই ব্যবস্থায় শুধু যাকে পাঠানো হচ্ছে, তার ঠিকানা (ভার্চুয়াল পেমেন্ট অ্যাড্রেস বা ভিপিএ) জানা থাকতে হবে। সংস্থার ক্ষেত্রে তা হতে পারে 'কিউ আর কোড'-ও। তবে উল্টো দিকের জনেরও ইউপিআই-অ্যাপ অ্যাকাউন্ট থাকা চাই। এই ব্যবস্থায় এক ব্যাংকের কাছ থেকে অন্য ব্যাংকের ঘরে টাকা পেলে ব্যাংকগুলির নতুন আয়ের পথ খুলে যায়। ইউপিআই অ্যাপ মারফত এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে টাকা গেলে, তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে 'ইন্টারচেঞ্জ ফি' লেনদেন হয়।

● **ব্যাংকিং ক্ষেত্রে 'মশলা বন্ড'-এ রিজার্ভ ব্যাংকের সায় :**

বাড়তি টিয়ার-ওয়ান ও টিয়ার-টু মূলধন জোগাড়ের জন্য ব্যাংকগুলিকে বিদেশের বাজারে টাকায় নির্ধারিত ঋণপত্র (মশলা বন্ড) বিক্রির অনুমতি দিল রিজার্ভ ব্যাংক। এখন কর্পোরেট সংস্থা ও ব্যাংক নয়, এমন বড় মাপের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিই শুধু এই ঋণপত্র ছাড়তে পারে। মশলা বন্ড বিক্রি সহজ করতে ২৫ আগস্ট আনা নতুন নিয়মে শীর্ষ ব্যাংক জানিয়েছে, দেশে সাধারণের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্প এবং পরিকাঠামো তৈরিতে অর্থের জোগান পেতেও মশলা বন্ড ছাড়তে পারবে ব্যাংকগুলি। এর পাশাপাশি, তাদের থেকে টাকা ধার নেওয়ার সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে কর্পোরেট বন্ড বন্ধক রাখার পথ খুলে দিতে আইনি সংশোধনও চাইছে শীর্ষ ব্যাংক।

● **কালো টাকায় রাশ টানতে সাইপ্রাসের লগ্নিতে কর :**

সাইপ্রাস থেকে ভারতে আসা লগ্নিকে করের আওতায় আনার জন্য নতুন চুক্তি অনুমোদন করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। জুনের শেষেই দু'টি দেশ এ ব্যাপারে নীতিগতভাবে একমত হয়েছিল। মরিশাসের সঙ্গে চুক্তির ধাঁচেই ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে ভারতে ব্যবসা করা সাইপ্রাসের সংস্থার শেয়ার হস্তান্তরে বসবে মূলধনী লাভ কর। ১৯৯৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী, সংস্থা বা লগ্নিকারী সাইপ্রাসের হলে ভারতে কর এড়ানো যেত। তবে বিদেশি লগ্নিকারীদের স্বস্তি দিতে ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিলের আগে করা লগ্নিতে মূলধনী লাভ হয়ে থাকলেও কর বসবে না, যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে মরিশাসকেও। এই দ্বৈত কর প্রতিরোধ চুক্তির লক্ষ্য, এ ধরনের লেনদেনকে করের আওতায় এনে কালো টাকায় রাশ টানা।

● **রেল পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য ২৪ হাজার কোটি টাকা :**

দেশের পরিকাঠামো ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করতে ২৪ আগস্ট দেশজুড়ে রেল সংযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য ন'টি রাজ্যের মোট ৯-টি প্রকল্পে সায় দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি। সব মিলিয়ে খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্পগুলির আওতায় তৈরি হবে মোট ১৯৩৭.২৮ কিলোমিটার রেলপথ। এর মধ্যে রয়েছে খড়্গপুর (নিমপুরা) ও আদিত্যপুরের (ঝাড়খণ্ড) মধ্যে ১৩২ কিলোমিটার লম্বা থার্ড লাইন নির্মাণ প্রকল্প। অনুমোদন পেয়েছে ৬,৪৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের পাঁচ রাজ্যে ১,১২০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পও। যা করা হবে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায়।

● **ভরতুকি ও রাজকোষ ঘাটতির অনুপাত বাড়ল, কমলো আর্থিক বৃদ্ধির হার :**

গত ৩১ আগস্ট কেন্দ্রের প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার কমে দাঁড়ায় ৭.১ শতাংশ। জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক (৭.৯ শতাংশ) কিংবা আগের বছরের এই একই সময়ের (৭.৫ শতাংশ) তুলনায় তো বটেই, গত ছয় ত্রৈমাসিকের মধ্যেও এই হার সব থেকে কম। প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৮ শতাংশ। অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে (এপ্রিল-জুলাই) বাজেট লক্ষ্যমাত্রার সাপেক্ষে বেড়েছে রাজকোষ ঘাটতির অনুপাতও। দেখা যাচ্ছে, পুরো অর্থবর্ষের জন্য সম্ভাব্য রাজকোষ ঘাটতি হিসেবে যা ধরে রাখা হয়েছে, প্রথম চার মাসেই ওই অঙ্ক পৌঁছেছে তার ৭৩.৭ শতাংশে। আগের বার এই একই সময়ে যা ছিল ৬৯.৩ শতাংশ। বেড়েছে ভরতুকির পরিমাণও। এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে গতবারের একই সময়ের তুলনায় এক লাফে তা বেড়েছে ৫৩ শতাংশ।

আলোচ্য তিন মাসে সরাসরি উৎপাদন কমে গিয়েছে খনন শিল্পে। ভাল হয়নি কৃষি উৎপাদনও। কলকারখানায় উৎপাদন ৯.১ শতাংশ বেড়েছে কিন্তু পরিকাঠামো শিল্পে কমেছে বৃদ্ধি। জুলাই মাসে ৮-টি পরিকাঠামো শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৩.২ শতাংশ যা জুনের ৫.২ শতাংশের থেকে অনেকটাই কম। তেল শোধন ক্ষেত্রে অবশ্য উৎপাদন বেড়েছে ১৩.৭ শতাংশ, আগের বছরের হার ২.৯ শতাংশ। কয়লা উৎপাদন বেড়েছে ৫.১ শতাংশ।

● **রিজার্ভ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট :**

গত ২৯ আগস্ট প্রকাশিত হয় রিজার্ভ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট। এই রিপোর্টে চলতি ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের জন্য ৭.৬ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আগের বছর তা ছিল ৭.২ শতাংশ। তবে মূল্যবৃদ্ধির চাপ আর্থিক বৃদ্ধিকে টেনে নামাতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেছে আরবিআই। প্রসঙ্গত, খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি জুলাইয়ে ছুঁয়েছে ৬.০৭ শতাংশ, যা গত দু'বছরে সর্বোচ্চ। পাশাপাশি, পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার ৩.৫৫ শতাংশ, যা গত ২৩ মাসে সবচেয়ে বেশি। প্রসঙ্গত, গভর্নর হিসেবে তার কাজের মেয়াদ গত ৪ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার আগে এটাই ছিল রঘুরাম রাজনের শেষ রিপোর্ট।

● **'ভারত বিল পেমেন্ট সিস্টেম' আসছে :**

শীর্ষ ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী, বিল মেটাতে বছরে প্রায় ৬ লক্ষ ২২ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয় এ দেশে। তার প্রায় ৭০ শতাংশই নগদে। ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)-এর তথ্য অনুসারে, ফি মাসে প্রায় ৩০ লক্ষ বিল সশরীরে গিয়ে মেটান গ্রাহকরা। এই ছবি পাল্টে সমস্ত পরিষেবার বিল এক জায়গায় মেটানোর পথ খুঁজতেই ভারত বিল পেমেন্ট সিস্টেম বা বিবিপিএস-এর মতো সার্বিক পরিকাঠামো গড়ার পরিকল্পনা নেয় রিজার্ভ ব্যাংক। এর মূল নক্শা এনপিসিআই-এর। তাদেরকেই

চিহ্নিত করা হয়েছে 'ভারত বিল পেমেন্ট সেন্ট্রাল ইউনিট' (বিবিপিসিইউ) হিসেবে। তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া রয়েছে বিভিন্ন ব্যাংক ও অ্যাগ্রিগেটর সংস্থার—এরা হল 'ভারত বিল পেমেন্ট অপারেশন ইউনিট' (বিবিপিওইউ)। লেনদেন বাবদ আয় হবে গাঁটছড়া থাকা সংস্থাগুলিরও। আগামী দিনে স্কুল-কলেজের ফি থেকে শুরু করে ক্রেডিট কার্ডের বিল মেটানো পর্যন্ত বিভিন্ন লেনদেন বিবিপিএস-এর আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিষেবা চালুর জন্য ইতোমধ্যেই ৫২-টি ব্যাংক ও ১০-টি ব্যাংক নয় এমন অ্যাগ্রিগেটর সংস্থাকে অনুমোদন দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক। এর মধ্যে সম্প্রতি ২৬-টি ব্যাংক ও ১০-টি 'নন-ব্যাংকিং' সংস্থা এনপিসিআই-কে জানিয়েছে যে, তাদের পরিকাঠামো তৈরি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পরিকাঠামো পরীক্ষা করে সফল হলে, চূড়ান্ত ছাড়পত্র মিলবে। আশা করা হচ্ছে আমজনতার জন্য বিবিপিএস চালু হবে নভেম্বরের মধ্যেই।

● **ব্রেক্সিট-এর পর ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি :**

ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে কী শর্তে ব্রিটেন বিদায় নেবে, তার উপরেই নির্ভর করবে ভারত-ব্রিটেন নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। ৩০ আগস্ট ব্রিটিশ সরকারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপ-সচিব লিয়াম ফক্সকে এ কথা জানান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। দিল্লিতে ফক্সের সঙ্গে বৈঠকে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের পেশাদারদের উপর ব্রেক্সিটের প্রভাব নিয়ে আলোচনা হয় জেটলির। ব্রিটেনে তৃতীয় বৃহত্তম লগ্নিকারী ভারত। কিন্তু ব্রেক্সিট-এর পরে ভারতের তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ফক্স দেশের তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার কর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ডের অধীনে ভারত ও ব্রিটেন মিলে তহবিল তৈরির ভাবনা-চিন্তা চলছে।

প্রসঙ্গত, ভারত সফরের পরেদেশে ফিরে ফক্স বলেন, কোনও দেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে চাইলে নিজের থেকে কথাবার্তা চালানো এত দিন সম্ভব ছিল না। আলোচনা হতো ইইউ মারফত। এখন মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে কথা বলার পরিবেশও অনেক বেশি খোলামেলা হয়েছে বলে দাবি ফক্সের। তবে ইইউ-এর সঙ্গে বিচ্ছেদ পর্ব মিটে গেলে আলাদা করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সেরে ফেলতে অন্তত দু'বছর লাগবে বলে ইঙ্গিত দেন ফক্স।

● **ভারতে প্রথমবার বিমা সংস্থাকে নতুন ইস্যুতে সেবি-র সায় :**

প্রথমবার শেয়ার ছেড়ে টাকা তোলার প্রস্তাবে বাজার নিয়ন্ত্রক সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া বা সেবি-র সায় পেল আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল লাইফ ইনশিওরেন্স কোম্পানি। ফলে তারাই ভারতের প্রথম বিমা সংস্থা, যারা নতুন ইস্যু ছেড়ে তহবিল সংগ্রহ করার পথে হাঁটল। ১৯ সেপ্টেম্বর বেসরকারি আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইনশিওরেন্স কোম্পানি ৬০৫৭ কোটি টাকার শেয়ার ছাড়ে বাজারে। গত প্রায় ছ'বছরে এটিই হবে সবচেয়ে বড় নতুন ইস্যু। গত জুলাইয়েই সেবি-র কাছে প্রস্তাব জমা দেয় সংস্থা। আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল ভারতের বেসরকারি ব্যাংক আইসিআইসিআই ব্যাংক (৬৮ শতাংশ) এবং ব্রিটেনের প্রুডেনশিয়াল কর্পোরেশন হোল্ডিংসের (২৬ শতাংশ) যৌথ উদ্যোগ। সিঙ্গাপুরের লগ্নি সংস্থা টিমাসেক ও প্রাইভেট ইকুইটি ফান্ড, প্রেমজি ইনভেস্টেরও শেয়ার আছে কিছুটা। সেবি-র কাছে দেওয়া খসড়া প্রস্তাবে জানানো হয়, আইসিআইসিআই ব্যাংক মারফত বাজারে ছাড়া হবে আইসিআইসিআই প্রু-র শেয়ার মূলধনের ১২.৬৫ শতাংশ। যার মধ্যে ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে ১০ শতাংশ (১,৮১,৩৪,১০৫-টি পর্যন্ত)।

নতুন ইস্যু বা আইপিও-র মাধ্যমে এই দফায় বিক্রি করা হয় বিমা সংস্থাটির মোট ১৯ শতাংশ মালিকানা। ২৫ শতাংশে পৌঁছতে তিন বছরের মধ্যে বিক্রি করতে হবে আরও ৬ শতাংশ। ২০১০ সালে কোল ইন্ডিয়ার ১৫,০০০ কোটি টাকার ইস্যুর পরে এটিই বৃহত্তম পাবলিক ইস্যু।

● **সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাংকিং পরিষেবা :**

এবার ফেসবুক বা ট্যুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাংকিং পরিষেবা দিচ্ছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। এর জন্য 'এসবিআই মিঙ্গল' নামে অ্যাপ চালু করেছে তারা। সম্প্রতি নতুন ব্যবস্থাটির উদ্বোধন করেন স্টেট ব্যাংকের চেয়ারম্যান অরুন্ধতী ভট্টাচার্য। মিঙ্গল পরিষেবায় এসবিআই-এর ফেসবুক পেজ বা ট্যুইটার হ্যান্ডলের মাধ্যমে ব্যাংকিং-এর বেশ কিছু পরিষেবা পাবেন গ্রাহক। যেমন—অ্যাকাউন্টে কত টাকা রয়েছে তা দেখা, মিনি স্টেটমেন্ট পাওয়া, এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো ইত্যাদি।

● **সুদহীন ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব :**

সুদের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে এ দেশের ব্যাংকিং আইন। অথচ ইসলাম ধর্মে সুদ দেওয়া-নেওয়া নিষিদ্ধ। এবার প্রায় সরাসরি ইসলামি ব্যাংকিং-এর প্রস্তাবই দেওয়া হয়েছে ২৯ আগস্ট প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাংক-এর বার্ষিক রিপোর্টে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ধর্মীয় কারণে যারা পছন্দ করেন না, সেই সব মুসলিম এখনও থেকে যাচ্ছেন ব্যাংকিং পরিষেবার আওতার বাইরে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে এ ব্যাপারে শীর্ষ ব্যাংক একটি কমিটি গড়ে, যারা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য সুদহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দেয়। এ ব্যাপারে এই প্রথম কেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা শুরুর প্রস্তাব দিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। আরবিআই জানিয়েছে, সুদ এড়িয়ে কোন কোন পরিষেবা দেওয়া যায়, তা নিয়েই সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবে তারা। এক্ষেত্রে অন্য পথে হাঁটতে গেলে সংসদে পাস করাতে হবে নতুন আইন, যা কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব।

এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা কী, সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক—

■ শরিয়ত আইনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ইসলামীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা।

■ সুদ দেওয়া-নেওয়া এখানে নিষিদ্ধ, কারণ এই আইন অনুযায়ী তা অনুমোদিত নয়।

■ কোনও ব্যবসার জন্য ঋণ দিলে ব্যাংক সুদ হাতে পায় না। তার বদলে মুনাফার ভাগ পায়। মুনাফা না-হলে ব্যাংক-কেও ফিরতে হয় শূন্য হাতে।

■ আমানতকারীকেও সুদ দেয় না ব্যাংক। তবে ব্যাংকের লাভ হলে তার থেকে ভাগ পেতে পারেন তিনি।

এক নজরে অর্থনীতির আরও খবরাখবর

- **এ পি শাহ কমিটির রিপোর্ট পেশ :** গত ৩১ আগস্ট কৃষ্ণা-গোদাবরী অববাহিকায় ওএনজিসি এবং রিলায়্যান্সের গ্যাস বিতর্কে রিপোর্ট জমা দেয় বিচারপতি এ পি শাহের নেতৃত্বাধীন কমিটি। ৭ বছরে ওএনজিসি-র বরাদ্দ বিপুল গ্যাস যে রিলায়্যান্সের ব্লকে চলে গিয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়েছে রিপোর্টে। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা এড়ানোর পথও বাতলানো হয়েছে কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রীকে পাঠানো রিপোর্টে। ২০০৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ওএনজিসি-র ১,১১২.২ কোটি ঘনমিটার গ্যাস রিলায়্যান্সের ব্লকে চলে গিয়েছে বলে রিপোর্ট জানিয়েছে।
- **ভারতে বেতন বেড়েছে নামমাত্র, দাবি সমীক্ষায় :** বিশ্ব জুড়ে মন্দা শুরুর পর থেকে গত আট বছরে ভারতের জাতীয় আয় বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ৬৩.৮ শতাংশ বাড়লেও, বেতন বেড়েছে নগণ্য। মূল্যবৃদ্ধিকে হিসেবের মধ্যে আনলে তা মাত্র ০.২ শতাংশ। সম্প্রতি মার্কিন উপদেষ্টা সংস্থা কর্ন ফেরি হে গ্রুপের সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য। জি-২০ গোষ্ঠীতে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলির বেশির ভাগই এই তালিকায় হয় উপরের দিকে, নয় তো নিচের দিকে স্থান পেয়েছে। উন্নত দেশগুলির সঙ্গে দৌড়ে মাঝের সারিতে রয়েছে ভারত।
- **4G স্পেকট্রাম নিলাম :** আসন্ন স্পেকট্রাম নিলামে অংশগ্রহণ করতে আবেদনপত্র জমা দেয় মোবাইল পরিষেবা সংস্থাগুলি। এদের মধ্যে আছে ভারতী এয়ারটেল, ভোডাফোন, আইডিয়া, রিলায়েন্স জিও, আর-কম, টাটা টেলি, এয়ারসেল। ১৪ সেপ্টেম্বর ছিল আবেদন দাখিলের শেষ দিন। ১ অক্টোবর থেকে নিলাম শুরুর কথা। এর মাধ্যমে ৫.৬৩ লক্ষ কোটি টাকা তোলার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্র। নিলামে তোলা সব স্পেকট্রামই ফোর-জি (4G) পরিষেবায় ব্যবহার করা যাবে। এই প্রথম ৭০০ মেগাহার্ৎজ ব্যান্ডের স্পেকট্রামও নিলাম হবে। ন্যূনতম দরে এই স্পেকট্রাম বিক্রি হলেও কেন্দ্রের ঘরে ৪ লক্ষ কোটি টাকা আসার কথা।
- **পেনশনভোগীদের জন্য ওয়েব পোর্টাল :** প্রবীণ নাগরিকদের হয়রানি কমাতে এবার পেনশনের খুঁটিনাটি নজরে রাখা এবং এ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকারের প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে উদ্যোগী হল কেন্দ্র। ১৪ সেপ্টেম্বর এই লক্ষ্যে কেন্দ্রের ১১.৬১ লক্ষেরও বেশি পেনশনভোগীদের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল (www.cpao.nic.in) চালু করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এই সাইটে পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এক সঙ্গে দেখা যাবে। অভিযোগও জানানো যাবে। পেনশন পাওয়ার বিষয়টি ঠিক কোন অবস্থায় রয়েছে তার হালহকিকৎ, এ সংক্রান্ত মামলা চললে তার অবস্থা ইত্যাদি এসএমএস মারফত জানার সুবিধা রয়েছে।
- **হলদিয়া ডকে এলএনজি মজুত-কেন্দ্র :** হলদিয়া বন্দরের কাছে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস জমা (এলএনজি) জমা রাখার ব্যবস্থা তৈরিতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রটি গড়তে পাইপলাইন বসানো-সহ বিভিন্ন কাজের জন্য বন্দরের ১ নম্বর তেল জেটির কাছে ১০ একর জমি চিহ্নিত করেছে হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স। ৩০ বছরের লিজে ওই জমিতে গ্যাসের মজুত কেন্দ্র গড়া হবে। লিজ দেওয়ার কাজ আগামী ডিসেম্বরেই শুরু হবে। জমি দেওয়ার পুরো কাজ শেষ হতে দু'বছর লাগবে।
- **বিদেশে ভারতীয় সংস্থার বিনিয়োগ কমলো :** রিজার্ভ ব্যাংক প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত আগস্ট মাসে বিদেশে ভারতীয় সংস্থাগুলির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ কমে গিয়েছে ৮৪ শতাংশ। ফলে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ কোটি ৯০ লক্ষ ৬০ হাজার ডলারে। অথচ আগের বছরের একই সময় ওই লগ্নির অঙ্ক ছিল ২৪৭ কোটি ডলার। এ বছরের জুলাইয়ের থেকেও তা ৮২.৬ শতাংশ নিচে।
- **রিজার্ভ ব্যাংক গভর্নরের দায়িত্ব নিলেন উর্জিত প্যাটেল :** গত ৬ সেপ্টেম্বর থেকে শীর্ষ ব্যাংকের ২৪তম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ২০১৩ থেকে ডেপুটি গভর্নর পদে থাকা উর্জিত প্যাটেল। এদিন, প্রথম কাজের দিনে উত্তরসূরির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব ভার তুলে দেন প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন।
- **কর্মী প্রশিক্ষণে কেন্দ্রের ৩৪ কোটির তহবিল :** দক্ষ কর্মী গড়তে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকার তহবিল তৈরি করছে কেন্দ্রীয় সরকার, জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা সংক্রান্ত মন্ত্রী রাজীব প্রতাপ রুডি। উল্লেখ্য, নির্মাণ, খুচরো ব্যবসা, গাড়ি, বস্ত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রের জন্য 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা'-র মাধ্যমে এক কোটি দক্ষ কর্মী গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। পশ্চিমবঙ্গ-সহ নানা রাজ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর ভাবনাও রয়েছে কেন্দ্রের।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- **বারাক-৮ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ :**

গত ২০ সেপ্টেম্বর ওড়িশা উপকূলের নিকটবর্তী একটি টেস্ট রেঞ্জ থেকে দূরপাল্লার বারাক-৮ ক্ষেপণাস্ত্রটি ছোড়া হয়। 'ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন' (ডিআরডিও) সূত্রে খবর, ক্ষেপণাস্ত্রটির 'ভূমি-থেকে-আকাশ' উৎক্ষেপণ সম্পূর্ণ সফল। বারাক-৮ শুধুমাত্র একটি ক্ষেপণাস্ত্র নয়। এটি একটি পুরোদস্তুর আকাশসীমা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় রয়েছে মাল্টি ফাংশনাল সার্ভেল্যান্স অ্যান্ড থ্রেট অ্যালার্ট রাডার বা এমএফ-স্টার। এই রাডার সহজেই আকাশপথে আসা যে কোনও আক্রমণ, যেমন প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধবিমান বা ড্রোনের আঁচ পেয়ে যায়। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মাঝ আকাশেই লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁত আঘাত হানতে সক্ষম।

প্রসঙ্গত, বারাক-৮-এর এটিই প্রথম পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ নয়। ২০১৫ সালের শেষ দিকেও ইজরায়েলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সফল হয়। আইএনএস কলকাতা যুদ্ধজাহাজ থেকে সেবার ছোড়া হয় এই ক্ষেপণাস্ত্র।

- **ভারতের নতুন মৌসম উপগ্রহ গেল কক্ষপথে :**

মৌসমের ওপর নজর রাখার সর্বাধুনিক কৃত্রিম উপগ্রহ 'ইনস্যাট-৩ডিআর' গত ৮ সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (স্পেস সেন্টার) থেকে কক্ষপথে পাঠায় ভারত। 'জিএসএলভি-এফও৫' রকেটে চাপিয়ে কক্ষপথে পাঠানো

হয় 'ইনস্যাট-৩ডিআর'। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো জানায়, জ্বালানি-সহ উপগ্রহটির ওজন ২ হাজার ২১১ কিলোগ্রাম। উৎক্ষেপণের ১৭ মিনিটের মধ্যেই কক্ষপথে পৌঁছে যায় উপগ্রহটি।

এই নতুন কৃত্রিম উপগ্রহটির মাধ্যমে সাগরের উষ্ণতার উপরে অনেক নিখুঁতভাবে নজরদারি চালানো সম্ভব। সাগরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি সাহায্য করতে সক্ষম। মাঝসাগরে বিমান নিখোঁজ হওয়ার মতো কোনও বিপত্তি ঘটলে উদ্ধার-তল্লাশির কাজেও যা আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজে আসবে। পরিবেশবিদরা বলছেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরেই এমন ঘন ঘন হানা দিচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। আগামী দিনে এর দাপট আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা। আবহবিজ্ঞানীরাও এ কথা মেনে নিয়ে জানাচ্ছেন, এখন ইনস্যাট-৩ডি দিয়ে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ছবি তোলা হয়; ইনস্যাট-৩ডিআর থেকে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর উপগ্রহ-চিত্র পাওয়া সম্ভব।

● **কুষ্ঠ রোগের দেশীয় প্রতিষেধক :**

দেশীয় পদ্ধতিতে এই প্রথম কুষ্ঠ রোগের প্রতিষেধক তৈরি করে নতুন দিল্লির 'দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইমিউনোলজি'। এই ইমিউনোথেরাপিউটিক প্রতিষেধকটির নাম মাইকোব্যাকটেরিয়াম ইন্ডিকাস প্রানি (এমআইপি)। ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল এবং মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কুষ্ঠ রোগের জন্য এই প্রতিষেধকের ব্যবহারে সম্মতি দেয়। পরীক্ষামূলক ব্যবহার সফল হলে আগামী দিনে দেশজুড়ে এই প্রতিষেধক দেওয়ার আয়োজন করা হবে। প্রসঙ্গত, ভারতে প্রতি বছর এই রোগে আক্রান্ত হন ১.২৫ লক্ষ মানুষ। বিশ্বে মোট কুষ্ঠ রোগে আক্রান্তদের মধ্যে ৬০ শতাংশই ভারতের।

● **রক্তের নতুন গ্রুপ সন্ধানের দাবি :**

সম্প্রতি গুজরাটের সুরাতে চিকিৎসকরা এক ব্যক্তির শরীরে নতুন রক্তের গ্রুপের সন্ধান পাওয়ার দাবি করেন—নমুনা পরীক্ষা করার সময় চিকিৎসকরা দেখেন যে, কোনও গ্রুপের সঙ্গেই তার নাকি রক্ত মিলছিল না। অবশেষে তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে ওই ব্যক্তির রক্তের নমুনা পরীক্ষা করতে পাঠান; জানান, এই নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। নতুন ওই রক্তের গ্রুপের নাম দেওয়া হয় 'INRA'—দেশের প্রথম দুই অক্ষর এবং ওই ব্যক্তির নামের প্রথম দুই অক্ষর মিলিয়েই এই নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য, রক্তের A, B, AB এবং O গ্রুপের পাশাপাশি বিশ্বের বিরলতম রক্ত 'বম্বে গ্রুপ' ছাড়াও ২০১২ এবং ২০১৪ সালে ল্যাঞ্জেরেইস, RH, HH এবং ABO গ্রুপের অস্তিত্ব স্বীকৃত।

● **গ্রহাণুর উদ্দেশ্যে মহাকাশে 'ওসাইরিস-রেক্স' :**

গত ৮ সেপ্টেম্বর ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে 'অ্যাটলাস-৫' রকেটে চেপে মহাকাশে পাড়ি দেয় মহাকাশযান 'ওসাইরিস-রেক্স'—Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer। লক্ষ্য, 'বেন্নু' গ্রহাণু বা অ্যাস্টারয়েডের বুক থেকে নুড়ি-পাথর তুলে নিয়ে আসা। ২০১৮ সালে মহাকাশযান 'ওসাইরিস-রেক্স' ঢুকে পড়বে বিশাল চেহারার গ্রহাণু 'বেন্নু'-র কক্ষপথে। সেই কক্ষপথে থেকেই আরও দু'বছর ধরে মহাকাশযানটি একটু একটু করে গ্রহাণুটির কাছে যেতে শুরু করবে। তারপর ২০২০ সালে 'ওসাইরিস-রেক্স' শুরু করবে 'বেন্নু' থেকে নুড়ি-পাথর কুড়ানোর কাজ। সে কাজ শেষ হলে আরও এক বছর মহাকাশযানটি থাকবে 'বেন্নু'-র কক্ষপথে, ২০২১ সাল পর্যন্ত। তারপর শুরু হবে তার 'রিটার্ন জার্নি'। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে পৃথিবীর কাছাকাছি এসেই 'বেন্নু' থেকে কুড়িয়ে আনা নুড়ি-পাথরগুলো একটা ক্যাপসুলের মধ্যে রেখে সেটা প্যারাশুটে করে পৃথিবীতে ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাবে 'ওসাইরিস-রেক্স'। সেই ক্যাপসুলটি পড়ার কথা উটা মরুভূমিতে। প্রসঙ্গত, এই প্রথম অ্যাস্টারয়েডের বুকে 'পদচিহ্ন' এঁকে দিয়ে আসতে চলেছে মানবসভ্যতা। ১৯৯৯ সালে প্রথম হদিশ পাওয়া যায় 'বেন্নু' নামাঙ্কিত গ্রহাণুটির। তার আয়তন ৫০০ মিটারের একটু বেশি। আপাতত তার যা গতিপথ, তাতে ২১৭৫ থেকে ২১৯৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর ওপর 'বেন্নু'-র আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা নাকি অনেকটাই।

● **বন্ধ বই পড়ার প্রযুক্তি :**

হাত না লাগিয়েই বই পড়ে নেওয়ার এক প্রযুক্তি বার করেছেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT)-র এক দল গবেষক। তাদের দাবি, প্রযুক্তিতে বই আর খুলে পড়তে হবে না। দুষ্প্রাপ্য বই বা পুঁথির ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পড়ে ফেলা যাবে বন্ধ করে রাখা বইয়ের প্রতিটি পাতার প্রতিটি বর্ণ। এমনকী, মেশিন কিংবা ওষুধের গায়ে লেখা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শব্দগুলোকেও পড়া যাবে।

গায়ে গায়ে লেগে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বইয়ের দু'টি পাতার মধ্যে অন্তত ২০ মাইক্রন ফাঁক থাকে, যাতে থাকে বাতাসের একটি স্তর। বিশেষ কম্পাঙ্কের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ পাঠালে প্রতিটি পাতায় তার প্রতিফলন হয়। এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় মাইক্রোওয়েভ ও ইনফ্রা-রেড তরঙ্গের মাঝামাঝি কম্পাঙ্কের টেরাহার্ৎজ তরঙ্গ। সেই প্রতিফলিত তরঙ্গে ধরা থাকে ছাপা ও না ছাপা অংশের তারতম্য। সেটাই বিশ্লেষণ করে পড়ে ফেলা যাচ্ছে পাতার পর পাতা। চিকিৎসার জন্য যেভাবে এক্স-রে বা চুম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে শরীরের ছবি স্তরে স্তরে তোলা যায় ঠিক তেমনই। MIT ও জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা এর 'অ্যালগোরিদম'-কে এমনভাবে বানিয়েছেন, যাত কাগজের গাদার মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি পাতার ছবি বিশ্লেষণ করে অসম্পূর্ণ বর্ণ বা শব্দকেও চিহ্নিত করতে পারে এই প্রযুক্তি।

● **ডিএনএ-তে গ্রেট প্লেগের জীবাণু :**

গত বছর এলিজাবেথ লাইন নামের নতুন একটি ট্রেন রুট তৈরির জন্য খোঁড়াখুঁড়ি চলাকালীন লিভারপুল স্ট্রিট স্টেশনের কাছে ৩৩০০-এরও বেশি কঙ্কাল পাওয়া যায়। এলাকাটি বেদলাম কবরস্থান বলেই পরিচিত। আর সেখানেই ৪২-টি এমন কঙ্কাল মেলে, ভূতত্ত্ববিদদের মতে, যেসব কঙ্কালের বয়স প্রায় ৩০০ বছর। মূলত এদের দাঁত থেকেই ডিএনএ উদ্ধার করেন বিজ্ঞানীরা। কারণ, দাঁতের এনামেল ডিএনএ-কে সুরক্ষিত রাখে। জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের গবেষকরা এরকম ২০-টি কঙ্কাল থেকে ডিএনএ পরীক্ষা করেন।

তাদের মধ্যে ৫-টিতে প্লেগের জীবাণু ইয়ারসিনা পেস্টিস-এর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৬৬৫ সালে মহামারিতে লন্ডনে মারা যান প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। তবে এতদিন পর্যন্ত সত্যিই প্লেগ হয়েছিল কি না তখন, সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য ছিল না বিজ্ঞানীদের কাছে। অবশেষে মহামারির কারণ নিয়ে ধন্দ কাটল।

● **পান্ডা 'বিপন্ন' নয়, 'প্রায় বিপন্ন' :**

গত ৪ সেপ্টেম্বর 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার' একটি রিপোর্টে জানায়, দক্ষিণ চিনে জায়ান্ট পান্ডার সংখ্যা বেড়েছে। ২০০৪ সালে বন্য পান্ডার সংখ্যা ছিল ১৫৯৬। আর ২০১৪ সালে তা বেড়ে হয় ১৮৬৪। এতদিন 'বিপন্ন' বা endangered প্রাণীদের তালিকায় ছিল জায়েন্ট পান্ডা। কিন্তু তাদের জনসংখ্যায় কিছুটা উন্নতি হওয়ায়, এখন তারা 'প্রায় বিপন্ন' বা vulnerable প্রাণীর তালিকাভুক্ত।

● **ইসরো-র স্ক্র্যামজেট-এর সফল উৎক্ষেপণ :**

২৮ আগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে নতুন স্ক্র্যামজেট রকেট ইঞ্জিন সফলভাবে উৎক্ষেপণ করল ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। বিশেষ ধরনের এই ইঞ্জিন ব্যবহার করলে রকেট উৎক্ষেপণের খরচ কমিয়ে দশ ভাগের এক ভাগ করা সম্ভব হবে। এই বিশেষ ইঞ্জিনটি পরিবেশ থেকে জ্বালানি অক্সিজেন গ্রহণ করতে সক্ষম। ফলে অতিরিক্ত জ্বালানি বহন করতে হয় না।

প্রয়াণ

● **লিন্ডসে টাকেট :**

গত ৫ সেপ্টেম্বর জীবনাবসান হয় লিন্ডসে টাকেটের। বয়স হয়েছিল ৯৭। তিনিই বিশ্বের সব থেকে বেশি বয়সের টেস্ট ক্রিকেটার, যিনি বেঁচে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ফাস্ট বোলার খেলেছেন ন'টি টেস্ট। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত খেলেছেন দেশের হয়ে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ৬১-টি ম্যাচে ২২৫-টি উইকেট রয়েছে টাকেটের। ১৯৩৪-'৩৫ থেকে ১৯৫৪-'৫৫ সালের মধ্যে। যেখানে রয়েছে এক মরসুমে ৩২ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড। সেটা ১৯৫১-'৫২ সাল। অ্যাভারেজ ১৭.৫৯। টাকেটের বাবাও ছিলেন ক্রিকেটার। টাকেটের মৃত্যুর পর এই মুহূর্তে জীবিত সব থেকে বেশি বয়সের টেস্ট ক্রিকেটার দক্ষিণ আফ্রিকারই, ৯৩ বছরের জন ওয়াটকিনস।

খেলা

● **রিও প্যারালিম্পিক্স-এর ডায়েরি :**

গত ৭ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনিরোতে ভিন্নভাবে সক্ষম খেলোয়াড়দের জন্য গ্রীষ্মকালীন প্যারালিম্পিক্স-এর ১৫তম আসরের আয়োজন হয়। এই প্রথমবার কোনও লাতিন তথা দক্ষিণ আমেরিকার দেশে প্যারালিম্পিক্স অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি নতুন ক্রীড়া, canoeing ও paratriathlon এবার সংযুক্ত করা হয়।

পদক তালিকার সেরা দশ ও ভারত

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	১০৭	৮১	৫১	২৩৯
২	গ্রেট ব্রিটেন	৬৪	৩৯	৪৪	১৪৭
৩	ইউক্রেন	৪১	৩৭	৩৯	১১৭
৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪০	৪৪	৩১	১১৫
৫	অস্ট্রেলিয়া	২২	৩০	২৯	৮১
৬	জার্মানি	১৮	২৫	১৪	৫৭
৭	নেদারল্যান্ডস	১৮	১৯	২৬	৬৩
৮	ব্রাজিল	১৪	২৯	২৯	৭২
৯	ইটালি	১০	১৪	১৫	৩৯
১০	পোল্যান্ড	৯	১৮	১২	৩৯
৪৩	ভারত	২	১	১	৪

● *পদক জয়ী ভারতীয় অ্যাথলিটরা :*

☐ **মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু**—রিও প্যারালিম্পিক্সের তৃতীয় দিনে (৯ সেপ্টেম্বর) হাইজাম্পের টি৪২ ইভেন্টে ১.৮৯ মিটার লাফিয়ে সোনা জেতেন ২০ বছরের থাঙ্গাভেলু। রিও প্যারালিম্পিক্সে ভারত প্রথম সোনা এনে দেন তিনিই। পাঁচ বছর বয়সে একটি বাস দুর্ঘটনায় পা বাদ যায় থাঙ্গাভেলুর। থাঙ্গাভেলুই প্রথম ভারতীয় হাইজাম্পার যিনি প্যারালিম্পিক্সে সোনা জিতলেন। এর আগে প্যারালিম্পিক্সে সোনা পান মাত্র দু'জন ভারতীয় অ্যাথলিট—১৯৭২ সালে সাঁতারে মুরলিকান্ত পেটকর এবং ২০০৪ সালে জ্যাভেলিন থ্রোয়ে দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া। টি৪২ ইভেন্টে তারাই প্রতিযোগী হন, যাদের একটি পায়ের হাঁটুর নিচের অংশ নেই বা বিকল। ১২ জন প্রতিযোগীর ছ'জনই প্রথম রাউন্ড শেষ করেন ১.৭৪ মিটারে। দশমবারের চেষ্টায় থাঙ্গাভেলু ১.৭৭ মিটার লাফিয়ে এক নম্বরে চলে আসেন। (ভারতের আর এক অ্যাথলিট শরদ কুমার শেষ করেন ছ' নম্বরে।)

☐ **বরুণ সিংহ ভাটি**—হাই জাম্পের ওই একই ইভেন্টে ১.৮৬ মিটার লাফিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন ২২ বছরের বরুণ। ছোটোবেলা থেকেই পোলিও আক্রান্ত। তখন বরুণের বয়স মাত্র ছয়। পোলিওয় আক্রান্ত বাঁ পা আর ঠিক হয়নি। এই বছরই এশিয়া-ওসেমানিয়া চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জেতেন।

☐ **দীপা মালিক**—প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে পদকের খাতা খুললেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর শটপাটে রুপো জিতলেন বছর পঁয়তাল্লিশের দীপা মালিক। ষষ্ঠ দফার চেষ্টায় ৪.৬১ মিটার ছুঁড়ে তিনি রুপো জেতেন। (সোনা পেলেন বাহরিনের ফতেমা নেধাম ৪.৭৬ মিটার ছুঁড়ে।) কোমরের তলা থেকে সাড় নেই গত সতেরো বছর ধরে। মেরুদণ্ডের টিউমার সারাতে গিয়ে তিনবার অস্ত্রোপচার করতে পিঠ, কোমর ও পায়ে মোট ১৮৩-টি সেলাই হয়েছিল। জীবন কাটে হুইলচেয়ারে।

☐ **দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া**—জ্যাভেলিন থ্রো-তে সোনা জিতলেন বিশ্বরেকর্ড করে (১৪ সেপ্টেম্বর)। অলিম্পিকে দুটো সোনা ভারতে আর কারও নেই। (অলিম্পিকে ব্যক্তিগত বিভাগে একটা সোনা ছিল শুটার অভিনব বিন্দ্রার।) ২০০৪ সালের এথেন্স প্যারা অলিম্পিকে সোনা পেয়েছিলেন জ্যাভেলিনে। ৬২.১৫ মিটার ছুঁড়ে বিশ্বরেকর্ড করে। ৩৫ বছর বয়সে রিওতে নিজের ১২ বছর পুরোনো বিশ্বরেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন (৬৩.৭৩

মিটার)। আট বছর বয়সে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হন এবং সেই দুর্ঘটনাতেই তার বাঁ হাত কনুই থেকে বাদ দিতে হয়।

● **ভারতের ৫০০তম টেস্ট :**

কানপুরের গ্রিনপার্কে বিরাট কোহালির হাত ধরে ৫০০তম টেস্ট খেলতে নামে ভারত। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কানপুরে শুরু হয় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। ১৯৩২ থেকে ২০১৬। এতদিনে ৩২ জন অধিনায়ককে পেয়েছে ভারত। ইংল্যান্ড (৯৭৬), অস্ট্রেলিয়া (৭৯১) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৫১৭)-এর সঙ্গে ৫০০-র তালিকায় ঢুকে পড়ল ভারতীয় ক্রিকেট।

ব্রিটিশদের হাত ধরে ভারতের প্রথম ক্রিকেট ক্লাব তৈরি হয় ১৭৯২ সালে কলকাতায়। ১৯১১ সালে প্রথম কোনও ভারতীয় দল যায় ইংল্যান্ড সফরে। তবে সেই দল শুধু খেলেছিল কাউন্টি দলের সঙ্গেই। তখনও তৈরি হয়নি জাতীয় দল। তারপর ১৯৩২ সালে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকের পর ভারতকে প্রথম জয় পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ২০ বছর। ১৯৫২ সালে প্রথম জয়ের মুখ দেখে ভারত।

● **জাতীয় কুস্তিতে নামা বাধ্যতামূলক :**

দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চাইলে তারকা কুস্তিগিরদেরও আগে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর এমনই সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন। সাক্ষী মালিকের ব্রোঞ্জ বাদ দিলে রিও অলিম্পিক্সে চূড়ান্ত ব্যর্থ ভারতের পালোয়ানরা। তাই কুস্তির সার্বিক মানোন্নয়নে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্ব বাড়ানো হচ্ছে। ২২-২৫ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের নন্দিনী নগরে হবে এবারের জাতীয় কুস্তি। জানিয়ে দেওয়া হয়, জাতীয় দলে ডাক পেতে হলে সেখানে নামা বাধ্যতামূলক। নিয়মটা এই রকম, শুধুমাত্র জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের পদক জয়ীরাই ডাক পাবেন জাতীয় শিবিরে। শিবিরে না থাকা কোনও কুস্তিগিরকে জাতীয় দলে নির্বাচিত করা হবে না। এমনকী বিদেশের টুর্নামেন্টে নামার ট্রায়ালের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম খাটবে।

● **বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা পাঁচে সাক্ষী মালিক :**

রিও অলিম্পিক্সে পদক জিতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা পাঁচে উঠে এলেন কুস্তিগির সাক্ষী মালিক। প্রথম ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির হিসেবে অলিম্পিক্সে পদক জিতে একলাফে উঠে এলেন চারে। অন্য মহিলা কুস্তিগির ভিনেশ ফোগত চোটের জন্য কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই ছিটকে যান। তিনি দু'ধাপ উঠে পৌঁছে গেলেন ১১ নম্বরে। অন্যদিকে, পুরুষদের ফ্রি স্টাইলে সন্দীপ তোমার ও বজরং পুনিয়াই জায়গা করে নিলেন সেরা ২০-তে। সন্দীপ ৫৭ কেজি বিভাগে রয়েছেন ১৫ নম্বরে ও বজরং ৬১ কেজি বিভাগে ১৮ নম্বরে।

● **ম্যাক্সওয়েলের অপরাজিত ১৪৫, টি-২০-তে রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার :**

গত ৬ সেপ্টেম্বর পাল্লেকালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ব্যাট থেকে আসা অপরাজিত ১৪৫-এর সুবাদে টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান করে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। তিন উইকেটে ২৬৩। এটাই আন্তর্জাতিক টি-২০-তে সর্বোচ্চ রান। এই রানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ছুঁয়ে ফেলল আইপিএল-এ করা বেঙ্গালুরু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের রানও। ২০১৩ সালে আইপিএল-এ পুণে ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে ওই রান করেছিল বেঙ্গালুরু। আর ম্যাক্সওয়েল টি-২০-র ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করেন। তার আগে রয়েছেন তারই সতীর্থ অ্যারন ফিঞ্চ। ২০১৩ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫৬ রানের ইনিংস খেলেন ফিঞ্চ। ১৪৫ করে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন ম্যাক্সওয়েল। তারপরে রয়েছেন শেন ওয়াটসন। তার রান ১২৪। প্রসঙ্গত, ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে ব্যাট করে ৯৭ রানের ইনিংস খেলেন খোয়াজা। ডেভিড ওয়ার্নার করেন ৫৭ রান। ৮৫ রানে হারে শ্রীলঙ্কা।

● **টেস্ট র‍্যাঙ্কিং :**

গত ৩১ আগস্ট টেস্ট র‍্যাঙ্কিং ঘোষণা করে আইসিসি। টেস্টে ফের শীর্ষস্থান দখল করেন ডেল স্টেইন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে ৯৯ রানে ৮ উইকেট নিয়ে জেমস অ্যান্ডারসন, অশ্বিনদের সরিয়ে ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের পরে আবার আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর বোলার হিসেবে উঠে এলেন তিনি। টেস্টে প্রথম পাঁচ বোলার যথাক্রমে ডেল স্টেইন, ডেমস অ্যান্ডারসন, আর অশ্বিন, স্টুয়ার্ট ব্রড, রঙ্গনা হেরাথ। টেস্ট ব্যাটিংয়ে শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জো রুট। তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ার কেন উইলিয়ামসন। টিম র‍্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের শীর্ষে ওঠা নিশ্চিতই ছিল। এক পয়েন্ট পিছনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। তৃতীয় অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে শীর্ষে থাকলেও আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে একধাপ নেমে তিনে পৌঁছে গেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অজিঙ্ক রাহানে থেকে গেলেন আট নম্বরেই। ব্যাটিংয়ে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা দশে রাহানে ছাড়া আর কারও জায়গা হয়নি। তবে বোলিংয়ে অশ্বিনের সঙ্গে সেরা দশে জায়গা করে নেন রবিন্দ্র জাদেজা।

● **ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিং :**

শ্রীলঙ্কাকে ৪-১-এ হারিয়ে ওয়ান ডে টিম র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় নিউজিল্যান্ড। ভারত থাকল তৃতীয় স্থানে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। ওয়ান ডে ব্যাটিংয়ের শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার এ বি ডি' ভিলিয়ার্স। দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখলেন ভারতের টেস্ট অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তৃতীয় হাসিম আমলা। চতুর্থ জো রুট। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুরন্ত ব্যাট করে এই প্রথম সেরা পাঁচে ঢুকে পড়লেন ইংল্যান্ডের জো রুট। পাঁচে কেন উইলিয়মসন। ছয়ে মার্টিন গাপতিল। ন'য়ে কুইন্টন দে কুক ও দশে তিলকারত্নে দিলশান।

বোলিংয়ের শীর্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুনীল নারিন। সেরা দশে নেই কোনও ভারতীয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ার ট্রেন্ট, বোল্ট ও মিচেল স্টার্ক। চারে জায়গা করে নিলেন বাংলাদেশের সাকিব আল হালান। এরপর রয়েছেন ইমরান তাহির, ম্যাট হেনরি, কাজিসো রাবাডা, ডেল স্টেইন, মর্নি মর্কেল ও আদিল রশিদ। ওয়ান ডে ব্যাটিং-এ এক ধাপ নেমে সাতে রয়েছেন রোহিত শর্মা। আট নম্বর স্থান ধরে রাখলেন ওপেনার শিখর ধবন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ১২ নম্বরে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও ১৩ নম্বরে অক্ষর পটেল।

● **ওয়ান ডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ স্কোরের বিশ্বরেকর্ড ইংল্যান্ডের :**

শ্রীলঙ্কার দশ বছরের রেকর্ড ভেঙে ওয়ান ডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ স্কোরের নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ল ইংল্যান্ড। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার ৪৪৩-৯ এত দিন সর্বোচ্চ ওয়ান ডে স্কোর ছিল। ৩১ আগস্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নটিংহ্যামে তৃতীয় ওয়ান ডে-তে যা ভেঙে দিল ইংল্যান্ড। পঞ্চাশ ওভারে ৪৪৪-৩ তুলে। ইংরেজ ওপেনার অ্যালেক্স হেলসের এদিন ১২২ বলে ১৭১ করেন। যার মধ্যে রয়েছে ২২-টা চার এবং ৪-টে ছয়। দেশকে বিশ্বরেকর্ডের দিকে এগনোর পথে নিজেও রেকর্ড করেন হেলস। তার ১৭১ ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ওয়ান ডে স্কোর। তেইশ বছর ধরে যে রেকর্ড ছিল রবিন স্মিথের (১৬৭ নট আউট)।

● **ভারতীয় টেনিসের নতুন মহাসচিব হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় :**

গত ৩ সেপ্টেম্বর ইন্দোরে সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থা 'অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশান' (এআইটিএ)-র বার্ষিক সাধারণ সভায় রাজ্য টেনিস সংস্থা (বিটিএ)-এর প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে মহাসচিব নির্বাচিত হন। গত ৩০ বছরে কলকাতা থেকে জয়পুর, চেন্নাই থেকে চণ্ডীগড়, দেশজুড়ে অসংখ্য ডেভিস কাপ টাই আয়োজনের পিছনে এআইটিএ-র অন্যতম মুখ হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়। একাধিক বার কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমসে টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য হন। প্রসঙ্গত, ভারতীয় টেনিসের প্রশাসনিক স্তরে এ রাজ্যের এত বড়ো সম্মান লাভ বত্রিশ বছর পর। রাজ্য টেনিস সংস্থা (বিটিএ) থেকে এর আগে ১৯৭৬-'৮০ ও ১৯৮১-'৮৪ দু'দফায় সর্বভারতীয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশনে মহাসচিব হন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন টেনিস তারকা দিলীপ বসু।

● **বাংলার রঞ্জি অভিযান :**

গত ২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, এ বছর বাংলা রঞ্জি ট্রফি অভিযান শুরু করছে ১৩ অক্টোবর, জয়পুরে, উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। রঞ্জি ট্রফি ৬ অক্টোবর থেকে শুরু হলেও প্রথম রাউন্ডেই বাংলাকে নামতে হচ্ছে না। মনোজ তিওয়ারিরা অভিযান শুরু করছে দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে। এ বছর বাংলার গ্রুপে উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও রয়েছে বরোদা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, তামিলনাড়ু ও ভারতীয় রেল। বাংলার পরের ম্যাচগুলো যথাক্রমে ২০-২৩ অক্টোবর বনাম পাঞ্জাব, বিলাসপুর। ২৭-৩০ অক্টোবর বনাম রেল, ধর্মশালা। ৫-৮ নভেম্বর বনাম গুজরাট, নয়াদিল্লি। ১৩-১৬ নভেম্বর বনাম তামিলনাড়ু, রাজকোর্ট। ২১-২৪ নভেম্বর বনাম বরোদা, লাহলি। ২৯ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর বনাম মুম্বই, নাগপুর। ৭-১০ ডিসেম্বর বনাম মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি (পালাম)।

● **পঙ্কজ আডবাণীর ব্রোঞ্জ জয় :**

Sangsom 6 Red Snooker World Championship-এ ব্রোঞ্জ জিতলেন ভারতের পঙ্কজ আডবাণী। এই প্রথমবার কোনও ভারতীয় এই আন্তর্জাতিক স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতল। গত ৯ সেপ্টেম্বর সেমিফাইনালে চিনের ডিং জুনহুই-এর কাছে হেরে যান তিনি। অবশ্য এই জুনহুইকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করেন আডবাণী। শুরুতে ৩-৪ পিছিয়ে থেকেও আডবাণী শেষমেষ ৫-৪ জিতলেন সেই ম্যাচ। উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত কারণে মাইকেল হোল্ট নিজের নাম তুলে নেওয়ায় কোটার্টার-ফাইনালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যান আডবাণী।

এক নজরে খেলার আরও খবরাখবর

➢ **প্রেমিয়ার লিগ শুরু :**

২০১৬-'১৭ সালের প্রেমিয়ার লিগ ফুটবলের সূচনা হল গত ১৩ আগস্ট। আগামী বছর ২১ মে পর্যন্ত চলবে এই মরসুমের খেলা। ১৯৯২ সালে ইংরেজ পেশাদারি ফুটবল লিগ চালু হয়। এটি ২৫তম মরসুম। গত ১৫ জুন সময়সূচি ঘোষণা করা হয়। গতবারের চ্যাম্পিয়ান লেস্টার সিটি।

➢ **এশীয় তিরন্দাজিতে সোনা জিতল ভারতের মেয়েরা :**

চিনা-তাইপেতে আয়োজিত এশীয় জুনিয়র রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড তিরন্দাজিতে ভারতের হয়ে দলগত সোনা জয় করল মেয়েরা। ভারতের মেয়েরা দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এই টুর্নামেন্টে। এ রাজ্য থেকে নয়াগ্রামের মণিকা সোরেন ও কলকাতার অঙ্কিতা ভকতও ছিলেন এই বিজয়ী দলে।

➢ **সোনা নয় যোগেশ্বরের :**

লন্ডন অলিম্পিক্সে জেতা যোগেশ্বর দত্তের ব্রোঞ্জ সোনায় বদলে যাচ্ছে না। ৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ব কুস্তি সংস্থা জানায় যে, লন্ডনে ৬০ কেজি বিভাগে সোনাজয়ী ভঘরুল আসগারভ ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়েননি। এর আগে আজারবাইজানের কুস্তিগির ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়েছেন বলে খবর রটেছিল। তবে যোগেশ্বরের বিভাগে রুপো জয়ী বেসিক কুদুখোভ ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়ায় তার পদক বাতিল করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা। যোগেশ্বরের ব্রোঞ্জ তাই রুপোয় বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার সরকারি ঘোষণার আগে যোগেশ্বরকে অবশ্য ডোপ পরীক্ষায় পাস করতে হবে।

➢ **ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন আর্মি :**

গত ২৮ আগস্ট শুরু হয় এবারের ডুরান্ড কাপ। ১২৮তম ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হল আর্মি গ্রিন দল। এই প্রথম এই ট্রফি ঘরে তুলল তারা। দিল্লির আম্বেদকার স্টেডিয়ামে ১১ সেপ্টেম্বর টানটান উত্তেজনায় ম্যাচের নির্ধারিত সময় শেষ হয় গোলশূন্যভাবেই। অতিরিক্ত সময়ও গোলশূন্য থাকার পর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। আর্মি গ্রিনের প্রতিপক্ষ মণিপুরের নেরোকা এফসি। পেনাল্টি শুট আউটে ম্যাচ ড্র হয় ৪-৪ গোলে। সাডেন ডেথে বাজিমাত করে আর্মি। ম্যাচের ফল ৬-৫।

● **ইউ এস ওপেন :**

গত ২৯ আগস্ট থেকে ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টারে মার্কিন ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতার ১৩৬তম আসর আয়োজিত হয়। এটি বছরের চতুর্থ ও শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট। গতবারের চ্যাম্পিয়ন নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে পুরুষ সিঙ্গেলস-এর খেতাব জিতলেন সুইজারল্যান্ডের স্ট্যান ওয়ারিঙ্কা। মহিলাদের সিঙ্গেলস-এর ফাইনালে ক্যারোলিনা প্লিস্কোভাকে হারান জার্মানির অ্যাঞ্জেলিক কের্বের। ১৯৯৬ সালে স্টেফি গ্রাফের পর এই প্রথমবার কোনও জার্মান খেলোয়াড় টুর্নামেন্ট জিতল। ২০১৫ সালের চ্যাম্পিয়ান ফ্লাভিয়া পেনেট্রা সে বছরেরই মরসুম শেষে অবসর নিয়ে নেন। পুরুষ, মহিলা ও মিক্সড ডাবলস-এ যথাক্রমে ব্রুনো সোয়ারেস ও জেমি মারে, বেথানি ম্যাট্টেক-স্যান্ডস

ও লুসি সাফারোভা এবং ল'রা সিগমান্ড ও মেট পাভিক-এর জুটি জয় লাভ করে।

উল্লেখ্য, চতুর্থ রাউন্ডে ইরোস্লাভা সেদোভাকে উড়িয়ে দিয়ে গ্র্যান্ড স্ল্যামের ইতিহাসে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতার মাইল ফলক গড়েন সেরেনা উইলিয়ামস। সব মিলিয়ে তার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ম্যাচ জয়ের সংখ্যা আপাতত ৩০৯। কিন্তু ওপেন যুগে স্টেফি গ্রাফের সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবের (২২) বিশ্বরেকর্ড ভেঙে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেই সেরেনার ২৩ করে ফেলার আশা সেমিফাইনালে ভেঙে দিলেন দশম বাছাই চেক ক্যারোলিনা প্লিসকোভা। আপাতত অক্ষতই থেকে গেল স্টেফি গ্রাফের সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড।

বিবিধ

● **হেরিটেজ হিরো পুরস্কার :**

'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার' (IEUCN)-এর 'হেরিটেজ হিরো' পুরস্কার জিতে নেন আরণ্যকের তৃণভূমি বিশেষজ্ঞ বিভূতি লহকর। গত ৩ সেপ্টেম্বর আমেরিকার হাওয়াই-এ বিশ্ব সংরক্ষণ কংগ্রেসের অধিবেশনে অনলাইন ভোট গণনার পরে হেরিটেজ হিরো হিসেবে অসমের বিভূতি লহকরের নাম ঘোষণা করা হয়। গন্ডার-সহ বিভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্বরক্ষায় তৃণভূমির গুরুত্ব অপরিসীম—বিশেষ করে মানস জাতীয় উদ্যানে বিরল এবং বিপন্ন প্রাণীরা একান্তই তৃণভূমি নির্ভর। তৃণভূমির ক্ষতি হলে বা প্রকৃতি বদল হলে তার নেতিবাচক প্রভাব প্রথমে তপশিলভুক্ত প্রাণীদের উপরে পড়বেই। তৃণভূমির গবেষণা ও সংরক্ষণ নিয়ে তার কাজ তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ নিয়ে নিরসলভাবে সাধনা চালানো, বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র সংরক্ষণে প্রাণের ঝুঁকি সত্ত্বেও কাজ করে যাওয়া সংরক্ষণ কর্মীদের স্বীকৃতি দিতেই এই পুরস্কার দেয় IEUCN। এ বছর হেরিটেজ হিরো পুরস্কারের জন্য সারা পৃথিবী থেকে ৩০-টি নাম জমা পড়ে। বিশেষজ্ঞদের বাছাইয়ের পরে, IEUCN World Commission on Protected Areas তিন দেশের পাঁচ জনের নাম চূড়ান্ত তালিকায় রাখে—বিভূতি লহকর ছাড়াও ছিলেন কঙ্গোর ভিরুঙ্গা জাতীয় উদ্যানে সংরক্ষণের কাজ করা বান্টু লুকাম্বো ও যোশুয়া কাম্বাসু মুকুরা, পশ্চিম ককেশাসে সংরক্ষণের কাজ করা ইউলিয়া নাবেরেজানায়া ও অ্যান্ড্রে রুদোমাখা।

● **'আকাশবাণী মৈত্রী'-র সূচনা :**

গত ২৩ আগস্ট রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় কলকাতায় 'আকাশবাণী মৈত্রী' রেডিও স্টেশানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রসার ভারতীর বাংলা অনুষ্ঠান এবার বাংলাদেশেও শোনা যাবে। দু'দেশের বন্ধুত্বে নতুন মাত্রা যোগ করবে 'আকাশবাণী মৈত্রী'। এজন্য চুঁচুড়ায় এক হাজার কিলোওয়াটের নতুন শক্তিশালী ট্রান্সমিটার বসানো হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরে এ বিষয়ে দু'দেশের চুক্তি হয়। মিডিয়াম ওয়েভে ৫৯৪ কিলো হার্টজ তরঙ্গে ওই বেতার অনুষ্ঠান শোনা যাবে। এদিন 'আকাশাবাণী মৈত্রী'-র ওয়েব-সাইটেরও সূচনা করেন রাষ্ট্রপতি। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর দিকে আরও একটা বড়ো পদক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের জন্ম মুহূর্তের আগে থেকেই আকাশবাণী সে দেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ন'মাস ধরে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগামীদের হাত থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয় ইসলামাবাদ। মুক্তিযুদ্ধের খবর, বাঙালিদের উপর পাকিস্তানের সেনার ভয়ঙ্কর নির্যাতনের খবর গোটা বিশ্বকে জানাতে তখন তৎপর ছিল আকাশবাণী বা অল ইন্ডিয়া রেডিও। নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হয়ে ওঠে কলকাতা। মুজিব অনুগামী সেই সরকারের বার্তাও সম্প্রচারিত হয় আকাশবাণী থেকেই। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পরও ভারত-বাংলাদেশের যৌথ অনুষ্ঠান আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত হতো। তবে ২০১০ সালে এই অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ২০১৩ সালে ফের ভারত-বাংলাদেশ রেডিও মৈত্রীর বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

● **রেল যাত্রীদের জন্য বিমা ৯২ পয়সায় :**

বিমানের ধাঁচে যাত্রীদের জন্য বিমা ব্যবস্থা চালু করল রেল। প্রাথমিকভাবে আইআরসিটিসি-র ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যারা টিকিট কাটবেন, তারা ভাড়ার সঙ্গে যাত্রীপিছু বাড়তি ৯২ পয়সা দিয়ে এই বিমার সুযোগ পাবেন। তবে বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটলে মৃত ও আহত যাত্রীর পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে রেল। এই ব্যবস্থায় রেলের ক্ষতিপূরণের সঙ্গে বিমা সংস্থা থেকে বাড়তি ক্ষতিপূরণ পাবেন যাত্রীরা। তবে যাত্রী যদি নিজে থেকে টিকিট বাতিল করেন, তাহলে বিমার টাকা ফেরত দেওয়া হবে না। দরপত্রের মাধ্যমে বেছে নেওয়া ৩-টি বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে এই বিমা করাতে পারবেন যাত্রীরা।

● **মুর্শিদাবাদে গুপ্তযুগের সম্ভার :**

তিন বছর আগে মুর্শিদাবাদে আহিরণের কাছে গণকর থেকে পাওয়া যায় গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা। তারপর আরও অনুসন্ধানের ব্যাপারে আগ্রহী পুরাতত্ত্ববিদেরা মির্জাপুরের 'শিয়াল কালীতলা' ঢিবি এলাকার ১৬০০ বর্গমিটার এলাকাকে চিহ্নিত করে খনন শুরু করেন। মাটির দেড় মিটার নিচে থেকে গুপ্তযুগের দীপ, পুঁতি, বল ছাড়াও নানা মৃৎপাত্র-সহ প্রায় ৩০-টি প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়েছে। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম শতকে গুপ্তযুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি ছড়িয়ে রয়েছে বড়ো একটি এলাকা জুড়ে। পাওয়া যায় পাথরের চাকা ও মাটির পাত্রের হাতলও। রয়েছে অলঙ্কৃত ইটও। গণকর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যেই মুর্শিদাবাদের বড়োএগ ঢেকা বিচকান্দি থেকে পাওয়া গিয়েছে গুপ্তযুগের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। কর্ণসুবর্ণও তার কাছাকাছি সময়ের। তাই অনুমান করা যায়, গুপ্তযুগে এই এলাকাটিতে একাধিক জনপদ ছিল।

● **রেলপথে দিল্লি থেকে মুম্বাই ১২ ঘণ্টারও কম সময়ে :**

নয়াদিল্লি থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পৌনে ৩-টে নাগাদ রওনা দেয় স্পেনের প্রযুক্তিতে তৈরি হাইস্পিড ট্যালগো ট্রেন। মুম্বই সেন্ট্রালে পৌঁছয় ওই দিনই রাত ২.৩৩ মিনিটে। দূরত্ব ১৩৮৪ কিলোমিটার,

গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার। পরীক্ষামূলকভাবে এই ট্রেন চালানো হয়। পরীক্ষায় সফলভাবে উতরেও যায় ট্যালগো। এর আগে পাঁচবার পরীক্ষামূলকভাবে ট্যালগো ট্রেন চালানো হয়। তখন অবশ্য গতিবেগ রাখা হয় ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার। ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার গতিতে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে রাজধানী এক্সপ্রেসের সময় লাগে ১৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিট।

গত এপ্রিলে জাহাজে করে ট্যালগো ট্রেনের কামরাগুলি ভারতে আনা হয়। নয় কামরার এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার। এই ট্রেনে রয়েছে ২-টি একজিকিউটিভ শ্রেণির কামরা, ৪-টি চেয়ার কার, একটি ক্যাফেটেরিয়া, একটি পাওয়ার কার এবং শেষের কামরাটি বরাদ্দ করা হয়েছে রেলের স্টাফ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের জন্য।

● **সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন গুজরাটে :**

গুজরাটে কচ্ছের রানে ধোলাভিরায় মাটির তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল সিন্ধু সভ্যতার সুপ্রাচীন নাগরিক সভ্যতার নিদর্শন—একটি সুপরিকল্পিত বন্দর নগর। প্রত্নতাত্ত্বিকদের দাবি, ভারতের ভৌগোলিক সীমায় পড়া ওই সুপ্রাচীন নগরটি ছিল সিন্ধু সভ্যতার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। গোড়াপত্তন হয় প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। তার দেড় হাজার বছরের মধ্যেই এক ভয়ঙ্কর সুনামিতে তছনছ হয়ে যায় প্রাচীন ওই নগর। সমুদ্রে তলিয়ে যায় গোটা শহর। আদতে ওই ঝকঝকে শহরে থাকতেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন। ছিল একটি দুর্গ। শহর লাগোয়া এলাকায় গড়ে ওঠা মফস্বলেও। অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা দুর্বল মানুষজন থাকতেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, নগরের বাসিন্দারা সুনামির বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সুনামি ঠেকানোর জন্য গোটা শহরটিকে ১৪ থেকে ১৮ ফুট উঁচু পাথর দিয়ে বানানো পাঁচিলে ঘিরে ফেলেন তারা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

● **রেল-এসবিআই চুক্তিতে বাতিল 'ক্যাশ ট্রেন' :**

সম্প্রতি একটি চুক্তি (MoU) সাক্ষরিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব রেল ও স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে। ঠিক হয়, পয়লা অক্টোবর থেকে হাওড়া-খড়্গপুরের মধ্যে আপাতত ৮১-টি স্টেশনের টাকা তুলে নেবে এসবিআই। বাকি স্টেশনগুলির টাকাও আস্তে আস্তে নিতে শুরু করবে ওই ব্যাংক। এ রাজ্যে রেলের দুই জোনেই এই পদ্ধতি বদলের কাজ চলছে। মাস পাঁচেক ধরে সারা দেশে সব জোনেই এই পদ্ধতির পরিবর্তন করছে রেল বোর্ড। এর ফলে ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা 'ক্যাশ ট্রেন' ব্যবস্থা বাতিল হওয়ায় রেলের এ বাবদ ঝক্কি ও আর্থিক বোঝা কমবে (রেল কর্তৃপক্ষ কোনও শাখার টিকিট বিক্রির টাকা বহনের জন্য যে ট্রেনটিকে নির্দিষ্ট করে, সেটিকেই বলা হয় ক্যাশ ট্রেন। এটি আলাদা কোনও ট্রেন নয়। লোকাল বা প্যাসেঞ্জার যা কিছু হতে পারে)। পাশাপাশি নতুন ব্যবস্থায় লাভ হবে ব্যাংকেরও—টাকাটা দিনের দিন জমা পড়বে 'কারেন্ট অ্যাকাউন্ট'-এ; রেল সেটা না তোলা পর্যন্ত মূলধন হিসেবে ওই টাকা ব্যবহার করতে পারবে ব্যাংক।

এক নজরে বিবিধ আরও খবরাখবর

➢ **বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ও লম্বা কাঁচের সেতু :** গত ২০ আগস্ট চিনের ঝাংজিয়াজিতে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ও লম্বা কাঁচের সেতু উদ্বোধন করা হয়। চিনের হুনান প্রদেশে ঝাংজিয়াজি পার্কে তিয়ানমেন পাহাড়ের মধ্যে ঝুলন্ত ১৪০০ ফুট লম্বা সেতু। মাটি থেকে ৩০০ মিটার উঁচুতে। দিনে ৮ হাজার পর্যটক প্রবেশের অনুমতি আছে। এই সেতু থেকে অরণ্য-পাহাড় ঘেরা অসাধারণ প্যানোরামিক ভিউ দেখা যায়। ইউনেস্কো এই পার্কটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মর্যাদা দিয়েছে। তবে, উদ্বোধনের দু' সপ্তাহের মধ্যেই অনিবার্য কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এই কাঁচের সেতু।

➢ **একই সঙ্গে বোয়িং চালিয়ে দুই বোনের নজির :** এই প্রথম দুই বোন একই সঙ্গে চালান একটি বোয়িং-৭৭৭ বিমান। পাকিস্তানের মরিয়ম মাসুদ ও ইরম মাসুদ একই সঙ্গে একই বিমানের পাইলট হয়ে বিশ্বে নজির গড়েন। দুই বোনই পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে (পিআইএ) বিমান চালান বহু দিন ধরে। দু'জনেই বিমানের ফার্স্ট অফিসার। তবে, এতদিন শুধু আলাদা আলাদাভাবে বিমান চালিয়েছেন।

➢ **নতুন রুটে আরও দুই 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' :** গেদে-দর্শনা সীমান্ত হয়ে কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে একটি মৈত্রী এক্সপ্রেস এখন নিয়মিত যাতায়াত করে। সব কিছু ঠিক থাকলে পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত হয়ে কলকাতা ও খুলনার মধ্যে দ্বিতীয় মৈত্রী এক্সপ্রেসটি চালু হবে নতুন বছরের গোড়াতেই। এছাড়া আখাউড়া সীমান্ত হয়ে ত্রিপুরার আগরতলা থেকে ঢাকা পর্যন্ত আর একটি মৈত্রী এক্সপ্রেসও শীঘ্র চালু করতে চায় দু'দেশ। এজন্য বাংলাদেশের অংশে রেল লাইন সংস্কারের কাজ জোর কদমে শুরু হয়েছে।

দেশভাগের আগে শিয়ালদহ থেকে যশোহর ও খুলনা পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলত। কিন্তু দেশভাগের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে এতদিন রেল যোগাযোগ বন্ধই ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পেট্রাপোল-বেনাপোল দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়। তারপর থেকে ফের ওই লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে ২০০১ সালে ফের এই রুটে পণ্য পরিবহণ শুরু হয়।

➢ **'তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড' :** কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব মন্ত্রকের তরফে 'তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড' পেলেন পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস। ২৯ আগস্ট নয়াদিল্লিতে, রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে এই সম্মান গ্রহণ করেন তিনি। এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অন্নপূর্ণ-সহ হিমালয়ের পাঁচটি আট-হাজারি শৃঙ্গ ছুঁয়েছেন। উল্লেখ্য, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ক্ষেত্রে এই পুরস্কারকে অর্জুন সম্মান বলা হয়।

➢ **বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ খড়্গ :** বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খড়্গ মিলল অসমের নগাঁও ট্রেজারির বাক্সে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ নথিভুক্ত গণ্ডারের খড়্গও অসমেরই। তবে তা এখন লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। রাজ্যে গণ্ডারের খড়্গ পরীক্ষার কাজ চলাকালীন নগাঁও ট্রেজারিতে রাখা ২০৬-টি খড়্গ পরীক্ষা করা হয়। তার মধ্যে একটির ওজন তিন কেজিরও বেশি। খড়্গটির বাইরের দিকের বাঁকানো অংশের দৈর্ঘ্য ৪৫ সেন্টিমিটার, গোড়ার পরিধি ৬০ সেন্টিমিটার। খড়্গ যাচাই কমিটি জানায়, বিশ্বে নথিভুক্ত খড়্গের মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা অসমের গণ্ডারের খড়্গটি একমাত্র এই খড়্গের চেয়ে বড়ো। সেটির দৈর্ঘ্য ৬০ সেন্টিমিটার। ১৯০৯ সালে তা সংগ্রহ করা হয়। নগাঁওয়ের খড়্গটি ১৯৮২ সালে সংগৃহীত।❑

সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

হস্ততাঁত স্টল বণ্টনের জন্য অনলাইন পোর্টাল

কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে হস্ততাঁত স্টল বণ্টনের জন্য অনলাইন পোর্টাল চালু করে। এই পোর্টাল একটি তন্তুবায়-বান্ধব ব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য হস্ততাঁত স্টল বণ্টন প্রক্রিয়া সুষ্ঠভাবে পরিচালন করা। ফি বছর হস্ততাঁত উন্নয়ন কমিশনারের দপ্তর (Office of Development Commissioner Handlooms) প্রায় ৩৪০ বিপণন অনুষ্ঠানের আয়োজন সঙ্গে যুক্ত। আশা করা যায় যে নতুন পোর্টালটি হস্ততাঁত পণ্যের বিপণনের প্রসার করার ক্ষেত্রে স্টল বণ্টন প্রক্রিয়াকে বানাবে সহজ, সরল ও স্বচ্ছ; নতুন আবেদনকারী, তন্তুবায় বা সংস্থা, সকলের জন্য সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করবে।

অনলাইন পোর্টাল কীভাবে কাজ করে ?

বড় বড় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে অনলাইন আবেদনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। তখন কোনও তন্তুবায় বা সংস্থা অনলাইন পোর্টালে আবেদন করতে পারেন। প্রথমবার যারা আবেদন করছেন, তাদের আগে রেজিস্টার (নিবন্ধিকৃত) করতে হবে। এর পর থেকে তাদের তথ্য আপডেট (সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন) হতে থাকবে। আবেদন জমা দেওয়ার জন্য এই System থেকে তারা login ও password পাবেন। নিবন্ধিকরণের পর তারা অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। অনলাইন আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট 'তন্তুবায় পরিষেবা কেন্দ্র' (Weavers Service Centre—WSC)-এ forward করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 'তন্তুবায় পরিষেবা কেন্দ্র' তার আওতাধীন তন্তুবায়ের আবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খতিয়ে দেখবে এবং কোনও আবেদন যথাযথ না হলে তার কারণও আবেদনকারীকে জানাবে। বিভিন্ন 'তন্তুবায় পরিষেবা কেন্দ্র' যেসব আবেদনের জন্য সুপারিশ করবে, System সেগুলিকে সংকলিত করে, কম্পিউটারের মাধ্যমে লটারির জন্য প্রস্তুত করবে। রাজ্য ও স্লট অনুযায়ী প্রতীক্ষারত প্রার্থীতালিকা-সহ বাছাই করা প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করা হবে। System স্টল নম্বর-সহ স্টল বরাদ্দ হওয়ার খবর জানাতে মনোনীত প্রার্থীকে SMS ও ই-মেল পাঠাবে। আবেদনকারী পোর্টালে login করে আবণ্টন পত্রের প্রিন্ট আউট পেতে পারেন। আবন্টন পত্রের প্রিন্ট আউট নিয়ে তারা স্টল হস্তান্তরের জন্য উদ্যোক্তাদের কাছে যেতে পারেন। http://handloomstall.gov.in/HEMS/pages/hems–home.action-এর মাধ্যমে এই সুযোগ পাওয়া যাবে।

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রসারের জন্য #Gas4India অভিযান

সম্প্রতি দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রসারের জন্য #Gas4India অভিযানের সূচনা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানি এর জন্য হাত মিলিয়েছে। যেসব নাগরিক রান্না, পরিবহণ, ঘরে আলো ও ব্যবসার জন্য শক্তির উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেন বা অদূর ভবিষ্যতে করবেন, তাদের দেশ, সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশের হিতের কথা মাথায় রেখে এই জ্বালানি ব্যবহার করার বার্তা পৌঁছে দিতে #Gas4India-এর সূচনা হয়। এটি একটি কেন্দ্রীভূত, সারা দেশব্যাপী বহুমাত্রিক প্রচারাভিযান যার জন্য ব্যবহার করা হবে একাধিক মাধ্যম (media) ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান। যেমন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব, লিংকড্-ইন ও তার ব্লগসাইট-এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং আলাপ-আলোচনা, কর্মশালা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতো বৃহৎ স্থানীয় আয়োজনের মাধ্যমে সরাসরি উপোভোক্তার কাছে পৌঁছে যাওয়া। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের স্বাধীন-ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এই অভিযানের ওয়েবসাইট, ট্যুইটার হ্যান্ডেল, ফেসবুক পেজ ও থিম সং (গান)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এই অভিযানের উদ্দেশ্য দেশের শক্তি খাতে গ্যাসের অংশভাগ বর্তমান ৬.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করা। গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার গ্যাসের দেশব্যাপী গ্রিড-এর প্রসার ও পরিকাঠামো স্থাপনের দিকেও নজর দিচ্ছে। Gas Authority of India Limited (GAIL) ইতোমধ্যেই গ্যাস গ্রিড-এর জন্য দরপত্রের প্রক্রিয়ার কাজ শেষ করে ফেলেছে, এবং খুব শীঘ্রই পাইপ বসানোর কাজও শুরু হয়ে যাবে। সরকার Coal Bed Methane-এর থেকে কৃত্রিম গ্যাস আহরণ করার প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে, এবং Bio-CNG ও Bio-PNG-এর প্রসারও করছে। তরল প্রাকৃতিক গ্যাস LNG-র তিনটি নতুন টার্মিনালও গড়ে উঠছে। ন্যায্য মূল্যে গ্যাসের অবাধ জোগান সুনিশ্চিত করতে ভারত দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং বিদেশে সম্পদ অধিগ্রহণ করে।

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

October, 2016
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs.610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐☐☐☐☐☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।